রেলপথে

ভারত-ভ্রমণ।

A

GUIDE TO TRAVELLERS

IN

INDIA.

শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষাল প্রণীত।

কলিকাতা

মশজীদবাটী ষ্ট্রীট ২ সংখ্যক ভবনে

সেনযন্ত্রে

শ্রীহীরালাল ঘোষদ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

১২৯১ সাল।

বিজ্ঞাপন।

—•—

আমি কার্য্যবশতঃ কয়েকবার ভারত ভ্রমণের সুবিধা পাইয়াছিলাম। চতুর্দ্দিক রেলওয়ে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় সকলেই ভ্রমণকরিতে সমুৎসুক। বস্তুতও ভ্রমণের তুল্য প্রীতিপ্রদ পদার্থ আর কিছুই নাই। বাণিজ্য, জীবিকা ও তীর্থের জন্যও বহুলোক যাতায়াত করে। কিন্তু কেহ বা দর্শনযোগ্য পদার্থ সকল না জানিয়া, কেহ বা প্রতারিত, কেহ বা বিপদাপন্ন, কেহ বা পীড়াগ্রস্ত ও কেহ বা অর্দ্ধপথে অর্থহীন হইয়া ভগ্নমনে দেশে প্রত্যাগত হন। এই সকল কারণ বশতঃ সাধারণের হিতার্থে এই পুস্তক প্রকাশিত করিলাম। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে পেশোয়ার ও পেশোয়ার হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত রেলওয়ের সুবিধামত প্রত্যেকস্থানে দেখিবার যোগ্য পদার্থ, পণ্যদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য, পথ, ঘাট, তীর্থ, দেবালয়, মন্দির, প্রাচীনহর্ম্ম্য, দেশের আচার ব্যবহার, ভাষা, ইতিহাস, বন, উপবন, পর্ব্বত, উপত্যকা, নদ নদী সাগর ও তৎপরিবর্ত্তন সকল যথাসাধ্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বিনিবেশিত করিয়াছি। পুস্তক সাধারণের জন্য অল্পমূল্য, অল্পমূল্যের জন্য সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষেপের জন্য অনেকস্থানের বর্ণন নীরস করিতে হইয়াছে।

এখনও কার্য্যানুরোধে, উত্তর ও পূর্ব্ব, বাঙ্গালায় সততঃ ভ্রমণ করিতেছি। এজন্য প্রায় ৪ বৎসর হইল এই পুস্তক একবার মুদ্রিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন পুনরায় মুদ্রিত হইল। সাবকাশাভাবে অশুদ্ধ শোধন করিতে সক্ষম হই নাই। কেবল কয়েকটী মাত্র ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলাম। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। অবকাশ হীন গ্রন্থকারের এই রূপ গ্রন্থদ্বারা যদি সাধারণের কিছু মাত্র উপকার বোধ হয় তাহা হইলেই শ্রম সার্থক ইতি।

কলিকাতা।
১৪৭ নং কটনষ্ট্রীট
২৫ পৌষ সন ১২৯১।

শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
লইয়া	হইয়া	৩	২২
রাজেন্দ্র	রাজা রাজেন্দ্র	৪	১১
বিচ্ছন্ন	বিচ্ছিন্ন	৫	৬
প্রতিবর	প্রতিরব	৮	১৮
কয়র শোলের	খয়র শোলের	১১	২২
পাঘমতে	পাদ্মমতে	৪১	৭
সাভকাশ্যা	সাঙ্কাশ্যা	৫৪	১০
প্রস্তরের	প্রস্তুতের	৬০	২৩
মুণ্ডী	মুর্ণ্ডী	৬১	২৭
ভ্ন	ভগ্ন	৬৯	২৮
দুছটী	দুইটী	৭১	১০
সমতাজ মহল	মমতাজ মহল	৭২	১৫
ইন্দ্রাপন্ন * * * কবর	০	৮০	২৮
ফেরোজ সহ'র	ফেরোজ সাহের	৮৩	২০
এখনও লোকে	এখনও লোকে ইন্দ্রাপত বলিয়া থাকে। ফেরোজের কোটিলা হইতে হুমায়ুনের কবর	৮৮	২৮
মার্ব্বল লাল	মার্ব্বল ও লাল	৮৯	১৮
উচ্চতায়	উচ্চতার	৯১	১৫
চন্দ্র যন্ত্রের	যন্ত্র মন্ত্রের	৯১	২২
কোলঙ্গান	কোলঙ্গার	৯৫	১৯
দুর্গে	দুর্গ	৯৭	১
ভিক্ষুক	ভিক্ষুকের	৯৭	৫
সহিত	০	১০২	২
গঙ্গাদ্বার	গঙ্গাদ্বারের	১০২	৯
ব্রহ্মাবর্ত্ত	ব্রহ্মাবর্ত্ত	১০৫	২৪

অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তর্বরারির	তরবারির	১০৬	৯
কোলে	কোণে	১০৮	১১
চতুকোণ	চতুষ্কোণ	১০৯	৮
কদমা	কদম	১০৯	৯
ত্রিমারের	ত্রিমাবের	১১১	১৯
সকলেই	সকলেরই	১১৩	৪
গ্রীম	গ্রীষ্ম	১১৩	১৪
পথ	পদ্ম	১১৫	২১
মলোকরাজ	অশোক রাজ	১২০	১৪
কুম্ভ	কুণ্ড	১২০	১৭
গ্রহ	গ্রন্থ	১২১	১১
উপরি ভাগে	উপরি ভাগ	১২৪	২৬
বর্ষি	০	১২৭	২৭
জেলার	জেলায়	১২৮	২০
ভট বিভাগে	আট বিভাগে	১৩০	১২
হুরিন	হরিণ	১৩০	২৫
সরল	সরস	১৫১	১৭
রামতাড়া	তামড়া	১৫৫	১০
সেতু	০	১৫৬	১৩।১৪
নিধি	নিথি	১৫৬	২৪
ইহারই	০	১৫৬	২৬
ভাল	মনে	১৭১	১১
আমাদের,	আমাদের	১৭১	২৩
বা সিংড়ার	০	১৭৪	১৩
পঙ্কের	পথের	১৮২	১৯
সরস্বতী	স্বরবতী	১৮৬	১৫
মহুরার	মহুরায়	১৮৮	২৭
নাই	নয়	১৯০	২৭

রেলওয়ে

ভারত-ভ্রমণ।

প্রথম অধ্যায়।

বাঙ্গালা, বিহার ও কাশী বিভাগ।

কলিকাতা হইতে আমরা দেশ ভ্রমণে নির্গত হইলাম। কলিকাতা দুই ভাগে বিভক্ত, সহর কলিকাতা ও সহরতলী কলিকাতা। সহর ও সহরতলী কলিকাতা লইয়া এই মহানগরী গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ ও দুই ক্রোশ বিস্তীর্ণ। ইংরেজেরা কয়েকটি কারণ বশতঃ তিন ক্রোশ দীর্ঘ ও দেড় মাইল বিস্তৃত স্থানকে সহর কলিকাতা নাম দিয়াছেন। সহর কলিকাতায় চারি লক্ষ লোকের বাস। কিন্তু সহরতলী কলিকাতা লইয়া লোকের বাস অত্যন্ত অধিক। সহর কলিকাতায় ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, গ্রীক, চীন, মগ, ভুটানী, নেপালী, আমেরিক, পারসী, মোগল, পাঠান, আরব, তুরকী, হাবসী ম্যালেয়া প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় স্থানস্থিত ভিন্ন বেশী ভিন্ন ভাষী ও ভিন্ন ধর্ম্মী লোকগণ দিবানিশি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ইহার ত্রিশ বাজার, দশ পটি ও পাঁচ চক দ্রব্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যহ লক্ষ লোক প্রবেশ করিতেছে ও লক্ষ লোক বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রত্যহ মফস্বল হইতে ৭॥ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রবেশ করিতেছে ও ৫॥ লক্ষ টাকার দ্রব্য তথায় বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রত্যহ সমুদ্র যোগে ছয় লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রবেশ করিতেছে ও মুদ্রাসহ ৮ লক্ষ টাকা জাহাজে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দূর হইতে কলিকাতার ঐশ্বর্য্য দেখিতে আরও ভয়ঙ্কর। মালে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যহ তিন দিক হইতে তিন রেল যেন ভারত শূন্য করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে। বিস্তীর্ণ গঙ্গা ও দুই দিকের দুই খাল আচ্ছন্ন করিয়া অসংখ্য মাল্লারা কলরব করিতে করিতে কলিকাতা প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু যেমন তরঙ্গ-মালা সঙ্কুল গর্জ্জনকারী নদী সকল সমুদ্র স্পর্শ মাত্র কোথায় নিমীলিত হইয়া যায়, সেই রূপ ঐ সকল দ্রব্য কলিকাতা স্পর্শ মাত্র যে কোথায় প্রবেশ করে কিছুই জানা যায় না।

কলিকাতায় দেখিবার উপযুক্ত অনেক বিষয় আছে। এখানকার গড়ের মাঠ অতি সুন্দর। যতদূর দৃষ্টিপাত কর নবদূর্ব্বাদল মণ্ডিত সুশোভন ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তীর্ণ হইয়াছে। তাহারই মধ্যে মধ্যে ভারত-বিজেতা ব্রিটিশ বীরগণের প্রতিমূর্ত্তি সকল বিরাজমান। এক স্থলে অকটরলোনি মনুমেণ্ট ১১০ হস্ত উচ্ছ্রিত হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে সেণ্ট পালের বিখ্যাত গির্জ্জার গগণাবলম্বিনী চূড়া। তাহার ডাইন দিকে আলিপুরের উপবনের শীর্ষ সকল নেত্রগোচর হয়। মাঠের মধ্যস্থ পক্ষিরব বিরাবিত নিকুঞ্জমালাবিমণ্ডিত ও ভাগীরথী-প্রবাহ সংস্পর্শন শীতল সমীরণ-সেবিত পথ মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন কবিকুলের বর্ণিত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। পশ্চিমে ফোর্ট উইলিয়ম ও বিলাসীগণের সঞ্চরণ যোগ্য পুষ্পমালা বিভূষিত, নিকুঞ্জলতাবিতান-বিমণ্ডিত, উৎসরাজি-সমন্বিত, ব্রহ্মদেশীয় মণ্ডপ-শোভিত সুশ্রাব্য সুমনোহর সংগীতরবে নিনাদিত ও বিজাতীয় বামাকুলাকুলিত ইডেনের রমণীয় উদ্যান। তৎপশ্চাতে গঙ্গার বিশাল বক্ষস্থল নিবিড় অর্ণবপোতে আবৃত হইয়া গগণমণ্ডলে যেন বন শোভা বিস্তার করিয়াছে। মাঠের উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তস্থ সমতল, সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত মার্ব্বেল শোভা বিনিন্দিত ও সৌরকিরণে সমুদ্ভাসিত স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান হর্ম্ম্যমালার সৌন্দর্য্য দূর হইতে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন স্বর্গপুরী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। আকাশে প্রকাণ্ড পক্ষিগণ বিচিত্র গতিতে সন্তরণ দিতেছে ও নিম্নে ভিন্ন কায় ভিন্ন বেশী লোকগণ যানারোহণে ও পদব্রজে দেখিতে দেখিতে বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রিন্স অব ওয়েলস্ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী লোকগণও ক্ষণকাল এই শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গড়ের মাঠের দক্ষিণে আলিপুরের পশুশালা ও লেফটনেণ্ট গবর্ণরের আলয়। পার্শ্বে জেল ও ঘোড়দৌড়ের স্থান। সর্ব্ব দক্ষিণে কিছু দূরে পৃথিবীর মধ্যে বিলাসী বাদসাহ লক্ষৌরাজের পশু পক্ষ্যাদি পূরিত উদ্যান শোভিত আলয়। তাহার অপর পারে গঙ্গাতীরে বহুদূর বিস্তীর্ণ গবর্ণমেণ্টের বোটানিকাল গার্ডন। ইহাতে ভূমণ্ডলস্থ প্রায় দশ সহস্র ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যস্থিত ন্যগ্রোধ বৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড। গড়ের মাঠের পূর্ব্বদিকে এসিয়াটিক মিউজিয়ম বা মৃত পশুপক্ষ্যাদির আলয়। ইহাতে ভূসম্বন্ধীয় ও প্রাণী সম্বন্ধীয় নানা বিষয় অব-

লোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করা যায়। ইহার পুস্তকাগার অতি বিশাল এবং ইহাতে বহুকালের প্রাচীন মুদ্রা ও প্রস্তরাদি এত সংগৃহীত আছে যে, এসিয়াখণ্ডে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। মিউজিয়ম বা যাদুঘরের পার্শ্বে মিউনিসিপাল বাজার। মাঠের পশ্চিমদিকস্থ দুর্গ দুই কোটী টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। দুর্গটী অষ্টকোণ। কলিকাতার দিকে ত্রিভুজাকার পঞ্চ বাহু সমভাবে আছে। এবং নদীতীরস্থ বাহুত্রয় অবস্থানুসারে বিষম হইয়াছে। ইহার তুল্য সুগঠিত দুর্গ ভারতে আর নাই। কিন্তু নদীতীর যেরূপ সুরক্ষিত ভূমিভাগ সেরূপ নাই, আক্রমণ করিলে রক্ষা করিতে দশ সহস্র লোকের প্রয়োজন হয়। এত লোক থাকিলে অনায়াসে বাহিরে যুদ্ধ করা যাইতে পারে। দুর্গের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত ইডেনের উদ্যান, তাহার উত্তরে নগরবাসী-গণের সভাগৃহ টাউনহল। প্রতিমূর্ত্তি-সজ্জিত টাউনহল অতি মনোহর। টাউন হলের নিকট বহুচূড়াসমন্বিত হাইকোর্ট ও বিস্তীর্ণ ফাইনেনসাল ডিপার্টমেণ্ট॥ পূর্ব্বে এইটি গবর্ণমেণ্ট হাউস ছিল। ইহার সম্মুখে ওয়েলেস্‌লী নির্ম্মিত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস বা রাজবাটী। উদ্যানের মধ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট হাউস অতি শোভাকর, হর্ম্মোর চারিকোণে চারিটি খণ্ড বাহির হইয়াছে। গোলাকার পথ দ্বারা এই চারিখণ্ড মধ্যখণ্ডের সহিত সম্মিলিত আছে। মধ্যখণ্ডের গৃহ দুই ভাগে বিভক্ত। বিস্তীর্ণ সোপানাবলি অবলম্বন করিয়া উঠিলে সম্মুখেই মার্ব্বল মণ্ডিত এক প্রকাণ্ড গৃহ। অভ্যন্তরে দক্ষিণে ও বামে ডোরিক জাতীয় স্তম্ভমালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাতেই রাজসিংহাসন সংস্থাপিত। এই গৃহের পর আর এক গৃহ। সমস্তই আইওনিক স্তম্ভ, এইটি বলরুম বা নৃত্যাগার। কোণের খণ্ডে গবর্ণর জেনরলের এডিকঙ্গেরা বাস করেন এবং কৌন্সিলাদি হইয়া থাকে। নিম্নে আফীস ও গুদাম। গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্বে সুসজ্জিত উইলসন হোটেল। নিকটে হ্যামিলটন, কুককেলভী, অছলর, হারমান প্রভৃতি মণিকার ও বণিকগণের বিপনি যেন কলিকাতা প্রস্ফুটিত করিয়াছে। ইহাদের উত্তরে উদ্যান মধ্যে লালদিঘী। ইহার গভীরতা ৪০ হাত এবং উদ্যানের প্রত্যেক পার্শ্ব সহস্র হাত। লালদিঘীর চারি পার্শ্ব দেখিতে অতি সুন্দর। দক্ষিণে বিচিত্র তারাগার বা টেলিগ্রাফ অফীস। পূর্ব্বে মুদ্রা পূরিত করেন্সী বা নোটের আফীস। উত্তরে বহুদূর বিস্তীর্ণ রাইটর বিলডিং

উত্তরপূর্ব্ব কোণে অত্যুচ্চ গিরজা। পশ্চিমে গম্বুজ সমন্বিত প্রকাণ্ড পোষ্ট আফীস পোষ্ট আফীসের পার্শ্বে কষ্টম হাউস। এই স্থানে ১৭৫৭ অব্দে ভয়ঙ্কর অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়াছিল। পোষ্ট আফীসের দক্ষিণে কিছু দূরে গঙ্গার কূলে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, তদুত্তরে কিছু দূরে বণ্ড হাউস। বণ্ড হাউসের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে টাকশাল। লালদিঘীর উত্তর তীর দিয়া পূর্ব্ব মুখে শিয়ালদহগামী রাস্তা দ্বারা কলিকাতা দক্ষিণ ও উত্তর দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। শ্রীর অধিবাস স্বরূপ দক্ষিণ খণ্ড ইংরেজ দ্বারা অধিবাসিত। উত্তর খণ্ডে দেশীয় লোকেরা বাস করে। উত্তর খণ্ডে দেখিবার মধ্যে কলেজ কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট। মেডিকেল কলেজের ভিতর হস্পিটল কোন অংশেই লণ্ডনের ন্যূন নহে, ইহার অভ্যন্তরে এক পশুর দুই মস্তকাদি নানারূপ অদ্ভুৎ প্রসব এবং নানা রোগের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আছে। কলেজের কিছু দূরে চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের পশ্বাদি পূরিত বাটী দেখিবার উপযুক্ত। নগরের উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কলিকাতাস্থ প্রধান লোকগণের আয়াসের উদ্যান। উত্তরে সাত পুকুরের বাগান প্রভৃতি কয়েকটি উদ্যান আছে। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বেল-গেছের পার্শ্বনাথের বাগান। তাহার পার্শ্বে পাইকপাড়ার রাজাদের উৎকৃষ্ট বৈঠকখানা। ইহাতে আদম ও ইভের যে চিত্র আছে ইহার তুল্য চিত্র ভারতে অতি অল্প আসিয়াছে। কিছু দূরে দমদমার গবর্ণমেণ্টের সেনানিবেশ স্থান, তন্নিকটে আর একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে। কলিকাতার যে দিকে দৃষ্টি-পাত কর সেই দিকেই নয়ন আকৃষ্ট হইবে। ৬০।৭০ হাজার টাকা আছে এমন লোক প্রত্যেক গলিতেই দেখা যায়। এখানকার নগর পারিপাট্য অতি সুন্দর, পঞ্চ ক্রোশ হইতে ভাগীরথী প্রবাহ আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। কখন বা ত্রিতল উপরে উত্থিত হইয়া গৃহমধ্যে নির্ঝর বারি বর্ষণ করিতেছে, কখন বা পথ প্রান্তে কল্প তরুর ন্যায় অজস্র বেগে জল দান করিতেছে, কখন বা কৃত্রিম বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া রাজমার্গের ধূলিজাল বিনাশ করিতেছে। দহমান বাষ্প সকল নল যোগে আসিয়া গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে পথে পথে পূর্ণ চন্দ্র প্রভা বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। এক এক দীপ হইতে দ্বাদশ বর্ত্তিকা তুল্য আলোক বিনির্গত হয়। পথের গভীর অন্তরে প্রকাণ্ড পয়ঃপ্রণালী নগরের মলপ্রবাহ লইয়া অদৃশ্য ভাবে দূরস্থ খালের দিকে

গমন করিতেছে। দীর্ঘে চারি প্রধান পথ দ্বারা এই মহানগরী বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্ব প্রান্তের পথ অতি প্রশস্ত এবং তাহার এক পার্শ্ব দিয়া রেল চলিতেছে। মধ্যস্থলের পথ অতি শোভাশালী। পূর্ণ ৪০ হস্ত বিস্তৃত এই পথের মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট উদ্যান ও নির্ম্মল সলিলপূর্ণ সরোবর। তদনন্তর অতি প্রাচীন অপরিচ্ছন্ন ও সঙ্কীর্ণ চিৎপুর রাস্তা। তদনন্তর গঙ্গাতীরের বহু সোপান শোভিত ও বাণিজ্য দ্রব্যে পরিপূরিত ও রেল বিচ্ছন্ন গঙ্গাতীরের পথ। কলিকাতার দেশীয় বিভাগে স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ ও অপকৃষ্ট পথ আছে সত্য কিন্তু প্রধান পথ সকল অতি প্রশস্ত ও সরল। যতদূর দৃষ্টিপাত কর সমতল সৌধমালা সরলভাবে চলিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাদি সুশোভিত আলোকদণ্ড সমন্বিত ও প্রস্রবণরাজি বিরাজিত মনুষ্য চলিবার উচ্চ পথ। মধ্যস্থলের নিম্ন ভাগ দিয়া বগী, ফেটন, ট্যাণ্ডাম, বেরুষ, কোচ, হ্যাকনী, শকট, পালকি, ট্রামগাড়ী দণ্ডে চল্লিশ খান চলিতেছে। যে স্থানে আহ্বান কর, যান সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত। সকল পথই লোকে আকীর্ণ। কেবল রাত্রি দুইটার পর কিছু স্তব্ধ হয়। কলিকাতায় প্রায় সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্ব বিষয়ক সর্ব্ব দ্রব্যই পাওয়া যায়। এখানে স্কুল, সভা, প্রেস, পুস্তকালয় নাট্যশালা, ময়দাদির কল ও নানা ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মাধিকরণ মন্দির বিস্তর আছে। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, জঙ্গলপূর্ণ, ব্যাঘ্র ও সর্পের আবাস ছিল। মনুষ্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প। পূর্ব্বদিকস্থ বাদার বিলের জল গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইত। পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণস্থ সাগর ও তত্তীরবর্ত্তী সুন্দর বনের প্রতাপে লোকের বাস করা ভার হইয়া ছিল। কেবল দক্ষিণদিকস্থ কালীঘাটের তীর্থ দর্শনার্থে লোক আগমন করিত। ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দ অবধি কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এখন ইহার তুল্য নগর এসিয়াখণ্ডে আর নাই।

কলিকাতা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত গঙ্গার আশ্চর্য্য ভাসমান সেতু। দুই দিকে গ্যাসের শোভা ও মনুষ্য চলিবার পথ। জাহাজ প্রবেশ করিবার কালে কিয়দংশ উদ্ঘাটিত হয় এবং পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। যখন গাড়ী সকল গমন করে, তখন কি গভীরই গর্জ্জন হইতে থাকে। পুল পার হইয়া হাবড়া ষ্টেসন। এই খান হইতে জেটি খচিত কলিকাতা দেখিতে অতিচমৎকার। ষ্টেসনের উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত ডক-ইয়ার্ড। দূরে ঘুসড়ীর কল। হাবড়ার

ষ্টেসনের ভাব নিতান্ত দাম্ভিক। নদী সকল সাগরে প্রবেশ করিবার কালে যেমন মুখব্যাদন করিয়া সমস্ত গৌরব বিস্তার করে, হাবড়া ষ্টেসন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সেই রূপ গৌরব প্রকাশ করিতেছে। কত দিকে কত রেল, কত গাড়ী, কত কল, কত মাল কত দূর ব্যাপ্ত করিয়াছে। এইরূপ স্থানে আমরা ট্রেণে আরোহণ করিলাম।

হাবড়া পার হইয়া উভয় পার্শ্বে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র। পথে চাঁদমারীর পুল। অনতিদূরে কামান প্রস্তুতের প্রাচীন স্থান। তাহার পর বালির পুল। ওয়ারন সাহেবের কৌশলে এই পুল বিনির্ম্মিত। ইহা দুই সহস্র স্তূপের উপর অবস্থিত আছে। খালের উপর বড় রাস্তার দোদুল্যমান পুল ডেক্স সাহেবের মতে প্রস্তুত হইয়াছে। নিকটে পাটজনিত কাগচের কল। বালী পার হইয়া কোন্নগর। মধ্যে মধ্যে ধান্য ক্ষেত্র, পানের বরজ ও পনসের ঝোঁপ। কোন্‌নগরের অপর পারে পাঁচ ক্রোশ দূরে তিতাগড় নামক স্থানে ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে ত্রিশ হাজার মণের উপযুক্ত জাহাজ প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে কোন্‌নগর প্রকাণ্ড গ্রাম ছিল। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইলে বল্লাল বিভক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অনেকে কোন্‌নগর হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। কোন্‌নগরের ৫॥ ক্রোশ পরে শ্রীরামপুর। ১৮৩৫ অব্দে দিনেমারেরা বারো লক্ষ টাকায় কোম্পানিকে এই স্থান বিক্রয় করে। এখানে দেখিবার মধ্যে গির্জ্জা কলেজ ও কেরিসাহেবের বাগান এই কয়েকটী প্রধান। শ্রীরামপুরের অপর পারে চানকের মনোহর উদ্যান ও পলতার জলের কল। শ্রীরামপুরের পর* বৈদ্যবাটীর প্রকাণ্ড হাট। তাহার তিন ক্রোশ পরে ফরাশিদিগের চন্দননগর,† সহরের উত্তরে প্রাচীন দুর্গের এখনও ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। নদীতীর হইতে ফরাশিদিগের আবাসস্থান দেখিতে অতি সুন্দর। তদনন্তর হুগলী,‡ এখন যেরূপ কলিকাতা বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে হুগলী এরূপ ছিল। তখন পোর্ত্তুগীজ-

---

* পাত পাঁকাটী কাঠের আটী, তিন নিয়ে বৈদ্যবাটী।

† গাঁজা গুলি অন্নভাঙ্গা, তিন নিয়ে ফরাশি ডাঙ্গা।

‡ মোগল মিশি মাথাঘসা তিন দেখতে হুগলী আসা।

দিগের বাঙ্গালায় বড় আধিপত্য। বর্ত্তমান এমাম বাটীর নিকট তাহাদের কেল্লা ছিল। সাজেহানের আজ্ঞা ক্রমে ১৬৩২ অব্দে কাশিম আলি হুগলীর দুর্গ করিয়া পোর্ত্তুগীজ দিগকে বিনাশ করেন। ১৬৮৬ অব্দে ইংরেজরা ও ১৬৯৫ অব্দে উড়িষ্যার পাঠানেরা এই নগর আক্রমণ করে। এখানে দর্শনযোগ্য বিষয়ের মধ্যে এমামবাড়ী, ১৫৯৯ অব্দে নির্ম্মিত বান্দেলের পোর্ত্তুগীজ গির্জ্জা, ১৮১০ অব্দে পেঁরো সাহেব নির্ম্মিত হুগলী কলেজ গৃহ, গোরাবারিক ও বোটানিকেল উদ্যান এই কয়েকটি প্রধান। চুচুড়ার গোরাবারিকের নিকট ওলন্দাজদিগের কেল্লা ছিল। ১৮২৫ অব্দে ওলন্দাজেরা সুমাত্রা লইয়া ইংরেজদিগকে এই নগর প্রদান করে। চুচুড়ায় ১৬৯৫ অব্দে নির্ম্মিত আর্ম্মানি গির্জ্জা ও ওলন্দাজদিগের কবরের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। হুগলী ষ্টেসন পার হইয়া সরস্বতীর উপর সাতগাঁর পুল। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে এই নদীর উপর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলিত। সাতগাঁ প্রাচীন সপ্তগ্রাম। যাহা এককালে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। প্রাচীন রোমানদিগের সময়াবধি পোর্ত্তুগীজদিগের সময় পর্য্যন্ত ১৫০০ বর্ষ কাল বহু ব্যবসায়ী লোক পূরিত সপ্তগ্রাম অতি প্রকাণ্ড বানিজ্য স্থান ছিল। প্লিনি ইহার কি ভয়ানক আতিশয্যই বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বে গঙ্গার বেগ সাতগাঁ, হুগলী, শ্রীরামপুরাদির পশ্চিম ভাগ, হাবড়ার বর্ত্তমান জলাজমী ও আদ্য গঙ্গার খাল দিয়া বারুইপুর ও রাজগঞ্জ হইয়া কলাগেছে নামক স্থানে মিলিত হইত। পরে গঙ্গা বর্ত্তমান পথ অবলম্বন করাতে ১৬৩০ অব্দাবধি সপ্তগ্রাম হতশ্রী ও হুগলী বৃদ্ধিশীল হইল। এখন (ট্রঙ্করোড) বড় রাস্তার সেতুর নিকট সপ্তগ্রামের দুর্গচিহ্ন পাওয়া যায়। আকবরের সময় পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম উড়িষ্যার উত্তর সীমা ছিল। তদনন্তর মগরা। মগরা হইতে ত্রিবেণী অর্দ্ধ ক্রোশ। ত্রিবেণী দক্ষিণ প্রয়াগ বলিয়া খ্যাত। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী প্রয়াগে যুক্ত বেণী ও এখানে মুক্ত বেণী হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ত্রিবেণী। ত্রিবেণী হইতে এক বাঁধ মগরা ষ্টেসন হইয়া পশ্চিমে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় এইটি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমা ছিল। শত বর্ষ পূর্ব্বে দামুদর বর্ত্তমান মগরা পুলের নিম্ন দিয়া হুগলীর উত্তর নসারাই নামক স্থানে গঙ্গায় আসিয়া পতিত হইত। কিন্তু এক্ষণে দামুদর মগরার দশ ক্রোশ পশ্চিম দিয়া কলাগেছের নিকট গঙ্গায় মিলিত হইতেছে। এবং

তাহার বালুকাতে নাবিকদিগের ভয়াবহ জেমস ও মেরি সোল নামক মগ্নম্যা জন্মিয়াছে।

মগরার ৪॥ ক্রোশ দূরে পাণ্ডুয়া। এই সময় আমরা বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিলাম। সমুদ্র সন্নিহিত বাঙ্গালার ভাব পরিবর্ত্তিত প্রায়, নারি-কেল, পনস ও কদলি-কানন ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। মৃত্তিকা ক্রমেই কঠিন আলোহিত ও চিক্কণ। ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে পাঁচ মাইল প্রাচীর বেষ্টিত গভীর পরি-খাবৃত ও টাকশাল সমন্বিত পাণ্ডুয়া নগর হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল। তাঁহাদের দিল্লীর সম্রাটকে পত্রাদি লিখিবার জন্য এক জন মোগল কর্ম্মচারী ছিল। সে সন্তানের জন্ম উপলক্ষে গোবধ করায় নগর বাসীরা তাহার সন্তান হত্যা করে। নিরাশ্রয় মুসলমান সম্রাটকে এই বিষয় নিবেদন করিলে ফেরোজ তোগলক সৈন্য সহ সা সফীকে প্রেরণ করিলেন। ষ্টেসনের পশ্চিম মাঠে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর হিন্দুরা পরাভূত হইল। এই রূপ ৬১ পুরুষ রাজ্য ভোগের পর ১৩৪০ অব্দে প্রদ্যুম্ন নগরের হিন্দু-রাজ্য বিলুপ্ত হইল। এখনও ভগ্ন দুর্গের কিয়দংশ নগরের পার্শ্বে স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় এবং কিয়-দংশ উৎখাত করিয়া তদুপরি ষ্টেসন নির্ম্মিত হইয়াছে। মুসলমানেরা সমস্ত হিন্দুদিগকে নষ্ট করিয়া তদুপরি এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে, এখন কিয়-দংশ বসিয়া গিয়াছে। স্তম্ভের পার্শ্বে ২০০ ফিট লম্বা ও ৬০ কলসযুক্ত আশ্চর্য্য প্রস্তিবর কারী সা সফির ভজনালয়। সম্মুখে তাহার কবর। কিছু দূরে ৫০০ বর্ষের খাত ৪০ ফিট গভীর মুসলমানদিগের পীরপুকুর। তাহা-রই চারিপার্শ্বে পাণ্ডুয়ায় পতিত মুসলমানদিগের কবর। পুষ্করিণীতে ফতেখাঁ নামক কুম্ভীরকে আহ্বান করিলে খাদ্য লোভে আগমন করে। ষ্টেসনের ৪০০ হাত অন্তরে হিন্দুদিগের অমৃত কুণ্ড। লোকে বলিয়া থাকে নিহত হিন্দু সৈন্যগণ উহার জল স্পর্শ মাত্র সজীব হইত। মুসল-মানেরা উহার গুণ নষ্ট করে।*

বর্দ্ধমান। পাণ্ডুয়ার পনর ক্রোশ দূরে বর্দ্ধমান। এই জেলার মধ্যে এত লোকের বাস যে, এত অল্প স্থানে এত অধিক লোকের বাস পৃথিবীতে প্রায়ই

---

* মসীদ ঝুঁকড়ো নেড়ে, পোঁড়োয় আছে পড়ে।

দেখিতে পাওয়া যায় না। পতিত ভূমি অতি অল্প, সর্ব্বত্রই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে নদীনিচয়ের কুলু কুলু ধ্বনী, কৃষকগণ সানন্দ মনে বটতলে বিশ্রাম করে এবং দূরস্থিত তালরাজি দর্শকের দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করিয়া থাকে। বর্দ্ধমানের ষ্টেসন অতি পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান, তন্মধ্যে কৃত্রিম উৎস উৎসলিত হইতেছে, নিকটে হোটেল ও নিস্ব পথিকের পান্থশালা। অনতিদূরেই মহারাজার প্রকাণ্ড রাণীসায়র পুষ্করিণী, তাহার কিছু দূরে গভীর সামসায়র, তন্নিকটে হস্তীশালা। রাজবাটী ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইল, প্রাসাদ ইংরাজী প্রথায় বিনির্ম্মিত, তন্মধ্যে মহতপ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিত আছে। বর্দ্ধমানের মহতপ মন্দির, দেবালয়, অশ্বশালা, দেলারাম, প্যালাস কুঠী ও দেলখোসবাগ দেখিবার উপযুক্ত। দেবালয়ের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ, সর্ব্বমঙ্গলা ও রাধাবল্লভজীর বাটী এবং ছোট দেউড়ী এই কয়েকটী প্রধান। দেবহর্ম্ম্যগুলি পরিষ্কৃত, সুসজ্জিত ও মনোহর। ঝুলনের সময় দেখিবার বড় শোভা। কিন্তু মহারাজার নাম চিরস্থায়ী হয় এরূপ উচ্চ মন্দির বর্দ্ধমানে একটিও নাই। অশ্বশালা ও দেলারাম রাজবাটী হইতে দূর নহে। দেলখোসবাগ ষ্টেসন হইতে দেড় মাইল অন্তর। কৃষ্ণসায়র, প্যালাসকুঠী, পাতালঘর, পশুশালা ও গোলক ধাঁন্দাদি লইয়া দেলখোসবাগ বহুদূর বিস্তীর্ণ। স্থান অতি মনোহর। নির্ম্মল সলিল পূর্ণ, সুদীর্ঘ সরোবরের প্রান্তভাগে প্রশস্ত প্রাসাদ কি শোভাই বিস্তার করিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর উপবনের শোভা মন ও নয়ন আকর্ষণ করিতে থাকে। কোথাও বা বৃক্ষসজ্জের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ সঞ্চরণ পথ, কোথাও বা নব্য জন আকাঙ্ক্ষণীয় লতাবিতান, কোথাও বা কোবিল নিনাদিত নিকুঞ্জ বন, কোথাও বা নব কিশলয় শোভিত তরু রাজির শীতল ছায়া, কোথাও বা প্রষ্ফুটিত প্রসূনচয়ের মধুর সৌরভ, কোথাও বা নানাকারে কর্ত্তিত কামিনীতরুর কমনীয় শোভা, কোথাও বা মত্ত মধুপের গুঞ্জন শব্দ, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার ধ্বনি, ময়ূরের কেকারব, হরিণের সচকিত দৃষ্টি ও মৎস্যের মনোহর ক্রীড়া। বর্দ্ধমানের প্রাচীন চিহ্ন সকল বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে। লোকে মালিপোঁতায় সুন্দরের সুড়ঙ্গাদি দেখাইয়া দেয়। কিন্তু সে কেবল নাম মাত্র। পৌরাণিক বর্দ্ধমান বা কুসুমপুর দামোদরের বেগে বিনষ্ট হই-

য়াছে। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল নদী দিয়া প্রাচীন রোমানেরা বাণিজ্যার্থ বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিত, এখন তাহারা শুষ্ক প্রায়। সুপ্রসিদ্ধ বেউলা নদীর নিতান্ত হীনাবস্থা। গ্রীক গ্রন্থকারগণের সে বরগুঁয়া নগর আর নাই। চারি ক্রোশ দূরে রোমান কথিত করজনায় এক পুষ্করিণী ও বটের শুষ্ক কাণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। মুসলমানেরা বর্দ্ধমানকে বর্ত্তমান স্থানে শোভাশালী করে। জগৎ বিখ্যাতা নুরজেহান এই নগরে কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার কন্যা হয় এবং এই নগর হইতে তিনি হৃতা হইয়া ছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বিলাসী সম্রাট সাজেহাম বিদ্রোহী হইয়া এই নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৬২১ অব্দে মোগলেরা এই নগর অবরোধ করে। ১৬৯৫ অব্দে শোভাসিংহ এই নগর লুণ্ঠন করিয়া জগৎরাম রায়ের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে, ও তাঁহার পিতাকে বধ করে। ১৬৯৮ অব্দে ইংরেজেরা বর্দ্ধমানে আসিয়া আজিম ওষানের নিকট কলিকাতা ক্রয়ের প্রথম অনুমতি পান। ১৭৪৩ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি দুরন্ত ভাস্কর পণ্ডিত এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য সহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া এই নগর ভস্মীভূত করেন। উত্তর দিকের মাঠে সুবাদার আলিবর্দ্দীর সহ তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ত্রিশ সালের বন্যায় বর্দ্ধমানের অনেক গৃহ বিনষ্ট হইয়াছিল। বর্দ্ধমান সমুদ্র হইতে ৯৩ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বে এখানকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট ছিল। রেলওয়ে হওয়ার কিছু কাল পরে মহামারী প্রবেশ করিয়াছে। এবং এক্ষণে কদলী ও নারিকেলাদি স্বচ্ছন্দে জন্মিতেছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা গবর্ণমেণ্টকে ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করেন। কিন্তু ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক সময়ে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়াছেন। এক সময়ে ইহাঁরা বর্দ্ধমান জেলায় কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য বন্ধ করিয়াছিলেন, এবং সম্রাট সাহআলমকে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের বংশ ব্রহ্মত্র দানের জন্য বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। স্বাধীন রাজাদিগের রাজ্যেও এরূপ দান নাই। কিন্তু পত্তনিদারেরা রাজার নিকট ক্ষমতা না পাইয়াও সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিতেছে। মহারাজার বর্ত্তমান জমীদারী দীর্ঘে ৪৫ ও প্রস্থে ৪৩ মাইল অপেক্ষাও অধিক। প্রাচীন রাজাদিগের খাত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণী থাকায়

জেলায় প্রায়ই জল কষ্ট নাই। বৰ্দ্ধমানের সীতাভোগ, লালমোহন, মিহি-দানার মিঠাই, খাজা ও চিনির পাকের দ্রব্য প্রসিদ্ধ।

কানু। বৰ্দ্ধমানের এক মাইল পরে মহারাজার ১০৮ মন্দির। তাহার পর কানুজংসন। রেল পৃথক্ ভূত। বাম দিকে বৈদ্যনাথ হইয়া কর্ডলাইন ও ডাইন দিকে রাজমহল হইয়া লুপলাইন চলিয়া গিয়াছে। উভয়ে লক্ষ্মী-সরাইয়ে পুনরায় মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কানুর ধুম ধাম ছিল, এখন ভগ্নাবস্থা। নিকটে বনপাসের লৌহ দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ।

মানকর। কানু হইতে মানকর ৭ মাইল। ভূমি ক্রমেই কঠিন ও ঘুটিঙ্গে আবৃত। পথে বড় রাস্তা (ট্রঙ্করোড) কাকসা নামক স্থানে দ্বিখণ্ডিত হই-য়াছে। বাম দিকে ছাতনার ধূমময় মূৰ্ত্তি দূরে প্রকাশমান। এই পাহাড় ৬৬ হাত অপেক্ষাও অধিক উচ্চ। ক্রমে যত যাও সমতল ক্ষেত্র আর দৃষ্টি গোচর হয় না। সামুদ্রিক সজল বায়ুর পরিবর্ত্তে পাৰ্ব্বতীয় নীরস বায়ু অনুভূত হইতে থাকে। ভূমি সাগর তরঙ্গের ন্যায় উচ্চাবচ হইয়াছে। উচ্চস্থান সকল নীরস কঙ্করময় ও অনুর্ব্বরা। কেবল নিম্ন প্রদেশে শস্যাদি লক্ষিত হয়। মানকরের কদমা উত্তম।

পানাগড়। মানকর হইতে পানাগড় ৭ মাইল। [পথে কালিপুরের কঠিন খাত। সম্মুখে ইষ্টক নিৰ্ম্মিত আশ্চর্য্য সেতু। কেবল একটি মাত্র খিলান অথচ ৫৩ হস্ত বিস্তৃত। এই সেতু চারি মাসে নির্ম্মিত হয়। পশ্চিমে তমলা নদীর প্রকাণ্ড বাঁধ। তদনন্তর তমলার ১৭ খিলান বিশিষ্ট সেতু। প্রত্যেক খিলান ১৩৷৷০ হাত প্রশস্ত। নিকটে ডাইন দিকে ময়ুর আদি বনচর পক্ষিপূর্ণ কয়র সোলের সুদৃশ্য জঙ্গল। বাম দিকে শুভ্র বালুকার মধ্যদিয়া দামোদর মৃদু মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। কয়র সোলের কয়লা খনি বাঘসামা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে।

অন্দল। পানাগর হইতে ১৭ মাইল। ডাইন দিকে সিঙ্গারন হইতে কয়লা আনিবার পথ। সিঙ্গারণের নিকট দামোদরের বিস্তীর্ণ বাঁধ। পুর্ব্বে এই বাঁধ না থাকাতে রেলওয়ের বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছিল। এখানকার সেতু ১৫ খিলান বিশিষ্ট প্রত্যেক খিলান ১৮৷৷০ হাত। অনতিদূরে ননীয়া ও দামোদরের সঙ্গম স্থল। ইহার নিকট মৃত্তিকা নিম্নে বহু কালের এক প্রকাণ্ড

অরণ্যানীর অবশেষ পাওয়া যায়। মিসরে কেরো নগরের নিকট এই রূপ এক বনের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

রাণীগঞ্জ। অন্দল হইতে নীরস আপীত উচ্চাবচ ভূমি ক্রমশই উচ্চ হইয়া গিয়াছে। ছাতনা, বেহারিনাথ ও পাচেটের পাহাড় সকল স্পষ্টরূপে প্রকাশ্যমান। ছয়ক্রোশ দূরেই বেহারিনাথ। পাল্কী করিয়া যাওয়া চলে। উচ্চতা ৮০০ হাত। রাণীগঞ্জের পাহাড় সকল হিমবান হইতেও প্রাচীন। এক কালে ইহারা সমুদ্রের অভ্যন্তরে ছিল সত্য কিন্তু সে যে কত কাল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়লার খনি উৎখাত করিতে প্রায় ৩০ প্রকার উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ৬৭ বৎসর গত হইল দামোদরের বেগে ভগ্ন এক স্থানের মৃত্তিকা দেখিয়া জোন্স সাহেব কয়লার খনি আবিষ্কার করেন। ৯০ ফিটের নিম্নে কয়লা ছিল। রাণীগঞ্জে মণ প্রতি এক আনা খরচায় বার্ষিক ১৬০ লক্ষ মণ কয়লা উঠিতেছে। আফিস খরচা সহ প্রতি মণে তিন আনা পড়িয়া থাকে। এই খনিতে বাউড়ী জাতীয় প্রায় চারি হাজার স্ত্রী-পুরুষ কার্য্য করিতেছে। রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে লৌহও পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জঙ্গল ছিল কিন্তু পরিষ্কৃত হওয়াতে ভূমি রসহীন ও অনুর্ব্বরা হইয়াছে। এখানে বনপাশের আমদানী লৌহদ্রব্য ও মৃত্তিকার চাকচিক্যশালী টাইল প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। দূরে তসর শালপাতা ও মৌল প্রভৃতি বনজাত দ্রব্য পাওয়া গিয়া থাকে।

রাণীগঞ্জ পার হইয়া কয়লাপূর্ণ সেহারসোল ও নিমচার ক্ষেত্র। তাহার এক মাইল দূর হইতে নুনীয়া নদীর দোদুল্যমান সেতু দৃষ্ট হয়। নুনীয়া নদী ও আসানসোল ডাক বাঙ্গালার মধ্যে এক আশ্চর্য্য পদার্থ দৃষ্টি গোচর হইবে। এক কালে এই স্থানে ভূগর্ভ ফাটিয়া পাতাল হইতে প্রবল অগ্নি উত্থিত হয়। উহার দুরন্ত তেজে ভূগর্ভস্থ পদার্থ সকল দ্রবীভূত হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে দশ ক্রোশ লম্বা ও ৮০ হাত প্রশস্ত এক প্রস্তরের অতলস্পর্শ প্রাচীর জমিয়া গিয়াছে। কঠিন কৃষ্ণবর্ণ গোল গোল যে সকল প্রস্তর খণ্ড শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা ঐ প্রাচীরের উপরিভাগ। পৃথিবী উহাদিগকে দ্রবীভূতাবস্থায় উদ্গীরণ করে। রাণীগঞ্জের নানা স্থানে এইরূপ আগ্নেয় প্রস্তরের প্রাচীর জন্মিয়াছে। ইংরেজেরা মধ্যে মধ্যে কলি-

কাতার রাস্তায় দিবার জন্য এই স্থানের প্রস্তর আনেন। কিন্তু উহা বড় কঠিন। রাণীগঞ্জের ভূমি উৎখাত করিলে বা নদী দ্বারা উৎখাত ভূমি দৃষ্টি করিলে বালুকাময় প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইবে। জলের অভ্যন্তরে জলের কর্দ্দমাদি একত্রিত হইয়া প্রাণীদিগের অস্থিসহ ঐরূপ প্রস্তর উৎপন্ন হয়। ইহাকেই ভূতত্ত্ববিদ্যায় ষ্ট্রাটিফায়েড্ রক বলে। পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয় প্রাচীরের উত্তাপে অনেক বালুকাময় প্রস্তর উত্তপ্ত হইয়া ভিন্নাকার হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন স্পষ্টই এক সময় গলিয়া গিয়াছিল। পরে শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে। কোন কোনটার গাত্রে আমিষের ন্যায় কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ দাগ সকল চক চক করিতেছে, ইহাকেই ভূতত্ত্ববিদ্যায় মিটামরফোজ্‌ড্ রক বলে। ছোট নাগপুর ও হাজারি বাগ পাহাড়ে ইহা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

সীতারামপুর। কলিকাতা হইতে ১৩৯ মাইল। এই স্থান হইতে বরাকরের দিকে এক শাখা রেল চলিয়া গিয়াছে। পুরুলীয়া ও হাজারীবাগের যাত্রীরা ঐ শাখারেলে গমনাগমন করে। এই রেল পরেশনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। যেহেতু ইহার অনতিদূরেই ঝিরাইয়ের ২৭০ মাইল বিস্তৃত কয়লাক্ষেত্র আছে। দামোদরের পার্শ্বে পার্শ্বে রামগড় ও পালামো পর্য্যন্ত স্থান সমস্তই কয়লায় পরিপূর্ণ। এই স্থানের প্রস্তর চুনারের প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন। এই জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থে কলিকাতায় আনীত হয়। বরাকরের যে বৃহৎ সেতু দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নির্ম্মাণ করিতে গবর্ণমেণ্টের ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল।

বরাকরে রেল ত্যাগ করিলে পদব্রজে পরেশনাথ পাহাড় ২৫ ক্রোশ দূরে থাকে। পরেশনাথের পর পিটকোর ও বেলকপির প্রস্রবণ। তাহার পর ১৩০০ ফিট উচ্চ ও প্রতিমাইলে ৭০০ ফিট নিম্ন বিবিধ দৃশ্য সংযুত পার্ব্বতীয় ধরাপথ। তদনন্তর কিমোর পাহাড় ও শোণ তীরে রোটাস-দুর্গ। এই স্থানেই বরাকরের উৎপত্তির নিকট চানির থর্ম্মাল প্রস্রবণ। পালামো সরগুজা ছোটনাগপুর ও প্যাচেটের পাহাড়ে ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি ভীষণ জন্তু পুরিত আদি কালের অরণ্যানি, অসভ্যদিগের বিচ্ছিন্ন আবাস, পৃথিবীর বারম্বার পরিবর্ত্তনের নানা চিহ্ন, মধ্যে মধ্যে নির্ঝর ও সুশীতল

উৎস, দামোদর ও অজয়াদির ক্ষীণ উৎপত্তি স্থান, বিবিধ জাতীয় পক্ষী ও বন্য তরুরাজির শোভা দেখিয়া মন অতীব আহ্লাদিত হয়। কিন্তু রেল ত্যাগ করিয়া পদব্রজে ও অপরাপর যানে এত দূর ভ্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে।

মাইজাম। কলিকাতা হইতে ১৪৯ মাইল। নিকটে সামদীর বাজার, শস্য তৈল ও পশ্বাদি দেশজ দ্রব্য কলিকাতায় রপ্তানি হইতেছে। মাইজাম পার হইয়া অরণ্যানি পরিবৃত বুদমার সুদৃশ্য পাহাড়। তাহার পর জামতারা। এখানে এক জন ক্ষুদ্র রাজা ও ডেপুটী কমিশ্যনর আছেন। তদনন্তর খরমাতর। খরমাতর হইতে দুই ক্রোশ দূরে ব্যবসায় স্থান কোরানগ্রাম। কোরানগ্রামে এক কয়লার খনি আছে। তাহার পর সম বিষম ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে জয়ন্তীয়ার সেতু দৃষ্ট হয়। সেতুর কিছু দূরে মধুপুর। বাম দিকে করহরবালীর শাখা রেল চলিয়া গিয়াছে। এখানকার কয়লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১১ বর্গ মাইল কয়লা ক্ষেত্র মধ্যে ৩৮ কোটি মণ কয়লা আছে। বার্ষিক আড়াই লক্ষ মণ উঠিলেও তিন শত বৎসর চলিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষে যত কয়লা উৎপন্ন হয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি তাহার অর্দ্ধেক গ্রাস করেন। করহর বালীর কয়লা ক্ষেত্র মধ্যে ১৫টি আগ্নেয় প্রাচীর আছে, এবং রাজমহল পর্য্যন্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে পরেশনাথ দশ ক্রোশ। নিকটেই পাল্কী পাওয়া যায়। ৬ ক্রোশ দূরে পালগঞ্জ গ্রাম। পথিমধ্যে বরাকর নদী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে জল শুষ্ক থাকে। পালগঞ্জের ৪ ক্রোশ দূরে পরেশনাথ। পর্ব্বতের পাদদেশে মেধবন ও উপরে জৈন প্রভু পার্শ্বনাথের মন্দির। উঠিবার উৎকৃষ্ট সিঁড়ি আছে। এখানে বর্ষে বর্ষে অর্দ্ধ লক্ষ জৈন যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে।

দেবঘর বা বৈদ্যনাথ। খ্যাত দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে বৈদ্যনাথ এক লিঙ্গ। স্থানটি গ্রামের ন্যায়। শিবালয় ও মন্দিররাজির শোভা অতি, রমণীয়। বর্ত্তমান মন্দির ১৪৭৭ শকে বিনির্ম্মিত। নিশাকালে কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বৈদ্যনাথের পুজা হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা বৈদ্যনাথের মুর্ত্তি কিঞ্চিৎ কৃশ। মস্তকে একটি দাগ আছে। বৈদ্যনাথ ব্যতীত এখানে বীর-

নাথ সন্ধ্যানাথ গণেশ কার্ত্তিক পার্ব্বতী প্রভৃতির দ্বাবিংশতি মন্দির আছে। ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৩২ খানি নিষ্কর গ্রাম দিয়াছেন। শিবরাত্রির সময় বৈদ্যনাথে বিস্তর যাত্রী উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে বাঙ্গালা মিশ্রিত হিন্দী আরম্ভ হইল।

বৈদ্যনাথ পার হইয়া শিমুলতলা। তাহার পর নরজুগঞ্জের খাত। এত খাত যেন উভয় পার্শ্বে প্রস্তর প্রাচীরের মধ্যদিয়া গাড়ী চলিতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে উপরকার জঙ্গলের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এত খাতেও স্থানে স্থানে এত উচ্চ আছে যে, সময়ে সময়ে মালগাড়ীর জন্য নওয়াদি হইতে আর একখান কল প্রেরিত হয়। নওয়াদীর পর গিধোর রাজের জমীদারী। ইনিই বিনামুল্যে রেলওয়ে কোম্পানিকে দশ ক্রোশ পথ প্রদান করেন। পতসন্দাতে উহাঁরই বাটী গাড়ী হইতে দৃষ্টি-গোচর হয়। এখানে কীল নদীর পার্শ্বগুলি উর্ব্বরা ও আফিমের চাসে পূর্ণ। গিধোরের পর জামুই। ব্যবসার স্থান জামুই নগর ষ্টেসন হইতে দূরে কীল-তটে অবস্থিত। নাম মলিপুর। তদনন্তর মিরনপুর। ইহার নিকট কীলের পশ্চিম তটে মৃগয়ার উপযুক্ত জৈনগরের পাহাড়। তদনন্তর লক্ষ্মীসরাই। যেখানে লুপ ও কর্ড লাইন মিলিত হইয়াছে।

লুপলাইন।—এক্ষণে আমরা লুপলাইন দিয়া লক্ষ্মীসরাই আগমন করিব। বর্দ্ধমানের দশ ক্রোশ দূরে গুস্করা। গুস্করা ও ভেদিয়া পার হইয়া অজয়ের ২২০০ ফিট লম্বা সেতু ৫০ ফীট করিয়া ৩৬ খিলানে বিভক্ত। স্তম্ভের মূল ৯ হইতে ১৫ ফীট পর্য্যন্ত বালুকায় প্রোথিত আছে। অজয় বর্ষাকালে স্থানে-স্থানে গঙ্গা তুল্য বিস্তৃত হয়।

তদনন্তর বোলপুর। কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল। ইহার এক ক্রোশ দূরে সুরুল। সুরুলে পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের এক প্রকাণ্ড রেশমের কুঠী ছিল। বোলপুর হইতে কলিকাতায় বিস্তর তণ্ডুল রপ্তানি হয়। বোল-পুরের ৪॥০ ক্রোশ দূরে ইলেম বাজার। ইলেমবাজারের চৌপাহাড়ির বন ৪ ক্রোশ বিস্তীর্ণ। এখানে অতি উৎকৃষ্ট গালার দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং এই স্থান লাক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহারই নিকট সেনকাপুরের গুল বিখ্যাত। এবং ইহারই অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল।

আমদপুর। কলিকাতা হইতে ১১২ মাইল। এখান হইতে সাওতাল পরগনার পাহাড়ের শীর্ষ দেখা যায়। সিউড়ী ৫॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা নাই। আমদপুর প্রভৃতি বাঙ্গালার উচ্চ বিভাগের মৎস্য অতি সুমিষ্ট, কিন্তু বেহারে প্রবেশ করিলে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ বোধ হয়।

সাইতা। কলিকাতা হইতে ১১৯ মাইল। মুরী তীরে অবস্থিত। মুরীর সেতু অজয় হইতে ৩০০ ফীট হ্রস্ব। সাইতার ছয় ক্রোশ দূরে সিউড়ী। গাড়ী ভাড়া প্রায় ২ টাকা। বর্ষাকালে স্থান অতি শীতল থাকে। জেলার ভূমি বালুকা ও প্রস্তরে পরিপূর্ণ, ইহার স্থানে স্থানে অভ্র, কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানের লৌহ সুইডেনের তুল্য উৎকৃষ্ট। সিউড়ির নিকটে সারখনি ও কোরা নামক স্থানে চা খড়ির খনি আছে। পশ্চিমদক্ষিণে দুবরাজপুরের পাহাড় অতি মনোহর। পর্ব্বতের মস্তকটি ধুস্তূরা পুষ্পের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। ৮ ক্রোশ দূরে গুণুটীয়ার রেশমের প্রকাণ্ড কুঠী। সিউড়ীতে শাল, পিয়াল, মৌল, সেগুণ জাতীয় কাষ্ঠ, খদির ও লোহার দ্রব্যাদি উত্তম পওয়া যায়। জঙ্গলবাসীরা বাঁশের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনে। এখানকার মোরব্বা ও পিয়াল মিঠাই অতি উৎকৃষ্ট। সিউড়ীর অনতিদূরে বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ। তথায় অষ্টাবক্রের প্রতিষ্ঠিত বক্রেশ্বর নামক শিব, পাপহরণ নদী ও কুণ্ডাদি আছে। বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী নাগোর নগর অল্প দূরে অবস্থিত।

মল্লারপুর। কলিকাতা হইতে ১৩০ মাইল। ইহারই অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে মহম্মদপুরে লোহার কারখানা। মল্লারপুরের পর আমরা মুরশিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করিলাম। তদনন্তর রামপুরহাট। এখান হইতে অনেক শস্যাদি কলিকাতায় রপ্তানি হয়। তাহার পর নলহাটি।

নলহাটিতে মুরসিদাবাদ দেখিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল ত্যাগ করিয়া ডাইন দিকের রেলে আরোহণ। যেন প্রবল গঙ্গা ত্যাগ করিয়া বেলেঘাটা খালে ঢুকিলাম। গাড়ী যায় না, নড়িতে চায় না। কত কষ্টে ধানের খেত, কুলের ঝোঁপ, তাল গাছ, খেজুর গাছ ক্রমে অতিক্রম করিয়া ২॥০ ঘণ্টার পর গঙ্গা তীরে আজিমগঞ্জ। ডাইনদিকে রায় ধনপৎ বাহাদুরের বিশাল জৈন মন্দির পঞ্চখণ্ডে গগন শোভিত করিয়াছে। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড

ধ্যান নিমগ্ন শম্ভুনাথের প্রশান্ত মূর্ত্তি বিরাজমান। নানা দিকে নানা তীর্থ-ঙ্করের মূর্ত্তি। ধনপৎ বাহাদুরের স্কুল, চিকিৎসালয়, জৈনপান্থশালা ও অন্যান্য ধনীদিগের মন্দির, আলয় ও ব্যবসা দ্বারা আজিমগঞ্জ যথার্থই গঞ্জ সদৃশ। গঙ্গার অপর পারে ধ্বজপতাকা শোভিত বহু জৈনমন্দির। দুই আনায় গঙ্গা পার হইয়া বালুচর। বালুচরে পান্থশালা, দানশালা, অশ্ব-শালা, উষ্ট্রশালা, শস্যশালা, মন্দির ও হর্ম্ম্যাদি সহ সকলের আশ্রয়ীভূত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় রায় লছমীপৎ বাহাদুর এক পল্লী আবৃত করিয়া আছেন। এই সকল হর্ম্ম্যের মধ্যে পথপ্রান্তে ক্লকটাউয়ার। তাহার সম্মুখে উদ্যানের উপর করিন্থিয়ান ও আইয়োনিক স্তম্ভযুক্ত রায় লছমী-পতের মনোহর প্রাসাদ। বাটীর স্থানে স্থানে এক এক ঘর স্বর্ণ বর্ণে এরূপ সজ্জিত যে নিজামেরও এই জাতীয় ঘরের এরূপ শোভা হয় নাই। সর্ব্বো-পরিস্থ গৃহের ভিত্তির প্রত্যেক ইঞ্চ অতি সুন্দর জয়পুর চিত্রে চিত্রিত। উহার নানা স্থানে নানা নগরের প্রতিকৃতি ও কামিনীগণের কামচাতুর্য্যের পরিচয়। বালুচরের অদূরে মহিমাপুরে জগৎ সেটের বাসবাটী। নিকটে ছত্রবাগ। ইহাতে প্রায় ১০লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রবেশদ্বারের পত্তন অতি চমৎকার। সুসজ্জিত আলয়, সুপরিচ্ছন্ন সরোবর, বিভূষিত মন্দির স্থানে স্থানে মার্ব্বেল মুর্ত্তি, রাশি রাশি ফুল, আম্রের নিকুঞ্জ, পশুশালা ও পক্ষীশালা প্রভাবে বিস্তীর্ণ এই উদ্যান নিতান্তই প্রীতিপ্রদ। উদ্যান মধ্যে এরূপ মার্ব্বেল ছবির ঘটা ভারতে কোথাও দেখা যায় না। তদনন্তর জাফরাগঞ্জে মীরনের ভগ্ন বাটী ও বর্ত্তমান নবাবদের কবরস্থান। ভগ্ন বাটীর মধ্যে সিরাজবধের স্থান এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার পর নেজামত কলেজ, এমামবারা ও নেজামতের গৃহ। গঙ্গা তীরে দুর্গরহিত নেজামতের গৃহ ইংরেজি প্রথায় নির্ম্মিত। অভ্যন্তর ভাগ নবাবের পিতা পুত্র শীকযুদ্ধ ও লণ্ডন সম্বন্ধীয় নানা চিত্রে ভূষিত। পার্শ্বে গোলঘরের ঝাড় ১০৮ ডাল। ত্রিতলে পূর্ব্ব নবাবদের চিত্র। এক দিকে অযত্নাবস্থায় দুর্ভাগ্য সিরাজের চিত্রপট। মুখ বাঙ্গালীর মত, কিঞ্চিৎ লম্বা ভাব, গোঁপ দীর্ঘ ও নয়নদ্বয় আবর্ত্তিত, যেন নেশায় ঘোর হইয়া আছে। এই গৃহের পর নেজামতের অন্তঃপুর। কিছু দূরে নবাবের অশ্বশালা। তাহার পর কাশীম-

বাজারে মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাটী প্রাচীরে লুক্কায়িত। তদনন্তর খাগড়া। তাহার পর বহরমপুর কাছারি ও গোরাবাজার। বালুচর হইতে বহরমপুর ৬ ক্রোশ। এক কালে যে মুরশিদাবাদ কেবল দোকানের আলোকে আলোকিত হইত এখন সে সকল স্থান গঙ্গায় ধ্বংস হইয়াছে। পূর্ব্বকালের বহুল লোকপুরিত স্থান সকল এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এখানকার কাঁশার, হাতীর দাঁতের ও রেশমের জিনিস উৎকৃষ্ট। পক্কান্ন ও খাগড়ার মুড়কী মন্দ নহে। মুরশিদকুলী গৌড়ের ভগ্নাবশেষে মুরশিদাবাদ শোভিত করেন। মালের কাছারি কলিকাতায় উঠিয়া যাওয়ার পর মুরশিদাবাদ হতশ্রী হইতে আরম্ভ হয়। মুরশিদাবাদ দেখিতে ইচ্ছা না হইলে নলহাটি হইতে বামরেলে মুরারি গমন করিবে।

মুরারি। কলিকাতা হইতে ১৫৬ মাইল। নিকটে জঙ্গীপুরে নীলের চাস, ভাগীরথীতে নৌকায় মাসুল আদায় ও অনেক দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। সাঁওতাল পরগণার ১৬০০ ফীট উচ্চ মাহীঘরী পাহাড় ইহার ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

রাজগাঁ। ১৬৩ মাইল। সমতল ভূমি হইতে প্রায় ২০০ ফীট উচ্চ হইয়াছে। বামদিকে দামিনিকোহের বন আরম্ভ। লুপলাইনে এইখানে আমরা সাঁওতাল পরগণায় প্রবেশ করিলাম।

পাকুড়। ১৭০ মাইল। এক জন রাজার আবাস স্থান। ১৮৫৫ অব্দে ৮ সহস্র সাঁওতাল এই নগর লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ করিয়া ছিল। বহু নগরবাসী তাহাদিগের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৮৫৬ অব্দে ইংরেজেরা ৩০ ফীট উচ্চ একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। ৭॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত জঙ্গীপুর ও অধিকতর দূরবর্ত্তী রাজমহলের পাহাড় এখান হইতে নেত্র-গোচর হয়। পাকুড়ের ৫ ক্রোশ দূরে গোমানী নদীর সুদৃশ্য সেতু।

বাহোয়া। নিকটে সাঁওতালদিগের আবাস ভূমি। অনেক সাঁও-তালি দ্রব্য আমদানী হয়। কিছুদূরে সীতাপাহাড়ের খাত। প্রস্তর অত্যন্ত কঠিন ও কঙ্করময়। কাটিবার সময় বিসূচিকায় বিস্তর সাঁওতাল কুলি নষ্ট হইয়াছিল। পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় নদী। বর্ষাকালে এই সকল নদী দুই ঘণ্টার মধ্যে ১২ ফীট বাড়িয়া উঠে।

তিনপাহাড়। কলিকাতা হইতে ১৯৬ মাইল। এই স্থানে রেল তিনটী পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার মধ্য-অধিত্যকার উত্তর পূর্ব্ব সীমা। এই পাহাড় দক্ষিণ পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া বঙ্গের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে আগ্নেয় উপদ্রবের চিহ্ন পাওয়া যায়। বর্ষা-কালে জঙ্গলপূর্ণ এই সকল স্থান নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। তিন-পাহাড়ের ডাইনদিকে রাজমহলের শাখা রেল।

রাজমহল। ১৬৩০ অব্দে এই স্থান বাঙ্গালার সুবাদার সা সুজার রাজধানী ছিল। এক্ষণে ভগ্নাবশেষের মধ্যে ষ্টেসনের এক ক্রোশ উত্তরে কয়েকটী প্রকাণ্ড মসজীদ ও এক রাজবাটীর অংশ আছে। অন্তঃপুরাদি অধিকাংশ ভাগ রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা পথ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিয়াছে। রাজমহলের নিকট মতিঝিরের জলপ্রপাত। পূর্ব্বে গঙ্গা নগরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে স্রোত বহুদূরে পড়িয়াছে। পুনরায় আসি-বার সম্ভাবনা। রাজমহলের মাণিকচকের ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া ৯ ক্রোশ দূরে ইংরেজাবাদ। যাইতে গোযান ভাড়া ১৷৹। ইংরেজাবাদের বিখ্যাত আম্রের নিকুঞ্জ শোভা অতি মনোহর। অপর পারে মহানন্দা তটে মাল-দহ। গৌড় বিনষ্টপ্রায় হইলে অধিবাসীগণ মালদহে আসিয়া বাস করে। ইংরেজাবাদের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে গৌড় নগর। গোযান ১৷৹। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এই নগর এক কালে ৯ ক্রোশ দীর্ঘ ও তিন ক্রোশ বিস্তীর্ণ ছিল। রোমানদিগের বাণিজ্য কালাবধি আকবরের সময় পর্য্যন্ত ইহার কত ঐশ্ব-র্য্যই বর্ণিত হইয়াছে। এখন কৃষ্ণ মার্ব্বেলে সুশোভিত একটি প্রকাণ্ড মস-জিদ এবং ৬৭ হাত উচ্চ রাজবাটীর দুই অদ্ভুত ভিত্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কত দিকে কত ভগ্ন আলয়, রাজাদিগের মালখানা ও উচ্চ উচ্চ মন্দির। কিন্তু চারিদিকে জঙ্গল। ব্যাঘ্রের হুঙ্কার, বৃশ্চিকের দংশন ও সর্পের দৌরাত্ম্যে কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়। কত ইষ্টক ও প্রস্তর লোকে লইয়া গিয়াছে। এখন আর কেহ লইতে পায় না। দুই শত বর্ষ হইল গঙ্গা গৌড় ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে দশ লক্ষ লোকের বাস ছিল। এখন ব্যাঘ্রাবাস ও প্রায় শূন্য পুরী। মালদহের নিকটে মুসলমানপূরিত পাণ্ডুয়া। ইহাও এক কালে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। এখন ভগ্নাবশেষে

পরিপূর্ণ। পাণ্ডুয়ার প্রকাণ্ড মসজিদের আর সে শোভা নাই। গৌড়ের নিকট রামকালীতে চৈতন্যের মেলা হয়। রাজমহলের অপর পারে ৩॥০ ক্রোশ দূরে মাণিক নগরের মেলা হইয়া থাকে।

মহারাজপুর। কলিকাতা হইতে ২১০ মাইল। ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া বর্ষাকালে বামদিকে কিছু দূরে গমন করিলে একটি সামান্য জলপ্রপাত লক্ষিত হয়।

সাহেবগঞ্জ ২১৯ মাইল। পূর্ব্বে এই স্থান হইতে লোকে দারজিলিং যাইত এখান হইতে ষ্টিমারে কারাগোলা ও কারাগোলা হইতে ডাকগাড়িতে দারজিলিং যাইতে ৩০ ঘণ্টা লাগিত। পথে কারাগোলা, পূর্ণিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ ও শিলাগোরী তরাইয়ে এক এক ডাক বাঙ্গালা আছে। এই পথ ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ণিয়া পার হইয়াই বরফমণ্ডিত হিমালয়ের শীর্ষ সকল নেত্রগোচর হয়। উহার মধ্যে যেটি বৃহৎ সেইটিই বিখ্যাত কাঞ্চনগঙ্গা।

সাহেবগঞ্জের এক ক্রোশ দূরে গঙ্গাপ্রসাদ পাহড়। আড়াই ক্রোশ পরে বাঙ্গালা ও বেহারের চাবি স্বরূপ বিখ্যাত তেলিয়াঘর পথ। সা সুজা নির্ম্মিত কেল্লা পূর্ব্বে নদীতীরে ছিল। এক্ষণে এক ক্রোশ দূরে পড়িয়াছে। দ্বারদ্বয় পরস্পর অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে ছিল। এখন আমরা লুপলাইনে ভাগলপুর জেলার সন্নিকৃষ্ট হইলাম।

পীরপৈতি ২৩৪ মাইল। পাহাড়ের তলে অবস্থিত। পর্ব্বতের উপর পীরপৈতি মুসলমানের কবর। শিলাসঙ্গম বা পাথরঘাট পর্ব্বতমধ্যে অনেক গুহা আছে। পূর্ব্বে তথায় সন্ন্যাসীদের আবাস ছিল। এখন শূন্য পড়িয়া আছে।

কাহোলগ্রাম ২৪৫ মাইল। ষ্টেসনের পার্শ্বে কতকগুলি পাহাড় শ্রেণী। গঙ্গা হইতে প্রায় ৪০ [illegible] উচ্চ। উপরে বড় বড় গাছ ও গুল্ম থাকাতে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। ইহারা রাজমহল পাহাড়েরই অংশ মাত্র। পর্ব্বতোপরি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে দেখিবার অনেক পদার্থ আছে। ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যে শিবালয়টি ছিল তাহার পুরোহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা পতিত হয়। দক্ষিণদিকের পাহাড়ে এক মুসলমান ফকীরের

গৃহ ছিল। ২৫ বর্ষ হইল তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে এখন তথায় পায়রা চরিতেছে। কাহোলগ্রামে কহোল ঋষির আশ্রম ছিল, এখানে ভগীরথের রথ নির্ভিন্ন পর্ব্বত দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন। নিকটে বটেশ্বর মহাদেব। কাহোলগ্রামের সন্নিধানে গঙ্গায় কলসতীর্থ, সোমতীর্থ ও অপর পারে কৌশিকী সঙ্গম তীর্থ। এই গ্রামের নিকটেই জহ্নু হ্রদ ও অদিতি তীর্থ। দূরে মন্দর পর্ব্বত, মধুসূদনমঠ ও মহাকালীরমূর্ত্তি।

ভাগলপুর ২৬৫ মাইল। কাহোলগ্রামের পর যোগার সেতু পার হইয়া ভাগলপুর। এখানে বর্ষাকালে গঙ্গা ৭ মাইল বিস্তৃত হয়। মুসলমানদিগের সময় এই নগর বর্ত্তমান ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে বর্ত্তমান কেল্লার নিকট কর্ণগড় ছিল। দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে এক জন কর্ণ এখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরে জৈন হইয়া মগধে রাজ্য করেন। ভাগলপুরের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পা নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। কর্ণ গ্রামের নিকট জৈন সময়ে নির্ম্মিত ৭০ ফীট উচ্চ দুইটি গোলাকার স্তম্ভ আছে। শীতকালে বহু জৈন-যাত্রী দর্শনার্থ আগমন করে। চম্পক তীর্থে গঙ্গা স্নান করিলে কাশী তুল্য ফল লাভ হয়। ভাগলপুরের গুহা অতি আশ্চর্য্য, পূর্ব্বে নদীতীরপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এখন মুখ রুদ্ধ হইয়াছে। ভাগলপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখিবার উপযুক্ত প্রাচীন অনেক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে। সহরের নিকট ক্লীবলণ্ড সাহেবের মনুমেণ্ট। ১৭৮০ অব্দে ইনি পার্ব্বতীয় অসভ্যাদিগকে সৈন্য করিয়া ইহাদের উপর জমীদারদের অত্যাচার নিবারণ করেন। ভাগলপুরে নীল কুসুমফুল ও শস্যাদি যথেষ্ট জন্মে। কাচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের দ্রব্য ও প্রস্তুত হয়। এখানকার খেস বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া হিন্দী আরম্ভ হইল।

সুলতানগঞ্জ ২৮১ মাইল। ১৮৬১ অব্দে খুঁড়িবার সময় এখানে তাম্র নির্ম্মিত ১০ ফীট উচ্চ এক বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নানা স্থানে বৌদ্ধাবাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। পর্ব্বতস্থ পার্শ্বনাথের মন্দির দর্শন করিতে বর্ষে বর্ষে অনেক জৈন-যাত্রী আসিয়া থাকে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি-বিশিষ্ট জানদিয়া পাহাড় দূরে দৃষ্টিগোচর হয়। পাশ্চাত্যেরা বৈদ্যনাথের জন্য এই

স্থানে গঙ্গাজল পূরণ করিয়া থাকে। সুলতানগঞ্জে মুসলমানদিগের একটি মসজীদ আছে। নিকটে কোম্পানির আফিমের গুদাম। এখন আমরা লুপলাইনে মুঙ্গের জেলার সন্নিকৃষ্ট হইলাম।

বরিয়ারপুর ২৯২ মাইল। বরিয়ারপুরের পাহাড় মুঙ্গের হইতে আরম্ভ হইয়া বিন্ধ্যের অংশ খরকপুর পাহাড়ের সহিত যোজিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তিন শ্রেণীর পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইবে। উত্তরদিকে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এক শ্রেণী। তাহার দক্ষিণে অসম্বদ্ধ আর কতকগুলি গণ্ড শৈল। তদনন্তর সর্ব্ব দক্ষিণে একটা বিস্তীর্ণ শ্রেণী ক্রমশঃ পশ্চিমে গিয়া বিন্ধ্যের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এই সকল পাহাড় পরিত্যাগ করিবার জন্য রেল ক্রমে বক্র হইয়া অবশেষে উত্তরদিকের পাহাড় ভেদ করত বাহির হইয়াছে। এই গহ্বর ৬০০ হাত লম্বা ১৫।০ হাত উচ্চ ও ১৭।০ হাত বিস্তৃত। পাছে পাহাড় চুয়াইয়া জল পড়ে এই জন্য পূর্ব্বাংশের কিয়ৎ ভাগ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত আছে। গহ্বরের অভ্যন্তর ভাগ দেখিলে বোধ হয় যে এক কালে জলের নিম্নে এই পর্ব্বত জন্মিয়াছিল। উপরিভাগ ভয়-ঙ্কর তাপে বিগলিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বরিয়ারপুরের নিকট খরক-পুর। খরকপুরের পাহাড় জামুই হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। উপরি-ভাগে নিবিড় আবলুস বন। কোথাও কোথাও একটা প্রকাণ্ড শাল গাছ, কোথাও একটা অর্জ্জুন বৃক্ষ, কোথাও বা সুপুষ্পিত পলাশরাজির অগ্নিবর্ণ শোভা ও কোথাও দারুচিনির সুগন্ধ আঘ্রাণ। কত বৃক্ষ লতাতে জড়িত হইয়া নিকুঞ্জের ন্যায় হইয়াছে এবং কোন কোনটা বা সর্পাকৃতি লতার ভয়-ঙ্কর আলিঙ্গনে শুষ্ক হইতেছে। পর্ব্বত মধ্যে নদ নদীর প্রস্রবণ দেখিতে বড় মনোহর। প্রস্তরের উপর টেঙ্গারিগুলি কেমন ক্রীড়া করিতেছে। দুই পার্শ্বে পুষ্পের কি মনোহর শোভা। মরক পাহাড়ের উপরিভাগে নিবিড় জঙ্গল। মুঙ্গের হইতে ইহার শীর্ষদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ১১০০ ফীট উচ্চ। অভ্যন্তরে সরীসৃপের বড় ভয়। এক সময়ে ১০ ফীট লম্বা একটা সর্প ছাগ গিলিতেছিল। তাহাকে বধ করিয়া মুঙ্গেরের মৃত প্রাণিশালায় পাঠান হইয়াছে। গোসাপ গিরগিটি ও বিষাক্ত সর্প অনেক আছে। এক জাতীয় মাকড়সা জাল পাতিয়া পক্ষী ধরিয়া খায়।

গছি সাহেব একটা মাকড়সাকে পক্ষী খাইতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মুঙ্গেরের মৃত প্রাণীশালায় মরক পর্ব্বতের এই ভয়ঙ্কর মাকড়সা কয়েকটি রক্ষিত হইয়াছে।

জামালপুর ২৯৯ মাইল। পূর্ব্বে জামালপুর সামান্য স্থান ছিল। মুঙ্গের পর্ব্বতের ক্রোড়ে এই স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া রেলওয়ে কোম্পানি এখানে আপনাদের কারখানা ও আপীস স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা প্রকাণ্ড সহর হইয়াছে। মধ্যে এক উৎকৃষ্ট সম চতুষ্কোণ সরোবর। পূর্ব্বে এইটী ঝিল ছিল। রেলওয়ে কোম্পানির যত্নে এখানে পুস্তকালয়, পাঠাগার, নাট্যশালা, ক্রীড়াভূমি, পানভূমি ও উপাসনা মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়াছে।

মুঙ্গের ৩০৪ মাইল। জামালপুর পার হইয়া ৩০ মাইল ক্রমাগতই পাহাড়। তদনন্তর মুঙ্গের। মুঙ্গের জেলার উত্তর ভাগ শীতকালে দেখিতে অতি সুন্দর, সমস্তই রবিশস্যে পরিপূর্ণ। বরফের ভয়ে সাইবিরিয়া, তিব্বত ও নেপাল হইতে বিবিধ জাতীয় জলচর পক্ষী আসিয়া স্থানে স্থানে তিন শত বিঘা বিস্তীর্ণ জলাশয় আচ্ছন্ন করে। কোন প্রকার শব্দ করিলে যখন লাকে লাকে থাকে থাকে সেই সকল দল শব্দ করিয়া উড়িতে থাকে তখন বোধ হয় যেন সাগরের বেলারব বিলীন হইতেছে। কিন্তু বর্ষাকালে উত্তর ভাগ সমস্তই গঙ্গা জলে প্লাবিত হইয়া যায়। গৃধ্রেরা অর্দ্ধনিমগ্ন বৃক্ষশ্রেণী আশ্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিত থাকে। জলের উপরিভাগস্থ উচ্চ ভূমি সকল প্রায় সমস্তই আম্র বৃক্ষে আচ্ছন্ন, ইজার, শিমুল ও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নীল ও কুসুম এই ভাগে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মুঙ্গেরে ভাগীরথীর দক্ষিণ ভাগ জাঙ্গলিক জন্তুপূর্ণ জঙ্গলান্বিত পর্ব্বত, শ্যামল ধান্যপূর্ণ সুশোভিত উপত্যকা ও সতেজ শোভাশালী পোস্ত বৃক্ষে সুন্দর রূপ বিভক্ত। মুঙ্গেরের ঘৃত ও দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু লক্ষ্মীর আলয় স্বরূপ এই দেশে অবস্থান করিয়াও দীন অধিবাসীগণ আমকুসীচূর্ণ ও আরণ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করে। গোধুম, সর্ষপ, নীল, আফিম আদি সমস্তই কলিকাতা গ্রাস করিতেছে। মুঙ্গের নগর অতি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। ইহার পূর্ব্ব নাম মোদাগিরি। নিকটে মুদ্গল ঋষির আশ্রম ছিল। মুঙ্গেরের পথ সকল অতি পরিষ্কৃত ও বৃক্ষনিকুঞ্জে সমাচ্ছাদিত। পুষ্করিণী

সকল সুবিস্তৃত ও প্রসন্ন সলিলপূর্ণ। বর্ত্তমান দুর্গ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হোসেন সা নির্ম্মাণ করেন। ভূমির দিকে পরিখা বিলক্ষণ আয়ত। দুরাক্রম্য এই দুর্গ দৈর্ঘে চারি সহস্র ও প্রস্থে সার্দ্ধ তিন সহস্র ফীট। মধ্যে মৃত্তিকার স্তূপ। তথায় পূর্ব্ব এক দুর্গ ছিল এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে। মুঙ্গেরের মসজিদ বিচিত্র ইষ্টকে বিনির্ম্মিত ও অত্যন্ত শোভাশালী। এখানে নানা জাতীয় প্রস্তর, চেয়ার প্রভৃতি কাষ্ঠের সাধারণ দ্রব্য, আবলুস, হস্তীদন্ত ও বংশ ও লৌহরচিত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিকটে দেখিবার নানা বিষয় আছে। চারি মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে সর্ব্বতপ্রান্তে বিখ্যাত সীতাকুণ্ড বা শান্তাকুণ্ড। কুণ্ডের চারি পার্শ্ব প্রস্তরে গ্রথিত, অনবরত উষ্ণবারি উদ্গাত হইতেছে। কিয়দ্দূরে ঋষিকুণ্ড নামে আর একটি প্রস্রবণ। এবং ১৫ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড অপেক্ষাও অধিক উত্তপ্ত অপর এক প্রস্রবণ। মুঙ্গেরে গঙ্গার মুদ্গাল তীর্থ। এই স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম ছিল।

লক্ষ্মীসরাই। অনন্তর আমরা কর্ড ও লুপ লাইনের সম্মিলন স্থান লক্ষ্মীসরাইয়ে পুনরায় এপথ দিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রবেশের মুখেই কীল নদী, কলীসেতুর উভয়পার্শ্ব জাফরীকাটা লৌহ প্রাচীরে আচ্ছাদিত। নিম্নে শত হস্ত অন্তর ৯ খিলান। গাড়ী প্রবেশ মাত্র ঝন্ ঝন্ শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকে। দুই ক্রোশ দূরে হলোহর নদীর কীলতুল্য সেতু। এই মুখ দিয়া ফল্গুর জল নিসৃত হইতেছে। হলোহর ও কীল, নিকটেই মিলিত হইয়া গঙ্গাগামী হওয়ায় বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলে প্লাবিত হয়। কখন কখন জল ৮ হাত গভীর হইয়া উঠে। এজন্য পার্শ্বে প্রকাণ্ড বাঁধ ও ক্রমশঃ ৫৩২ খিলানের উপর দিয়া রেল চলিয়া গিয়াছে। কর্ড লাইনের যাত্রীগণ এই স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণরূপ হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইবেন। এখন লুচিকে পুরী, জলকে পানী, পিয়ারাকে আমরুৎ, পানকে খিলী, ঘটীকে লোটা, দড়ীকে রসী, খীরকে খোয়া, কমলালেবুকে নারাঙ্গী, দ্রব খীরকে রাবড়ি, মেথরকে ভাঙ্গি, পথকে সড়ক, ধুলাকে গর্দ্দা, ব্যবহার করিবে। পানীওয়ালে, মিঠাইওয়ালে বলিয়া প্রয়োজন হইলে আহ্বান করিবে। প্রায় আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত স্থানে ও অধিক কি কোহিস্থান পর্য্যন্ত হিন্দী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ হইবে। মগধে উর্দ্দু, কাশীতে হিন্দি, দক্ষিণে রাজড়ী, বৃন্দা-

বনে ব্রজভাষা, পঞ্জাবে গুরমুখী, মুলতানে মুলতানী, মারোয়াড়ে মারোয়াড়ি, কাশ্মীরে কাশ্মীরী, পেশোয়ারে পুস্ত ও ইতর লোক মধ্যে ঠেটী চলিত থাকিলেও সকলই সংস্কৃত জাত বলিয়া একরূপ বুঝা চলে। মগধে টাকা বলিলে ডবল পয়সা, কল্যাণীতে পয়সা বলিলে ডবল বুঝে। এজন্য টাকাকে রূপেয়া, ডবল পয়সাকে আধ আনা ও পয়সাকে পোয়া আনা বলিয়া ব্যবহার করা উচিত। আধ পাইকে আধেলা, সিকি পাইকে ছদাম বা ছুকড়া কহে। পশ্চিমের নানা স্থানে কোথাও লোহিয়া নামক পয়সা টাকায় ২৮ গণ্ডা, কোথাও গোরকপুরী বা বুটোলিয়া ১৮ বা ২০½ গণ্ডা পাওয়া যায়। এজন্য সর্ব্বদা বাঙ্গালায় প্রচলিত পয়সায় দাম করিবে। এখানকার পয়সাকে পশ্চিমে লাটসাহী, ডব্বল বা গড়াইদার কহে। ইহা সর্ব্বত্র টাকায় ১৬ গণ্ডা। পশ্চিমে প্রবেশ করিয়া সদা সাবধানে থাকিবে। দোকানী ব্যতীত অপরের হস্তের পান বা কোন খাদ্য কদাচ গ্রহণ করিবে না। দুরাত্মারা বিষ দিয়া দেয় এবং পথিক অচৈতন্য হইলে ব্যাগ লইয়া প্রস্থান করে। খাদ্য তিক্ত বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ বমন করিবে। দ্রব্যাদি খরিদ কালে যেন তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি নিকটে না থাকে। দালালেরা অতর্কিত ভাবে সঙ্গে যায় এবং সঙ্গে থাকিলেই দোকানী তাহাদের দালালী মূল্যের সহিত যুক্ত করে। হামবি কোনে মে খাড়া হায় অথবা ইয়ে বাবু চারোখুঁট জাননেওয়ালা ইত্যাদি চারি বোধক কোন শব্দ করিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রতি টাকায় চারি আনা দালালীর কথা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সাঙ্কেতিক কথা আছে। যথা—সাং ১ সোয়ান ২ একোয়াই ৩ ফোঁক ৪ বুধ ৫ ডাঁহাক ৬ পাঁইত ৭ মং ৮ কোণ ৯ সলায় ১০ ইত্যাদি। টাকাকে মণিয়া, বাজনা বা চিট্টা, আনাকে রত্তি ও দশগুণকে দহাই কহে। মং চিট্টা ৮ টাকা, টালি বা মং রত্তি ॥০, মং দহাই ৮০ ইত্যাদি। পথিক দেখিলেই চোর সঙ্গে সঙ্গে যায়। এক টাটকা ঠিকানা হায় বলিলে বোধ হইবে যে চোরেরা পথিকের নিকট হাজার টাকা থাকার সন্দেহ করিতেছে। এইরূপ তস্করেরা ১০০ কে লাগোয়ায়া ইত্যাদি বলিয়া ইঙ্গিতে কথা কয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে পশ্চিমের বিষাক্ত বিচ্ছু বড় ভয়ঙ্কর। দংশন করিলে কাটিয়া তথাকার রক্ত বাহির করিবে। যদি তাহা না হয় তবে অগ্নিস্বেদ

খরসান তামাকের ধুমা, তেঁতুলের কাঁই ঘসা, কাঁটানটের শিখড়ের রস, মনুষ্যের মূত্রযুক্ত মৃত্তিকা, লেবুর রস বা হুশ্চিকের রস দিলে কিঞ্চিৎমাত্র উপশম হয়। হিন্দুস্থানীদের লোটা ও পাকশালার চৌকা পরম পদার্থ, অতএব স্পর্শ করা উচিত নহে। মেথরের চৌকায় ব্রাহ্মণ গেলেও তাহারা মারিতে আইসে।

লক্ষীসরাই পার হইয়া বেহারের নিবিড় তালবন দেখিতে দেখিতে বর্হিয়ায় মুঙ্গের জেলায় প্রবেশ করিবে। এই সময় হইতে রেল পুনরায় গঙ্গাতীর আশ্রয় করিল। বামে শোণা বা মাগধী নদীর ক্ষেত্র সকল শস্যে পরিপূর্ণ। এই মাগধী তীরে রাজগৃহে রাম বিশ্বামিত্রের সহ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিছু দূর পরেই মোকামা। মোকামায় আহারাদির সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। মোকামা পার হইয়া ৮ ক্রোশ পরে বাড়। বাড়ের পার্শ্ব সকল চামেলী বনে আকীর্ণ। সায়ংকালে কি সৌগন্ধই বিস্তার করে। চামেলীর ফুলন তৈল, এইস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। বাড়ে গঙ্গা পার হইয়া দরভাঙ্গাগামী ত্রিহুতের রেল। দরভাঙ্গা হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে সীতার জন্মভূমি জনকপুর।

বাড় পার হইয়া ২৫ মাইল পরে ফতোয়া। এই স্থানে পুণ্যসলিলা পুনপুনা নদী গঙ্গায় পতিত হইতেছে। এখানে ভাদ্র মাসে মেলা হইয়া থাকে, তাহার পর বেহারের শোভা দেখিতে দেখিতে ডাইন দিকে গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষঃস্থল। মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড চড়া। দূরে উত্তরদিকে ভীষণ গণ্ডকী পতিত হইতেছে। অল্পক্ষণ পরেই খাপরল গৃহে পূর্ণ, বেহারের রাজধানী পাটনা। বসতি অত্যন্ত ঘন এবং স্থান ব্যবসায়ে পরিপূর্ণ। মসজীদ অনেক আছে কিন্তু অধিকাংশ মসজীদে লোক পণ্যদ্রব্য রাখিয়া থাকে। বর্ত্তমান আফীমের গুদাম ঘরে ১৭৬৩ অব্দে মীর কাশিম ২০০ ইংরেজ হত্যা করিয়াছিল। ইহারই নিকটে ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনামারদিগের কুঠী ছিল। পাটনায় বহু মুসলমানের বাস। নবাবের শিথিল শাসনকালে ষড়যন্ত্র করাই ইহাদের কার্য্য ছিল। শেষাবস্থায় রামনারায়ণ সকলকে খর্ব্ব করিয়া পাটনার বহু উন্নতি করেন। ইনি কাশ্মীরের মৃত্তিকায় পাটনার পারিপাট্য সাধন করিয়া খরমুজ ও দ্রাক্ষার বীজ রোপণ

করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে এই স্থানে দশ ক্রোশ বিস্তীর্ণ গভীর পরিখা-যুত, কাষ্ঠপ্রাচীর পরিবেষ্টিত ও দ্বাদশ দ্বার সমন্বিত মহা প্রতাপশালী পাটলীপুত্র নগর ছিল। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ অতীত হইল অজাতশত্রু কুসুমপুরের নিকট এই নগর সংস্থাপন করেন। বুদ্ধ বৈশালী গমন কালে আশীর্ব্বাদ করিলেন যেন পাটলীপল্লী সমৃদ্ধিশালী নগর হউক। প্রায় সাত শত বর্ষকাল এই নগর ভারতের রাজধানী ছিল। নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, মিগাস্থি-নিস, চাণক্য, পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে শোণ পাটনার নিকট গঙ্গায় পতিত হইত। এখন পাটনায় প্রাচীন চিহ্ন কিছুই নাই, লোকে কেবল পটনেশ্বরীকে প্রাচীন বলিয়া ব্যাখ্যা করে। হরিমন্দির শীকমন্দির প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির দেখিবার অনুপযুক্ত নহে। পাটনা হইতে বাহির হইয়া সহরের ধারে ধারে বাঁকীপুর পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে। আদালত কলেজ গির্জ্জা আদি সমস্তই পাটনার পরিবর্ত্তে বাঁকীপুরে সংস্থাপিত। এখানে উচ্চ পিরামিড সদৃশ একটি হর্ম্ম্য আছে। তাহার নাম গোলঘর। পূর্ব্বে এটি শস্যালয় ছিল। উপরে উঠিবার সিঁড়ি বাহিরের দিকে পাকে পাকে উঠিয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক প্রতিধ্বনি অতি চমৎকার। পাটনার খেরো, পিয়ারা, ফুল-কপি, ডালিম ও শস্যাদি প্রসিদ্ধ।

বাঁকীপুরের অপর পারে হাজীপুর, ষ্টিমার ভাড়া।০। গণ্ডক তটে হাজিপুরে কার্ত্তিকীপূর্ণিমার দিবস হরিহরছত্রের ১৫ রোজ মেলা হইয়া থাকে, বিস্তর হাতী ঘোড়া বিক্রয় হয়। হাজীপুর হইতে ত্রিহুতের রাজধানী মুজঃফরপুর ৪২ মাইল। যাইতে যানের সুবিধা আছে। মুজঃফরপুরের পর সিগৌলি দিয়া নেপালের পথ। হাজীপুর হইতে প্রাচীন বৈশালী নগর ২০ মাইল। বর্ত্তমান নাম বেছারা, গণ্ডক তট হইতে এক ক্রোশ। সত্যযুগে এইস্থানে ইন্দ্র দিতির গর্ভ ছেদন করাতে মরুতের জন্ম হয়। তখন এখানে কুশপ্লবন নামে বন ছিল। ইক্ষ্বাকুপুত্র বিশাল ঐ বনপার্শ্বে বৈশালী নগর নির্ম্মাণ করেন। বৈশালীর রাজগণ বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সময়ে সময়ে বৈশালী নগরে অবস্থান করিতেন। ১২০০ বর্ষ পূর্ব্বে চীনযাত্রী ফাহিয়ান এই নগর ভগ্ন দেখেন, এখন সমস্তই ভগ্নাবশেষে পূর্ণ।

একটা প্রাচীন দুর্গের ভয়ঙ্কর অবশেষ আছে। তাহার চারি কোণে চারিটা স্তম্ভ এবং পরিখা জলে পূর্ণ। মধ্যে একটি নূতন মন্দির রহিয়াছে। দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিমে স্তূপের উপর মুসলমানদের কবর। দক্ষিণে সেই স্থান যেখানে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, আমার নির্ব্বাণ সন্নিকটস্থ হইয়াছে। এখানে চৈত্রে মেলা হইয়া থাকে। দুর্গের পশ্চিমে প্রশস্ত সরোবরমধ্যে শিব মন্দির এবং পার্শ্বে অনেক ভগ্নমূর্ত্তি দুর্গের ২ মাইল উত্তর পশ্চিমে বাখরা। এখানে বুদ্ধের চৌদ্দপোয়া প্রতিমূর্ত্তি অশোকের ৪০ হস্ত লম্বা সিংহস্তম্ভ, স্তম্ভ দক্ষিণে বুদ্ধের জন্য বানরখাত শুষ্ক সরোবর তীরে প্রকাণ্ড বানরমূর্ত্তি ও অনেক ভগ্ন স্তূপ আছে। এইস্থানে ১৪৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধদেব তৃতীয় মহাধিবেশন হইয়াছিল।

বাঁকীপুর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে গয়া ক্ষেত্র। ফল্গুতীর হইতে গয়া অতি সুন্দর দেখায়। প্রবেশ কালে উভয়পার্শ্বে নানা দৃশ্য, তদনন্তর ব্রহ্মযোনি পাহাড়। চারিদিকে পিণ্ড ও পাণ্ডার কলরব হইতেছে। ব্রহ্মযোনির পাদদেশে বিষ্ণুপদ মন্দির। প্রায় ৬৬ হস্ত উচ্চ হইবে। ১৮০০ শকের কিছু পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় রাণী অহল্যাবাই পঞ্চবিংশতি লক্ষ টাকা এই মন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রদান করেন। কিন্তু কেবল ষোল লক্ষ ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা কর্ম্মচারীরা অংশ করিয়া লয়। মন্দিরের প্রবেশ মুখে গিলাণ্ডার সাহেবের ঘণ্টা। যাত্রীর করগ্রাহী গিলাণ্ডার হিন্দুদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই ঘণ্টা ১৭৯৮ অব্দে মন্দির দ্বারে আবদ্ধ করেন। মন্দিরের মণ্ডপ গৃহটি অতি পরিপাটি। চতুর্দ্দিক স্তম্ভ বেষ্টিত। এক এক দিকে আট আট স্তম্ভ। এবং এক এক স্তম্ভ চারিটিতে সংলিপ্ত। দুই থাকে এই স্তম্ভ ছাদমূল স্পর্শ করিয়াছে। গৃহটি স্তম্ভসমূহের বহির্ভাগে ৩৯ হস্ত ও অভ্যন্তর ভাগে প্রায় একাদশ হস্ত সমচতুষ্কোণ। মণ্ডপের সম্মুখে অষ্টপদবিশিষ্ট উচ্চ গৃহ মধ্যে বিষ্ণুপদ সংস্থাপিত। ইহার অভ্যন্তর ভাগ প্রায় ২৫ হস্ত তন্মধ্যে দুই হস্ত স্থান বিষ্ণুপদে আবৃত। সম্মুখে স্তম্ভচতুষ্টয় সমন্বিত ঘণ্টাবরণ মধ্যে নেপালমন্ত্রী রঞ্জিত পাণ্ডে প্রদত্ত বৃহৎ ঘণ্টা। পার্শ্বের অনাবৃত পার্শ্বগৃহে ৪।৫ শত লোক গোলমাল করিয়া পিণ্ড পাকাইতেছে, কেহ বা ঘণ্টা বাদন করিতেছে, কেহ স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ বা পিণ্ডদান করিতেছে। ভার-

তের নানাজাতির ভয়ঙ্কর জনতার মধ্যে পাণ্ডাদের মন্ত্রের স্বর ও চারিদিকে জয় গদাধর শব্দ। দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রাঙ্গনে বিচরণ করিলে ভিত্তি গাত্রে কত রাজার নাম দৃষ্ট হয়। কোথাও লোন-রাজাত্মজে যুজপালে গয়াকৃতে, কোথাও গোবিন্দপালদেব গতরাজ্যে চতুর্দ্দশ-সম্বৎসরে গয়ায়াং-ইত্যাদি কত নাম লিখিত রহিয়াছে। হাকাল! এখন কোথায়, সেই রাজগণ, কোথায় বা তাঁহাদের দান, কোথায় বা তাঁহাদের কীর্ত্তি, কে লিখিয়াছে, কে বুঝিতেছে, কে বা দেখিতেছে। নিকটে দ্বিতীয় প্রাঙ্গনে প্রস্তর নির্ম্মিত গদাধর মন্দির। উত্তর পশ্চিমে পঞ্চ ক্রোশ পরি-মাপক স্তম্ভ। প্রবেশ দ্বার পার্শ্বে উভয় হস্তীপৃষ্ঠে ইন্দ্র প্রতিমূর্ত্তি। তাহার উত্তর পশ্চিমে গয়াস্থরী দেবির মন্দির।

বিষ্ণুপদ মন্দির-শ্রেণীর নিকটে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। ১২৫ হস্ত দীর্ঘ ও ১০৪ হস্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে একটী উত্তম নিম্ব বৃক্ষ ও তীরে সূর্য্যমন্দির। পূর্ব্বমন্দির বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান মণ্ডপ গৃহ ২৬ হাত দীর্ঘ ও ৯ হাত প্রস্থ। প্রস্তর স্তম্ভগুলি ষট্‌হস্তাধিক হইবে। গর্ভ গৃহ প্রায় ৬ হাত সমচতুষ্কোণ তন্মধ্যে সপ্তঘোটকোপরি দ্বিভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি। বিষ্ণুপদ মন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতপৃষ্ঠে অক্ষয় বট। নিকটে ভূতেশ্বর মহাদেব। তদুত্তরে পরপিতামহেশ্বর। তৎপশ্চিমে রুক্মিণীকুণ্ড। পরপিতামহেশ্বরের মণ্ডপগৃহ ১৮ হস্ত সমচতুষ্কোণ, গর্ভগৃহ সপ্ত হস্ত সমচতুষ্কোণ, ভিত্তিবেধ ৫৷০ হাত এবং স্তম্ভের উচ্চতা ৯।০ হাত। ব্রহ্ম-যোনি পর্ব্বত গয়ার দক্ষিণ এবং প্রায় ৩০০ হস্ত উচ্চ, নগরের দিকে কিঞ্চিৎ ঢাল। অষ্টাদশ বর্ষ হইল মহারাষ্ট্রীয় দেবরাও ভাও উঠিবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উপরে শক্তিমন্দির ও পঞ্চমুখ দেবতা। বেদিটী ১৬৯০ শকে নির্ম্মিত। আরংজেব এখানকার বিগ্রহ বিনষ্ট করি-য়াছে। বাম পার্শ্বে একটী দ্বিভুজ মূর্ত্তি ও নানাস্থানে হরপার্ব্বতীর খণ্ডাংশ।

গয়ার দক্ষিণে বৌদ্ধগয়া বা বুধগয়া। এখানে বুদ্ধদেব বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন এজন্য চীন বর্ম্মা ও ভোট হইতে বহুলোক আসিয়া এখনও তীর্থ করে। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রাচীন মন্দির সকল এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত

আছে। গয়ার সাহেবগঞ্জ নামক স্থানে সাহেব ও বণিকেরা বাস করে। গয়ার পেঁড়া তামাক পান ও প্রস্তরের দ্রব্য প্রসিদ্ধ।

গয়া হিন্দুদিগের মহাতীর্থ এবং পিতৃলোকের পরমগতি। এখানে শ্বেত-কল্পে গয় নামে এক অসুর তপস্যা করিতেছিল। ব্রহ্মযজ্ঞ করিব বলিয়া তাহাকে কৌশলে পাতিত করেন। গয়াসুরের মস্তকে স্থাপিত বিষ্ণুপদ-প্রস্তর মরীচিপত্নীর দেহজাত এবং পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ। ব্রহ্মা গয়াসুরকে তাহার অভিলষিত বর প্রদান করিয়া তদুপরি যজ্ঞ করেন। তদনন্তর গয় রাজা বহু যজ্ঞ করাতে গয়া নিতান্ত পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

গয়ায় প্রথমদিনে লোকে ফল্গুতে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, গয়ার উত্তরে প্রেত-শিলায় শ্রাদ্ধ, তন্নিকটে প্রভাসহ্রদস্থ রামতীর্থে স্নান ও শ্রাদ্ধ এবং পর্ব্বত-দক্ষিণে যমবলি প্রদান করে। দ্বিতীয় দিনে গয়ার প্রায় ২ ক্রোশ বায়ু-কোণে প্রেতপর্ব্বতে শ্রাদ্ধ করে। তৃতীয়দিনে উত্তরমানসে কনখলে, দক্ষিণমানসে ফল্গুতীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ ও পর্ব্বতরূপী গদাধর পূজা এই পঞ্চতীর্থ করিয়া থাকে। চতুর্থ দিনে ধর্ম্মারণ্যস্থ মতঙ্গবাপীতে কূপযূপ মধ্যে ও তদগ্নিকোণে স্নান শ্রাদ্ধাদি করে। পঞ্চম দিনে ব্রহ্মসরে স্নান ব্রহ্মযূপে শ্রাদ্ধ, তৎ প্রদক্ষিণ এবং তথায় যমবলি প্রদান করে। ষষ্ঠ দিনে রুদ্র বিষ্ণু ব্রহ্ম দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি ১৭ পদ দর্শন স্পর্শন ও তত্র শ্রাদ্ধাদি করিয়া গয়াশিরে শ্রাদ্ধ পূজাদি করে। পরে গজকর্ণিকায় তর্পণ ও কেদা-রেশ্বর কণকেশ্বর নরসিংহ ও বামনাদির পূজা করে। ৭ সপ্তমদিনে গদালোলে শ্রাদ্ধ ও অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যাদি দান করে। পরে যথাসাধ্য নিয়ত দিন কৃত্য কর্ত্তব্য। পাণ্ডারা সম্ভবমত দর্শনী ও খাপরুগয়াদি করাইয়া থাকে। মুণ্ড পৃষ্ঠাদ্রির চতুর্দ্দিকে ২॥০ ক্রোশ করিয়া পঞ্চক্রোশী গয়া। উত্তরে ব্রহ্মকূপ, দক্ষিণে দক্ষিণমানস, পূর্ব্বে ফল্গু ও পশ্চিমে গৃধ্রে-শ্বর, এতন্মধ্যস্থ স্থান গয়াসুরের শির।

গয়ার ১২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে রাজগৃহ, গিরিব্রজ, মগধপুর বা কুশাগ্র-পুরের ভগ্নাবশেষ। এই স্থানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। এবং ত্রেতাযুগ হইতে প্রায় মহানন্দের কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে মগধেরা রাজ্য করিয়া-ছিলেন। ইহার প্রতাপে এককালে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়। এখন কেবল

সেই পঞ্চ পাহাড়, সেই শোণা নদী ও কতকগুলি ভগ্নাবশেষ অতীত মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা পশ্চিমদিক দিয়া প্রবেশ করিলাম। উত্তর পশ্চিমে বৈভার গিরি। তন্মধ্যে লতাজাল বেষ্টিত সুগঠিত একটি প্রকাণ্ড গুহা। লম্বে ২২৷৷০ প্রস্থে ১১।০ ও উচ্চতায় ৮ হাত। সম্মুখে আরও আবৃত স্থান ছিল। ইহাই বৌদ্ধগণের বিখ্যাত সাতপনি গুহা। বুদ্ধ মৃত্যুর তিন মাস পরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধগণের এইস্থানে সর্ব্ব প্রথম মহাধিবেশন হয়। নিকটে আর একটি ভগ্ন গুহা। তৎপরে আর এক ভীষণ গুহা। বোধ হয় দুরাত্মা জরাসন্ধ এই স্থানে রাজগণকে বদ্ধ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ মধ্যাহ্নকালে এই স্থানে তপস্যা করিতেন। ইহারই অনতিদূরে জরাসন্ধের বৈঠকী। এখন একটা ভগ্ন স্তূপ মাত্র। নিকটে একটা প্রকাণ্ড শিবালয়ের ভগ্নাবশেষ। অনন্তর বৌদ্ধদের পাঁচ মন্দির পার হইয়া উত্তর পূর্ব্বে বিপুল গিরি। বৈভার ও বিপুলের মধ্যভাগ সমতল। পাহাড় হইতে একটি নদী নামিয়া ঐ দিকে গমন করিতেছে। নদীর বৈহার পার্শ্বে সাতটি ও বিপুল পার্শ্বে আটটি উষ্ণ প্রস্রবণ হিন্দুদের তীর্থ। নিকটে অনেক দেবালয় এবং রাজগৃহের হস্তিনাপুর দ্বার। এইস্থানেই জরারাক্ষসীর মন্দির। অদূরে জৈনমন্দির ও একটা ভগ্ন চৈত্যও দেখিতে পাওয়া যায়। বিপুল গিরির পূর্ব্বে রত্নগিরি। রত্নগিরির পর উদয়গিরি। উদয় ও শোণ গিরি চক্রাকারে দক্ষিণদিক বেষ্টন করিয়াছে। এইরূপ পঞ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত হইলেও জরাসন্ধ পুনরায় প্রাচীর দ্বারা নগর তিন কক্ষায় বিভাগ করিয়াছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। পশ্চিমদ্বার পঞ্চ পাণ্ডু রঙ্গভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজগৃহের পূর্ব্ব পার্শ্বের নাম গিরিব্রজ। ১২ মাইল দূরে বিহার নগর। বিহারের একক্রোশ দক্ষিণে তুঙ্গীগ্রামে বির্লোয়া নামক স্থানে বলিশ্বর মহাদেব আছেন। একক্রোশ পশ্চিমে মাঘরা গ্রামে মাঘরা লক্ষ্মী বা শীতলা দেবী আছে। ৩ ক্রোশ পশ্চিমে বলিগ্রাম বা বড়গাঁও। পল্লীতে সূর্য্যমন্দির ও অনেক বৌদ্ধমন্দির আছে। বিহারের ৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বারাগ্রামে স্বস্তিক ও মণিনাগের আলয় ছিল। এখনও নাগের পূজা হইয়া থাকে। কৃষ্ণ গোরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনকে এই সকল তীর্থ দেখাইয়াছিলেন। বিহারের নিকটেই কোশগ্রামে বিশ্বামিত্র

যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যেস্থানে রাম মারীচকে দূরীভূত করেন, এখন তাহার নাম লৌহ দণ্ড। রাজগৃহ হইতে ৩া০ ক্রোশ উত্তরে বালাদিত্যের রাজধানী আনন্দ নগর। ঐ স্থানে প্রকাণ্ড শক্রবাপী অনেক পুষ্করিণী ও বৌদ্ধদিগের নাগতীর্থ আছে। রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থের ভগ্নাবশেষে পূর্ণ। বিহারকে রাজগৃহ মাহাত্ম্যে হিন্দুদিগের বিহার বন ও বৌদ্ধ পুস্তকে বুদ্ধের বিহার স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। রাজগৃহ, বলিগ্রাম, পাবাপুরী ও গোনামা জী বিখ্যাত জৈনতীর্থ।

এইরূপে ইচ্ছা হইলে বিহারের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া পাটনায় প্রত্যাগমন করিবে। পাটনা পার হইয়া দানাপুর। দানাপুর পূর্ব্বে পাটনারই সেনানিবেশ স্থান ছিল। তদনন্তর ভিটা ষ্টেসন। ভিটা হইতে ৪ মাইল দূরে জগদ্বিখ্যাত শোণ সেতু। প্রকাণ্ড শোণের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সেতু চলিয়াছে। অষ্টাবিংশতি ভাগে এই সেতু বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের বিস্তার পূর্ণ শত হস্ত। ইহার এক এক স্তম্ভ গ্রীষ্মকালেও জলের নিম্নে একবিংশতি হস্ত প্রোথিত থাকে। শোণ বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া গঙ্গায় পতিত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে মৃতপ্রায় হইয়া বালুকাময় ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে ইহার অসীম জলরাশি বহির্গত করিবার জন্য রেলওয়ের পথে অনেক স্থান খাত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদ ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ পাটনার নিকট প্রবাহিত ছিল।

শোণ পার হইয়া আরা ও বিহিয়া পর্য্যন্ত বামদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এই স্থানে তারকার বন ছিল। এই স্থানে ইন্দ্র বৃত্র বধ করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রমল ও করুষ অর্থাৎ ক্ষুধা পরিত্যক্ত হওয়াতে তিনি এই স্থানে মলদ ও করুষ নামে দুই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। অগস্ত্যের এই স্থানে আশ্রম ছিল। কিন্তু তারকা সমস্তই বিনষ্ট করে। অবশেষে বিশ্বামিত্র সহ রাম তারকাকে বধ করেন। এখন এই স্থান হলকর্ষিত ক্ষেত্র, দূরে এক একটা আম্র বৃক্ষ দেখা যায়। শোণ পারাবধি সাহাবাদ জিলা আরম্ভ।

আরা। সাহাবাদের রাজধানী। কলিকাতা হইতে ৩৬৯ মাইল। এই জেলা শোণ খালে বিচ্ছিন্ন। শোণ খাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া

পাটনা চুনার কাশী বকসার প্রভৃতির কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক হিত সাধন করিতেছে। ইহাতে প্রায় ২১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সাহাবাদের স্থানে স্থানে হীরা ও ফটকিরি পাওয়া যায়। আরার ৩৬ মাইল দক্ষিণে বিখ্যাত রোহিতাশ্ব বা রোটাস দুর্গ। আরার তিন ক্রোশ পশ্চিমে বৌদ্ধদিগের মহাসর। এখন খণ্ডোয়া নামে পুষ্করিণী ও কয়েকটি মন্দির মূর্ত্তিও ভগ্নাবশেষ আছে। আরা হইতে অনেকে সরযূগঙ্গাসঙ্গম দর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সরযূসঙ্গমে কামের আশ্রম ছিল। ইহার নাম বেণীবাহু তীর্থ। মহাভারত মতে এখানে রুদ্র উপাসনায় ও স্নানে পঞ্চাশ্বমেধ ফললাভ। এখন লোকে বলি ভর্গাশ্রম বলিয়া থাকে। ইহার নিকটস্থ বটবৃক্ষ অতি প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালে ছায়ার পরিসর প্রায় ৮০০ হাত হয়।

অনন্তর বিহিয়া। দক্ষিণে জগদীশপুরের জঙ্গল। এই জঙ্গলে ১৮৫৭ অব্দে কুমার সিংহের সৈন্যেরা আশ্রয় লইয়াছিল। জঙ্গল কাটিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পরাভূত করেন। তদনন্তর রঘুনাথপুর। ইহারই এক ক্রোশ দূরে ব্রহ্মপুরে শিবরাত্রির মেলা হয়। তৎপরে ডুমরাঁও। এখানে একজন রাজা আছেন। নিকটে ভোজপুর। এখানকার লোক এত দুষ্ট যে এরূপ দুষ্ট লোক ভারতে পাওয়া ভার।

অনন্তর বক্সার। কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল। ইংরেজ সেনাপতি মনরো ১৭৬৪ অব্দে এই স্থানে মীর কাশিম ও অযোধ্যার সৈন্য জয় করিয়াছিলেন। নগর মধ্যে মুসলমানদিগের কয়েকটি উত্তম মসজীদ আছে। দুর্গ নদীতীরে অবস্থিত। গঙ্গার অপর পারে গবর্ণমেণ্টের অশ্বশালা। বক্সারের বা ব্যাঘ্রসরের চারিদিকে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি। তিন মাইল দূরে বৌদ্ধদের একটি উৎকৃষ্ট মন্দির আছে। এবং নগরের ৪ মাইল দক্ষিণে সাসিরামের প্রশস্ত পুষ্করিণী মধ্যে সের সাহার বিখ্যাত কবর। বক্সারে রামেশ্বর, পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রাশ্রম আদি নানাস্থানের নাম আছে। গৌরিশঙ্করের মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী পুষ্করিণীকে অনেকে অঘসর বলিয়া থাকে।

অনন্তর দিলদার নগর। কলিকাতা হইতে ৪৬৩ মাইল। অখণ্ডা গ্রাম নষ্ট করিয়া আরংজেব দিলদার নগর স্থাপন করেন। নগরের পশ্চিমস্থ পুষ্করিণীর নাম রাণীসাগর।

দিলদার নগর পার হইয়া কয়েক মাইল পরেই কলিকাতার লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের রাজ্য সীমা কর্ম্মনাশা নদী। ত্রিশঙ্কুর লালা হইতে বিনির্গত বলিয়া হিন্দুমাত্রেই কর্ম্মনাশার জলস্পর্শ করেন না। সেতুটি একাদশ খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড ২৬ হস্ত অন্তর।

জমানীয়া। কলিকাতা হইতে ৪৪৩ মাইল। গঙ্গা অতি নিকট। ৩০ বৎসর ক্রমাগত ১২ ফীট করিয়া ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। নিকটে গাজীপুর। গাজীপুরের চারিদিকে গোলাপের বন। ১২ টাকা বোতলের গোলাপ জল, ৫০ টাকা ভরি আতর এখনও প্রস্তুত হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে দুই লক্ষ ফুল হইতে এক তোলা আতর প্রস্তুত হইত। তাহারই ভরি শত টাকা ছিল। জমানীয়ার অপর নাম জামদগ্ন্য নগর। ভগ্নাবশেষে রেলওয়ের রাস্তার বিস্তর সাহায্য হইয়াছে। ষ্টেসনের ৩ মাইল দূরে লাট নামক স্থানে ৬২ ফীট উচ্চ অশোকরাজের স্তম্ভ।

জমানীয়া পার হইয়া কিছু দূর পরে মোগলসরাই। এখান হইতে এক রেল কাশী গিয়াছে। কাশী ষ্টেসন জাহ্নবী তট সংস্থিত। ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান মাত্র অপর পারে কি মনোহর দৃশ্য। প্রান্ত হইতে প্রান্তপর্য্যন্ত ক্রোশাধিক দূর বিস্তীর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট ঘাট শ্রেণী কি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু নদীর প্রভাবে কোন কোনটা বা বসিয়া যাইতেছে, কোন কোনটা বা ভয়ঙ্কর দৈত্যের ন্যায় পতনোন্মুখ হইয়া আছে এবং কাহারও বা বিকটাকার প্রস্তর খণ্ড পতিত হইয়া ভাগীরথীর বীচিমালা বিভিন্ন করত কল্লোলধ্বনি বৃদ্ধি করিতেছে। ভারতের বহুদেশাগত বিচিত্র বসনধারী বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও যতিবৃন্দ বিমর্দ্দিত বিস্তীর্ণ ঘাট পরম্পরা তদুপরি ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতলবিশিষ্ট ষট্‌ষষ্টি হস্তাধিক বিস্তীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদমালা, তদবকাশে বহুশীর্ষ সমাযুক্ত জাজ্বল্যমান স্বর্ণকলস ভূষিত মন্দিররাজির মনোহর গঠন স্থানে স্থানে সুবর্ণ পতাকা ও ঈষৎ বায়ুবেগে আন্দোলিত বিচিত্র ধ্বজবস্ত্র ও অত্যুচ্চ স্তম্ভচতুষ্টয় সমন্বিত বেণীমাধবের বিশাল মন্দিরাদি প্রাতরুদিত অরুণকিরণে রঞ্জিত হইলে যে কি শোভা বিস্তার করে তাহা কি বর্ণনা করিব। সত্যই যেন ভবানীপতির পুরী সন্দর্শন করিতেছি। সত্যই যেন অন্নপূর্ণা বিরাজ

করিতেছেন। আমেরিক ভ্রমণকারী মি° টরন বলেন আমি এরূপ পুলিন শোভা পৃথিবীতে দেখি নাই।

উত্তরে ডাইনদিকে নৌকার সেতু। কিন্তু সেতু হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির বহুদূর। চারি পয়সায় নৌকায় পারই সুবিধা। মাল্লারা ও গঙ্গাপুত্রেরা নবাগত বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই দৌরাত্ম্য করিবে। উত্তরখণ্ডগামীগণ বেণীমাধব নিম্নে পঞ্চগঙ্গাঘাট, বিশ্বেশ্বরগামীগণ তদ্দক্ষিণে মণিকর্ণিকা ঘাট ও বাঙ্গালীটোলাগামীগণ তদ্দক্ষিণে দশাশ্বমেধে উত্তীর্ণ হয়। মণিকর্ণিকা চুনার প্রস্তর নির্ম্মিত ও প্রশস্ত। কিন্তু এক্ষণে গঙ্গায় ভগ্ন হইতেছে। ভগ্ন প্রস্তরের উপর অনেক কাষ্ঠফলক স্থাপিত রহিয়াছে। তদুপরি বসিয়া লোকে পূজা সমাপন করে। সোপানাবলির কোন স্থানে পুষ্প, কোথাও চন্দন ও কোথাও অপরাপর দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে। ঘাটের উপরিভাগে রেল বেষ্টিত ও চতুর্দ্দিকে সোপানাবলি গ্রথিত বিবর্ণ জলপূর্ণ চতুষ্কোণাকার মণিকর্ণিকা কুণ্ড। প্রতি পঞ্চদশ দিবসে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বদিকের মুখি দিয়া জল পরিবর্ত্তন করেন। বর্ষাকালে কুণ্ড গঙ্গার জলে ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইলে কার্ত্তিকে উৎখাৎ করিতে হয়। মণিকর্ণিকা নিকটে গঙ্গাপুত্রগণের উপবেশন স্থান। কেহ বা কোন নিরীহকে নিম্নে কুণ্ড মধ্যে মণিকর্ণিকে মহাভাগে বলিয়া স্নানমন্ত্র বলাইতেছে, কেহ বা ভিক্ষার জন্য পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কেহ বা আর এক জনকে ঐরূপ জালে জড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং কেহ বা নবাগত ব্যক্তি দেখিলেই ব্যস্ত করিতেছে। অগ্রে চুক্তি করিয়া পরে তীর্থ স্থানে সকল কার্য্য করা বিধেয়।

স্নানের মন্ত্রপাঠকগণ গঙ্গাপুত্র ও দেবদর্শকগণ যাত্রাওয়ালা নামে খ্যাত। গঙ্গাপুত্রের পরিশ্রম জন্য ৵ ও যাত্রাওয়ালার একদিনের পরিশ্রম জন্য ॥০ যথেষ্ট। পঞ্চক্রোশী যাত্রায় তাহার খোরাকী বাদ ১॥০। এক জনের যাত্রী হইলে আর বিরক্ত করে না। কিন্তু সকলকে নবাগত ব্যক্তি জানাইবার জন্য হস্তে মৃত্তিকা ভাণ্ডে জল ও পুষ্প দিয়া থাকে। সে ব্যক্তি যে মন্দিরে গমন করুক সকলেই প্রতারণার চেষ্টা করে। অতএব দর্শকগণের নিতান্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রতি মন্দিরে এক পয়সা দক্ষিণা দেওয়া দর্শকের ইচ্ছা।

কাশীর পূর্ব্বদিকে গঙ্গা উত্তরমুখে কোণাংশ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। মণিকর্ণিকার পশ্চিম দক্ষিণাংশে বিশ্বেশ্বরের পথ। কাশীর সকল পথই প্রস্তর নির্ম্মিত ও নিতান্ত অপ্রশস্ত। উভয়পার্শ্বে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও সর্ব্বভাগ লোক ও বৃষে আচ্ছন্ন। যেদিকে দৃষ্টিপাত কর শিবালয় ও শিব-মূর্ত্তি। মন্দিরে শিব, বাহিরে শিব, পথে শিব, সকলেরই মুখে শিব শিব শব্দ। কেহ বলে কাশীনাথ, কেহ বলে বিশ্বপতিনাথ। সকলেই পুষ্পাদি লইয়া মন্দিরে দৌড়িতেছে। কেহ বা পথের শিবের উপর করুণাবিশিষ্ট হইয়া গঙ্গাজল ও বিল্বদল বর্ষণ করিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে যাইবার কালে ভুষার্দ্দিত ভণ্ডতপস্বীর ভীষণ ভিক্ষা শব্দে সময়ে সময়ে ভীত হইতে হয়। কিছু দূর গিয়া ডাইনদিকে গমন করিলে বিশ্বেশ্বরের পশ্চাৎ দ্বার ও বামদিকে গমন করিলে বিশ্বেশ্বরের প্রধান দ্বার পাওয়া যায়। বিশ্বেশ্বরের বাটীটী চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ও খোদকারীতে পূর্ণ। উত্তরমুখে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ ও বামদিকে গৃহস্থের দরজার মত দেব দেবী পূর্ণ দরজা। মধ্যস্থলে একটি মণ্ডপ ও তন্মধ্যে একটি শিব ও কয়েকটী বৃহৎ ঘণ্টা। মণ্ডপের চারিপার্শ্বের কুঠরী ও দালান দেব দেবীতে আচ্ছন্ন। পূর্ব্বদিকের পার্শ্বে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণমণ্ডিত ক্ষুদ্র মন্দির। যতদূরে মনুষ্য স্পর্শ করিতে পারে তাহার উপর হইতে স্বর্ণমণ্ডিত। বিশ্বেশ্বরগৃহের চারি দ্বার। পূর্ব্বদ্বার প্রায়ই বন্ধ থাকে, উত্তর দ্বারে মহান্ত উপবিষ্ট, পশ্চিমদ্বার প্রধান এবং দক্ষিণ দ্বার দিয়াও লোক প্রবেশ করিতেছে। গৃহটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ১২ জনের বসিবার উপযুক্ত ও সমস্ত মার্ব্বেল মণ্ডিত। মধ্যস্থলের কুণ্ড মধ্যে বাণলিঙ্গ মূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর বিরাজিত। লোকে দুগ্ধ জল তণ্ডুল পুষ্প চন্দন ও মাল্য অনবরত মস্তকে প্রদান করিতেছে। এত গোল যে বিশ্বেশ্বরের পরিবর্ত্তে অপর লোকের মস্তকে পড়িতেছে। প্রাতঃকালে জনতায় প্রবেশ করা বড় কঠিন। কিন্তু দৃশ্যটি অতি মুগ্ধকর। যখন সেই গৃহমধ্যে উন্নতকায় পঞ্জাবী, খর্ব্বাকৃতি দ্রাবিড়ী, মধ্যমাকৃতি বঙ্গবাসী আদি ভিন্নাকার ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ভাষি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যুবক যুবতীগণ, পরস্পরের গাত্রে সংমর্দ্দিত হইলেও পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া, এক পরিবারের লোকের ন্যায় স্থানাভাব বশতঃ পরস্পরের হস্তে হস্ত দিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাকে, তখন কে না বলিয়া

থাকিতে পারে, ভারত এখনও তোমার একতা বিনষ্ট হয় নাই। এখনও বিংশতি কোটি লোক ভ্রাতা ভগিনীভাবে মিলিত রহিয়াছে। এখনও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ হইলে ভিন্নাকার ভিন্নভাষী বিংশতি কোটি লোক মুহূর্ত্ত মাত্রে মিলিত হইয়া যায়। হা ঋষিগণ! তোমরা একত্র হইবার এত কৌশল করিয়া গেলেও গৃহ বিচ্ছেদে ভারত পদানত হইয়াছে। এবং তোমাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া নিন্দা করিতেছে। মহাদেবের যে মস্তকে বীরপ্রবর ভীষ্ম পুষ্প দান করিয়াছিলেন, যাহার উপর অর্জ্জুন আসিয়া বিল্বদল বর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া জরাসন্ধ শত-রুদ্রীয় পাঠ করিয়াছিলেন, এখন দাসদিগকে সেই মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দেখিয়া কাহার চক্ষু হইতে নেত্র জল বিগলিত না হয়। বেলা দশটার পর হইতে এই সকল জনতা ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। রাত্রিকালে ৮॥০ ও ১১ টার সময় দুইবার বিশ্বেশ্বরের আরাত্রিক দর্শন অতি প্রীতিপ্রদ। উপাসকেরা অভিষেক করিয়া বিশ্বেশ্বরকে চন্দন ও মাল্য দানে ভূষিত করিতে থাকে। তিন জন দক্ষিণে ও তিন জন পশ্চিমে এক জন পূর্ব্বে বসিয়া সাতটি পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলিত করে। ঐ সময়ে কয়েক জন এক কোণ হইতে সুমধুর স্বরে * "ছম্ভো ছম্ভো ছঅম্ভো,, বলিয়া নিস্তব্ধ হয়। তৎক্ষণাৎ অপর কোণ হইতে আর কয়েক জন "ছিভা ছিভা ছ-অম্ভো,, বলিয়া উঠে। যখন বারম্বার এইরূপ শব্দে শিবকে প্রবোধিত করিতে থাকে তখন পাষণ্ডেরও মন দ্রবীভূত হয়। তালে তালে ডমরু ঘণ্টা ও গাল বাদ্য হইতে থাকে। এবং পুরোহিতগণ স্তব পাঠ করিতে করিতে আরাত্রিক সমাপন করেন। বিশ্বেশ্বরের বাটী হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম মুখে কয়েক হস্ত পরেই ভিক্ষুকাবৃত অন্নপূর্ণার আলয়। প্রবেশ দ্বারেই ষাঁড় রোমন্থ করিতেছে। বাটীটী বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা প্রশস্ত এবং খোদকারিতে পূর্ণ। মহামণ্ডপ ও গর্ভ গৃহ প্রদক্ষিণ করিবার চারিদিকে প্রশস্ত স্থান, খণ্ডে পরিবেষ্টিত। অন্নপূর্ণা দেবী ভিত্তিগাত্রে সংস্থিতা। দুই প্রহরের পর অভিষেক হইলে সর্ব্বজাতিকে স্পর্শ করিতে দেয় না। বাটী মধ্যে

* শম্ভো শম্ভো শম্ভো

অনেকে কুমারী পূজা করিতেছেন। কাশীর অনেক কুমারী বেশ্যা কন্যা ও শূদ্র জাতীয়া। আনেতা মহাশয়েরা তাহাদিগকে দুই চারিটী পয়সা দিয়া তাহাদের প্রাপ্যগুলি আত্মসাৎ করেন। প্রতারকপূর্ণ কাশীর এইরূপ প্রথা। অন্নপূর্ণার বাটী হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম মুখে যাইতে কয়েক হাত মধ্যেই ডাইন দিকে মোড়ের মাথায় পথের গায়ে সিন্দুরলিপ্ত ঢুণ্ডী-রাজ গণেশ বসিয়া আছেন। ভাঙ্গা শুঁড়টীর কতক রৌপ্য নির্ম্মিত এবং কখন কখন কাপড়ে পেটটী ঢাকা। ঢুণ্ডী হইতে উত্তর মুখে গিয়া কিছু দূর পরেই মসজীদ পার্শ্বে জ্ঞানবাপীর দরজা। জ্ঞানবাপী বর্ত্তমান বিশ্বে-শ্বর মন্দিরের উত্তর ও সাবেক মন্দিরের অর্থাৎ মসজিদের দক্ষিণ। জ্ঞান-বাপীর আয়তনের মধ্যভাগে ৬৪ স্তম্ভবিশিষ্ট একটী নাতিদীর্ঘ মণ্ডপ আছে। মণ্ডপের পার্শ্বস্থ অনাবৃত স্থানে নানা দেব দেবী ও দুই একটী বৃক্ষ আছে। মণ্ডপের পূর্ব্বভাগে লৌহজালে আবৃত জ্ঞানবাপী নামক প্রস্তর গ্রথিত সুদৃশ্যকূপ। নীচে যাইবার লৌহময় সিঁড়ী আছে। এবং স্নানের জন্য তলায় অর্দ্ধভাগ বাঁধান আছে। কিন্তু কূপ মধ্যে স্নান করা দূরে থাকুক পূজার জন্য প্রত্যহ পতিত বিল্বপত্রে জল এত দুর্গন্ধ যে কাহার সাধ্য নাসিকার নিকট লইয়া আসে। জ্ঞানবাপীর পূর্ব্বদিকে সম্মুখে ৭ ফীট উচ্চ নন্দিকেশ্বর নামক প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ ষাঁড়। আয়তনের উত্তরে মসজিদের প্রাঙ্গন প্রায় একতলা সম উচ্চ হইয়াছে। এজন্য অপর পার্শ্ব দিয়া মসজিদে যাইতে হয়। এই মসজিদ পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরমন্দির ছিল। প্রায় তিনশত বর্ষ হইল মহারাজা মানসিংহ ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুইশত বর্ষ অতীত হইল দিল্লীর দুরাত্মা সম্রাট আরংজেব মন্দিরে জমা মসজীদ করিয়াছে। তদবধি প্রাচীন বিশ্বেশ্বর বিলুপ্ত ও বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর বাণ রাজার প্রাচীন শিবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর মন্দিরের কিছু দূর উত্তরে দণ্ডপাণি, চক, ভৈরব-নাথ, কালকূপ ও বিন্দুমাধবাদির স্থান। কালকূপের বাহিরের ভিত্তিতে এমন একটী ছিদ্র আছে যে, প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য কিরণ উহার মধ্য দিয়া কূপে প্রবেশ করে। বেণীমাধবের মন্দির ও দুরাত্মা আরংজেব ভগ্ন করিয়া মসজীদ করিয়াছে। এখন বেণীমাধব তাহারই পার্শ্বস্থ গৃহে

আছেন। বেণীমাধবের প্রাচীন মন্দির বা মসজীদের প্রাঙ্গনের চারি কোণে ৯৮ হস্ত উচ্চ এক বিশাল স্তম্ভ আছে। তাহার নিচের বেড় ৫।।০ হাত ও ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়াতে ঊর্দ্ধের বেড় ৫ হাত। উপরে উঠিবার ১৩০ সিঁড়ি। কিন্তু স্তম্ভ গুলি প্রায় এক হাত হেলিয়া থাকাতে সাবধানে উঠিতে হয়। ইহার পর অনেক মন্দির ছাড়াইয়া ভাঙ্গা কেল্লা বা পতিত স্থান। ৭০০।৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানে অনেক বসতি ছিল। তদুত্তরে কাশীর উত্তর সীমা গঙ্গা বরুণা সঙ্গম। দুই মাইল দূরে কলেজ। কলেজটী গথিক জাতীয় হর্ম্ম্য। নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ ও মিউজিয়ম বিশিষ্ট। বেষ্টন মধ্যে অশোকের আজ্ঞা খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ। পূর্ব্বে এই স্তম্ভ নদী তীরে আরংজেব মসজিদের সম্মুখে ছিল। কাশীর দুই ক্রোশোত্তরে বৌদ্ধদিগের সারনাথ মন্দির। এখানে পূর্ব্বে অনেক বসতি ছিল। গৌড়েশ্বর পালেরা ১০৮৩ অব্দে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন। এখন ভাঙ্গা ইট ও প্রস্তরে প্রায় ৩০।৩২ বিঘা ভূমি জুড়িয়া আছে। অবশেষের মধ্যে ৪৬ হাত উচ্চ ৪৬ হাত বিস্তৃত ও ৮ হাত বেধবিশিষ্ট প্রস্তর ও ইষ্টকে গ্রথিত এক স্তম্ভ আছে। উপরে নানা প্রকার অবয়ব ও ফলাদির প্রতিকৃতি খোদিত আছে। বৌদ্ধের বিখ্যাত চারি স্তম্ভের মধ্যে এটী একটী। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে অতি অল্প দূরেই নেপালীয়দের সুদৃশ্য মন্দির। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ মানমন্দির। ১৬৮০ অব্দে জয়পুররাজ জয়সিংহ ইহা নির্ম্মাণ করেন। বাটীটী সমচতুষ্কোণ, প্রস্তর নির্ম্মিত প্রশংসিত এবং উপরের সমতল ছাদের উপর নানাবিধ যন্ত্রাদি বিশিষ্ট। গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয় নিরূপণ করাই প্রস্তর নির্ম্মিত এই সকল প্রকাণ্ড যন্ত্রের উদ্দেশ্য। সূর্য্যের প্রাত্যহিক গতি নিরূপণার্থ ৭ হাত ৮ অঙ্গুল উচ্চ ও ছয় হাত বিস্তৃত ভিত্তি কাশীর যাম্যোত্তর রেখার উপর সংস্থাপিত আছে। গ্রহগণের দূরত্বাদি নিরূপণার্থ ২৪ হাত লম্বা ও ৩ হাত প্রশস্ত স্থান আর একটী যন্ত্র দ্বারা ব্যাপ্ত আছে। কিন্তু সকলই এখন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মানমন্দিরের দক্ষিণে দশাশ্বমেধ ঘাট ও বাঙ্গালি টোলা এখানে বাড়ীওয়ালাদের নিকট থাকিবার বাসা পাওয়া যায়। কিন্তু বাড়ীওয়ালারা গঙ্গাপুত্রের নিকট কমিসনী খান ও নিরীহ ভ্রমণকারীকে কুমারী পূজা ও নানা-

কার্য্যে রত করান। ইঁহাদের বাটীতে সকলই পাওয়া যায়। এই দিকেই কেদারেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, বিজয়নগরের রাজার বাটী, ভেলুপুর, দুর্গাবাটী ও কাশীর দক্ষিণ সীমা অসিসঙ্গম। দুর্গাবাটীতে বানরের বড় উপদ্রব। নিকটে চারিধার গাঁথান পুষ্করিণী। দুর্গাবাটীর মন্দিরটী উৎকৃষ্ট। প্রাঙ্গন মধ্যে দ্বাদশ স্তম্ভবিশিষ্ট কোণে কলস সমন্বিত ও ১৮০০ অব্দে মির্জাপুরের মাজিষ্ট্রেটদত্ত ঘণ্টাযুক্ত উত্তম খোদিত মণ্ডপ। অসি নদী একটী শুষ্ক নর্দ্দমা তুল্য। কিছু দূরে খালের পরিচয় পাওয়া যায়। তদনন্তর সিক-রোলে ইংরেজেরা বাস করেন। উৎকৃষ্ট উদ্যান উপনদী, নিকুঞ্জবন, পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যের গৃহ, গির্জ্জা, কাছারি, ডাকঘর ও অপরাপর হর্ম্ম্যে সিকরোল সুন্দররূপ সুশোভিত। রাজঘাট হইতে এখানকার গাড়ী ভাড়া ২৲। কাশী সহরে বসতি অতি ঘন। ছাদ হইতে ছাদান্তরে যাওয়া যায়। রাস্তা অতি অপ্রশস্ত ও জনপূরিত। সহর মন্দির ও ভারত বাসী রাজগণের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় শোভিত। প্রায় সহস্র মন্দির ও ৩০০ মসজিদ আছে। কাশীতে ৬৪ যোগিনী,৫৬ গণেশ,৯ চণ্ডী,১২ রবি,১৬ গৌরী, সপ্তঋষি, সপ্তপুরি, অষ্ট ভৈরব, চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ ও অসংখ্য শিব বিদ্যমান। বিপনি সকল দ্রব্যে পূর্ণ। বানারসী সাড়ী কালাবতুর কাজ, সূচের কাজ, ঝুটোপাথরের কাজ, সামান্য পাথরের জিনিস, সাধারণ গিল্টি জিনিস, কাষ্ঠের কৌটাদি ক্ষুদ্র জিনিস ও পিতলের সামান্য দ্রব্যের জন্য কাশী প্রসিদ্ধ। বুন্দলখণ্ডস্থ হীরার বাজারই কাশী। পাতিলেবু, পিয়ারা, আচার, আম, কুল, বেল, মোরব্বা ও আমলা উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়। কাশীর চিনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কোনমতে সত্যে ও কোনমতে ত্রেতায় শিব কাশী স্থাপন করেন। দিবদাসের সময়ে কাশী শূন্য ছিল। পরে পুনরায় শিববাস হয়। কলিতে বৌদ্ধের সময় হইতে ভোজের সময় পর্য্যন্ত ও পরে পালেদের সময়ে কিছুকাল বৌদ্ধদের বাস হইয়াছিল। পাঠান সময়ে দৌরাত্ম্য। আকবর কালে উন্নতি। আরংজেবের কালে বিনষ্ট প্রায় ও মহারাষ্ট্রকালে উন্নতিশীল হয়। তৎপরে বর্ত্তমানকাল। কাশীতে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বরুণাসঙ্গম ঘাট, এক মাইল পরে রাজঘাট, তেলিপাড়া, প্রহ্লাদ, ত্রিলোচন, লাল, গৌ, শীতলা, ব্রহ্মা, দুর্গা, পঞ্চগঙ্গা, রাম, ঘোষলা, শঙ্কটা,

সেন্ধিয়া, মণিকর্ণিকা, জলসাঁই, ললিতা, মীর, মানমন্দির, দশাশ্বমেধ চতুঃষষ্টি, পাঁড়ে, লল্যামিশ্রি, কেদার, হনূমান, শিবালা ও অসি এই কয়েকটী প্রধান ঘাট পাওয়া যায়।

কাশীর গঙ্গা ১২০০ হস্ত বিস্তৃত ও ৩৩ হস্ত গভীর। বর্ষায় ৪০ ফীট উচ্চ ও অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত হয়। কাশী তিন মাইল লম্বা ও অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত। মধ্যমেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া দেহলি গণেশকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে শাস্ত্রমতে কাশীর সীমা হয়। কাশীর বিপরীত পারে রামনগরের রাজবাটী। তন্নিকটে চিত্রসিংহের পুষ্করিণী ও অর্দ্ধনির্ম্মিত দেবতাদি সহ মন্দির। কেল্লা মধ্যে বেদব্যাসের মুর্ত্তি, তথায় মাঘ মাসে মেলা হয়। কাশীতে দোলের ৭ দিন মধ্যে বুড়োয়া মঙ্গলের মেলার বড় ধুম। কাশীর অন্তর্গৃহ যাত্রা ও পঞ্চক্রোশী যাত্রা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

অন্তর্গৃহ যাত্রা—১ মোদবিনায়ক জ্ঞানবাপী পূর্ব্বে কাশীকরোয়াতগলি, ২ প্রমোদবিনায়াক আরংজেবের মসজিদ পূর্ব্বে, ৩ সুমুখবিনায়ক ঐ স্থানে, ৪ দুর্ম্মুখ ঐ, ৫ গণনাথ জ্ঞানব্যাপীর বাজার দক্ষিণে, ৬ বিশ্বেশ্বর, ৭ মণিকর্ণিকা, ৮ সিদ্ধিবিনায়ক ঐস্থানে, ৯ মণিকর্ণিকেশ্বর কাকারাম গলি, ১০ কম্বলাশ্বতর ঐস্থানে, ১১ বাসুকীশ্বর শঙ্কটাঘাট, ১২ পর্ব্বতেশ্বর, ১৩ গঙ্গাকেশব ললিতাঘাট, ১৪ জরাসন্ধেশ্বর মীরঘাট, ১৫ সোমেশ্বর মানমন্দির ঘাট, ১৬ বরাহেশ্বর দশাশ্বমেধঘাট নিকট, ১৭ ব্রহ্মেশ্বর খালিসপুরা নিকট, ১৮ অগস্তীশ্বর ঐ স্থানে, ১৯ কশ্যপেশ্বর জঙ্গম মহল্লা, ২০ হরিকেশব ঐ স্থানে, ২১ বৈদ্যনাথ কুদৈয়ের চৌকী নিকট, ২২ ধ্রুবেশ্বর ঐ স্থানে, ২৩ গোকর্ণেশ্বর ঐ স্থানে, ২৪ হাটকেশ্বর হড়হাচৌক, ২৫ অস্থিক্ষেপ তড়াগ ঐ, ২৬ কিকসেশ্বর ঐ, ২৭ চণ্ডেশ্বর শঙ্কটাঘাট নিকট, ২৮ বীরেশ্বর ঐ, ২৯ চিত্রগুপ্ত মছরহটার ফাটক চৌকের উত্তর, ৩০ চিত্রঘাট চন্দিনাউরগলি, ৩১ পশুপতীশ্বর চৌক নিকট, ৩২ ভারভূতেশ্বর রাজদ্বার নূতন চৌকনিকট, ৩৩ পিতামহেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী মহল্লা, ৩৪ কলসেশ্বর ঐ, ৩৫ বিশ্বেশ্বর ঐ, ৩৬ নাগেশ্বর ঘোষলাঘাট, ৩৭ অগ্নীশ্বর ঐ, ৩৮ হরিশ্চন্দ্র শঙ্কটাঘাট, ৩৯ চিন্তামণি ঐ, ৪০ সেনাবিনায়ক ঐ, ৪১ বশিষ্ঠ বামদেব ঐ, ৪২ সীমাবিনায়ক ঐ, ৪৩ বরুণেশ্বর ললিতাঘাট, ৪৪ ত্রিসন্ধেশ্বর ঐ, ৪৫ বিশালাক্ষী মীরঘাট, ৪৬ ধর্ম্মেশ্বর ঐ, ৪৭ ধর্ম্মকূপ ঐ,

৪৮ বিশ্ববাহুকা ঐ, ৪৯ আশাবিনায়ক ঐ নিকট, ৫০ বৃদ্ধাদিত্য ঐ, ৫১ চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর ঐ নিকট, ৫২ ব্রাহ্মীশ্বর ঐ, ৫৩ মনঃপ্রকামেশ্বর ঢুণ্ডির অদূরে, ৫৪ ঈশানেশ্বর ঐ, ৫৫ চণ্ডিচণ্ডেশ্বর ঐ,৫৬ ভবানীশঙ্কর ঐ,৫৭ অন্নপূর্ণা, ৫৮ ঢুণ্ডিরাজ, ৫৯ নকুলেশ্বর ঢুণ্ডির অদূরে, ৬০ রাজরাজেশ্বর দণ্ডপাণির অদূরে, ৬১ পরান্নেশ ঐ, ৬২ লাঙ্গুলেশ্বর কচৌরিগলি, ৬৩ পরদ্রব্যেশ্বর ঢুণ্ডির অদূরে, ৬৪ প্রতিগ্রহেশ্বর ঐ, ৬৫ নিষ্কলঙ্কেশ্বর ঐ, ৬৬ মার্কণ্ডেয়েশ্বর ঐ, ৬৭ অপ্সদেশ্বর জ্ঞানবাপীর উত্তর ফটক, ৬৮ গঙ্গেশ্বর জ্ঞানবাপীর অশ্বত্থতলে, ৬৯ জ্ঞানবাপী, ৭০ নন্দীকেশ্বর ঐ স্থানে, ৭১ তারকেশ্বর ঐ, ৭২ মহাকালেশ্বর ঐ,৭৩ দণ্ডপাণি বিশ্বেশ্বরের অদূরে, ৭৪ মহেশ্বর জ্ঞানবাপীর অদূরে, ৭৫ মোক্ষেশ্বর ঐ, ৭৬ বীরভদ্রেশ্বর ঐ, ৭৭ অবিমুক্তেশ্বর ঐ, ৭৮ পঞ্চগণেশ জ্ঞানবাপীর দরজার বামে, ৭৯ বিশ্বেশ্বর। ইতি কাশীখণ্ডে ৮০ অধ্যায়ে লিখিত অন্তর্গৃহ যাত্রা।

পঞ্চক্রোশীযাত্রা।—মণিকর্ণিকা। সিদ্ধবিনায়ক ঐ। মণিকর্ণিকেশ্বর। গঙ্গকেশব ললিতাঘাট। ললিতা ঐ। জরাসন্ধেশ্বর মীরঘাট। সোমেশ্বর দশাশ্বমেধ। দালভেশ্বর মানমন্দির। শূলটঙ্কেশ্বর দশাশ্বমেধ। আদিবরাহ ঐ। দশাশ্বমেধ। বন্দিদেব রাণামহল্লাঘাট। সর্ব্বেশ্বর যোগিনীঘাট। কেদারেশ্বর সোনাপুর রাস্তা। হনূমদীশ্বর হনূমানঘাট। সঙ্গমেশ্বর অসিসঙ্গমঘাট। লোলার্ক বালোকানার্ক ঐ। অর্কবিনায়ক ঐ। দুর্গাকুণ্ড দুর্গাবাটী। দুর্গাবিনায়ক ঐ। দুর্গাদেবী ঐ। বিশ্বক্সেনেশ্বর কর্দ্দমেশ্বর রাস্তা। কর্দ্দমেশ্বর কান্দওয়াগ্রাম। (অত্র ৩॥০ ক্রোশ পরে প্রথম দিন প্রায় শেষ)। কর্দ্দম তীর্থ তত্র। কর্দ্দমকূপ তত্র। সোমনাথ কালেজ মহল্লা। বিরূপাক্ষ তত্র। নীলকণ্ঠ অমরগ্রাম। নাগেশ্বর তত্র। চামুণ্ডা অওড়েগ্রাম। মোক্ষেশ্বর তত্র। বরুণেশ্বর তত্র। বীরভদ্রেশ্বর ঢেলনাগ্রাম। বিকটাক্ষ তত্র। উন্মত্তভৈরব ঘোরাগ্রাম। নীলগণ ঘোরাগ্রাম। কালকূট বিনায়ক নিকটে জঙ্গলে। বিমলা দুর্গা তদগ্রে। মহাদেব তদগ্রে। নন্দিগণ তদগ্রে। ভৃঙ্গারীট তদগ্রে। গণপ্রিয় তদগ্রে। বিরূপাক্ষ গৌরগ্রাম। যক্ষেশ্বর তদগ্রে। বিমলেশ্বর তদগ্রে। মোক্ষেশ্বর তদগ্রে। জ্ঞানদা তদগ্রে। অমৃতেশ্বর তদগ্রে। গন্ধর্ব্বনাগর তদগ্রে ভীমচণ্ডীগ্রাম (অত্র

৭ ক্রোশ পরে দ্বিতীয় দিন শেষ) ভীমচণ্ডী অত্র। চণ্ডবিনায়ক অত্র। রবিরক্তক্ষ্যা অত্র। নরকাক্রণার তারশিব অত্র। একপাদ গণ কচনারগ্রাম। মহাভীম শিবসাগর পুষ্করিণী। ভৈরব হরসোমগ্রাম। ভৈরবগণ অত্র। ভূতনাথ তদগ্রে। সোমনাথ তদগ্রে। সিন্ধুসাগর তদগ্রে। কামনাথ ঝোসাগ্রাম। কপর্দ্দীশ্বর অত্র। কামেশ্বর অত্র। গণেশ্বর অত্র। বীরভদ্র চৌখণ্ডীগ্রাম। চতুর্ম্মুখ অত্র। গণনাথ অত্র। দেহলি বিনায়ক অত্র। ষোড়শ বিনায়ক অত্র। উদণ্ডবিনায়ক ভুইনীগ্রাম। উৎকলেশ্বর অত্র। রুদ্রাণী অত্র। তপোভূমি অত্র। বরণা রামেশ্বরগ্রাম। (বার ক্রোশ পরে তৃতীয় দিন শেষ)। রামেশ্বর অত্র। সোমনাথ অত্র। ভরতেশ্বর অত্র। লক্ষ্মণেশ্বর অত্র। শত্রুঘ্নেশ্বর অত্র। দ্যাবাভূমি অত্র। নহুশেশ্বর অত্র। অসংখ্যাত লিঙ্গ বরুণাপার। অসংখ্যাত তীর্থ অত্র। শঙ্খেশ্বর করোথাগ্রাম। পাশপানি কুলবেড়িয়া। পৃথ্বীশ্বর খজরীগ্রাম। স্বর্গভূমি অত্র। যুপসরোবর দিৎদয়ালপুর। বৃষভধ্বজ কপিলধারাগ্রাম। (নয়ক্রোশ পরে চতুর্থ দিন শেষ)। বৃষভধ্বজ অত্র। জ্বালানৃসিংহ কটুয়াগ্রাম। বরুণাসঙ্গম তীর্থ অত্র। সঙ্গমেশ্বর অত্র। আদিকেশব অত্র। খর্ব্বনিবায়ক অত্র। প্রহ্লাদেশ্বর প্রহ্লাদঘাট। ত্রিলোচন ত্রিলোচনঘাট। বিন্দুমাধব পঞ্চগঙ্গাঘাট। পঞ্চগঙ্গা অত্র। শতগভস্তীশ্বর অত্র। মঙ্গলা গৌরী। বশিষ্ঠ বামদেব শঙ্কটাঘাট। পর্ব্বতেশ্বর অত্র। মহেশ্বর জ্ঞানবাপী। সিদ্ধিবিনায়ক মণিকর্ণিকাঘাট। অত্র ষট্পঞ্চাশদ্বিনায়ক। মণিকর্ণিকা। বিশ্বেশ্বর। মুক্তিমণ্ডপ। বিষ্ণুবিশ্বেশ্বর দ্বার ভিতরে বামে। দণ্ডপাণি ঢুণ্ডী নিকট। ঢুণ্ডিরাজ। ভৈরব চবুতারা পার্শ্ব। আদিত্য তুলসী দেবী নিকট পঞ্চগণেশ জ্ঞানবাপীর দ্বারে। ইতি কাশীরহস্যে একত্রিংশৎ অধ্যায়ে পঞ্চক্রোশী যাত্রা।

কাশী হইতে অযোধ্যা লক্ষ্ণৌ ও নৈমিষাদি দেখিতে ইচ্ছা হইলে অযোধ্যাগামী রেলে আরোহণ করিবে। ২৫ মাইল পরেই রামায়ণের স্যন্দিকা-নদী। যাহার তীর হইতে রাম বিদায় লইয়া শৃঙ্গবের পুরে গমন করেন। ৭ মাইল অন্তরে গোমতীতটে জৌনপুর। এককালে এই স্থান স্বাধীন পাঠান রাজাদের রাজধানী ছিল। কেল্লা প্রস্তরময় ও মসজিদ অতি

প্রকাণ্ড। ঘোরী ও লিখিজি পাঠান প্রথায় মিশ্রিত নানাদিকে নানা-হর্ম্ম্য রহিয়াছে। পুল অতি চমৎকার। প্রায় ৩০০ শত বর্ষ হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্যে ১৭৭৬ অব্দের বন্যায় এমন জলময় হয় যে ইহার উপর দিয়া বার্কার সাহেব সৈন্যসহ পোত লইয়া চলিয়া যান তথাপি এক্ষণ পর্য্যন্ত একটী কঙ্করও শিথিল হয় নাই। এখানে আতর, উৎকৃষ্ট ফুলেল তৈল ও গোলাপ পাউডার আদি প্রস্তুত হয়। জৌনপুরের কিছুদূর পরে মালিপুর। মালিপুরের পশ্চিমে গোমতীতটে প্রাচীন কুশপুর বা সুলতানপুর। কথিত আছে যে ইহার ১৮ মাইল পূর্ব্বে ধোপাপুরে রাম রাবণ বধান্তে স্নান করিয়া পাপচ্যুত হন। এখনও জ্যৈষ্ঠের শুক্লা-দশমীতে মেলা হয়। নিকটে খরার কেল্লা ও মুসলমান চূর্ণিত বিস্তর হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ১৫ মাইল উত্তরে গোমতীতটে শ্বেতবরাহ-পুর। রামনবমীতে ও কার্ত্তিকে মেলা হইয়া থাকে।

সালিপুরের পর অযোধ্যা ষ্টেসন। আর সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। কেবল সেই প্রাচীন সরযূ মৃদু মৃদু বহিতেছে। সরযূ দেখিয়া মন আকুল হইয়া উঠিল। আজ কোন্ গৌরবের কবরক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়া-ইলাম, কোন্ অতীত বিভবের ভবনে উপস্থিত হইলাম। এই না সেই বাল্মী-কির অযোধ্যা ছিল। “যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্বমনস্থিরং, নসদিদং জগদিত্যবধারয়।„ উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সরযূ প্রবাহিত। উত্তর পূর্ব্বকোণে স্বর্গদ্বারঘাট হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তর পশ্চিমকোণে গোপ্রতার ঘাট পর্য্যন্ত প্রাচীন অযোধ্যানগরের সীমা। উত্তর দক্ষিণের বিস্তার সরযূ অবধি তমসাপর্য্যন্ত ছিল, ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া উত্তর মুখে যাইতে অল্প দূরে ডাইনদিকে ভাঙ্গা ইট ও কঙ্করগ্রথিত ৪৪ হাত উচ্চ মণি পর্ব্বত। ইটগুলি দীর্ঘে ও প্রস্থে ১৫ অঙ্গুল, বেধ ৪ অঙ্গুল। নীচে মাটির গাঁথন ও উপর পাকা। চীন যাত্রী-দের কথায় বোধ হয় মণিপর্ব্বতের উপরিভাগ অশোক গাঁথিয়া যান। ইহার ৫০০ ফিট দক্ষিণে ১৮ হাত উচ্চ ভাঙ্গা ইটের কুবের পর্ব্বত। উপরে জঙ্গল ও দুইটা তেঁতুল গাছ। নিকটে গণেশকুণ্ড বা ইমাম তালাও। পার্শ্বেই অযোধ্যা জয় করিতে হত সিস ও আবুরের কবর। দক্ষিণ পূর্ব্বে ইষ্টকপূর্ণ সুগ্রীব

পর্ব্বত। ইহার উত্তরদিকের খণ্ড ৩০০ ও দক্ষিণদিকের খণ্ড ২০০ ফিট সম-চতুষ্কোণ। ইংরেজেরা বলেন, এই তিনটি পর্ব্বত বা ইষ্টক রাশি ২৪০০ বর্ষেরও অধিক প্রাচীন! এই তিনটি দেখিয়া ডাইন বা বামে যে পার্শ্বে যাও উত্তর মুখে গেলেই হনুমানগড় বা রামকট্। রামকটের পূর্ব্বে মান-সিংহ মন্দির ও উত্তরে সরযূ তটে রামের স্নানঘাট স্বর্গদ্বার। রামকট বা বর্ত্তমান অযোধ্যায় পূর্ব্ব প্রান্তের রাস্তা ধরিয়া সোজা পশ্চিমমুখে ফৈজা-বাদের দিকে গমন করিলে চক পাওয়া যায়। চকের উত্তরদিকে পশ্চিম গামী রাস্তা ও পশ্চিমদিকের উত্তর পশ্চিমগামী রাস্তা কলিকাতা কেল্লার মধ্য দিয়া গোপ্রতার উদ্যানের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। উদ্যান নিম্নে সুবিখ্যাত গোপ্রতার ঘাট। এই স্থানে রাম প্রজাসহ সরযূতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। মনুর সময়াবধি মহানন্দের সময়পর্য্যন্ত অযোধ্যায় সূর্য্যবংশীয়েরা রাজ্য করেন। বুদ্ধ এখানে কিছুকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মগধ রাজারা অনেককে বৌদ্ধ করিয়া অযোধ্যায় অনেক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহা-দের দৌরাত্ম্যে অনেক হিন্দুমন্দির বিনষ্ট ও জঙ্গলাবৃত হয়। পরে বিক্রমা-দিত্য লক্ষ্মণঘাট হইতে পুরাণ দেখিয়া মাপ আরম্ভ করেন। নাগেশ্বরনাথ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অপরাপর স্থান উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৩৬০ মন্দির নির্ম্মিত হয়। চীনযাত্রী হোয়ানথসং আসিয়া বিস্তর ব্রাহ্মণে পূর্ণ ৫০ প্রধান হিন্দুমন্দির ও ২০ বৌদ্ধমঠ দেখেন। কয়েকজন জৈনতীর্থঙ্কর এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহা-দেরও মন্দির নির্ম্মিত হয়। পরে মুসলমান সময়ে সুলতান বাবর আসিয়া ১৫২৮ অব্দের এপ্রেল মাসে জন্মস্থানের মন্দির ভগ্ন করিয়া তথায় মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মসজিদ মধ্যস্থ ৫।৬ হাত লম্বা উৎকৃষ্ট প্রস্তরস্তম্ভ গুলি প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের অবশেষ মাত্র। অযোধ্যার সুবাদারেরা প্রথমে ফৈজা-বাদেই থাকিতেন। জন্মস্থানাদি বহুকাল মুসলমানদের হস্তে ছিল। ১৮৫৫ অব্দে বলপূর্ব্বক হিন্দুরা হনুমানগড় দখল করে। এবং তিনবার আক্রমণের পর জন্মস্থানের মসজীদ দখল করিয়া লয়। তদবধি হিন্দু ও মুসলমান উভ-য়েই জন্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজেরা বিবাদ ভঞ্জনার্থে রেল দিয়া দিয়াছেন। মুসলমানেরা মসজীদে নমাজ ও হিন্দুরা বাহিরে একটি গাঁথা

জায়গায় পুজা করে। স্বর্গদ্বার ও ত্রেতাকা ঠাকুরের মন্দির ভগ্ন করিয়া আরংজেব মসজীদ নির্ম্মাণ করে। ত্রেতাকা ঠাকুরের মন্দির স্থান (যেখানে যজ্ঞ হয়) পঞ্জাবস্থ কালুর রাজা দখল করেন। এবং খৃঃ ১৭৮৪ অব্দে যশোবন্ত রাও হোলকারের স্ত্রী বিখ্যাত অহল্যা বাই ঘাট নির্ম্মাণ ও মন্দির সংস্কার করিয়াছেন। এখনও হোলকারেরা বার্ষিক ২৩১ টাকা দিয়া থাকেন। অযোধ্যার তীর্থের মধ্যে বিষ্ণুহরাদি সপ্তহর, বর্যহরের সম্মুখে জানকীঘাট, তৎস্থানে রামঘাট বা স্বর্গদ্বারঘাট, তাহার পশ্চাতে রামসভা, তাহার দক্ষিণে দন্তধাবন কুণ্ডাদি রহিয়াছে। জন্মস্থানের পার্শ্বে জানকীর রন্ধনস্থান, নিকটে ভরতজন্ম স্থান, বৈকেয়ীর বাটী অপরদিকে সুমিত্রার বাটী ও দক্ষিণ পূর্ব্বে সীতাকূপ। হনুমন্ত কুণ্ডের নিকট সুবর্ণদ্বার, তদ্দক্ষিণে জাতবেদী অগ্নিকুণ্ড, তৎপশ্চিমে খিরাকুণ্ড, তাহার পরে গণেশ দশরথ কৌশল্যাদি নানাকুণ্ড। নদীতীরে বিষ্ণুহরি নিকটে চক্রতীর্থ বশিষ্ঠ কুণ্ড ও ঋণমোচন ঘাট। গুপ্তহরি ও চক্রহরির নিকট সরযূতটে গোপ্রোতার ঘাট ইত্যাদি।

জৈন তীর্থের মধ্যে আদি তীর্থঙ্কর আদিনাথের জন্মস্থান, মন্দির ভগ্ন করিয়া ১২০০ অব্দে সাজুরন ঘোরী মসজীদ করে। স্বর্গদ্বারের নিকট মোরী তলাতে এই মন্দির স্থান জুরান টিল্লা নামে খ্যাত। ১৭৮১ অব্দে ইটারা পুষ্করিণীর নিকট দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথের জন্মস্থানের মন্দির করা হয়। সরাই নিকট চতুর্থ তীর্থঙ্কর সোমস্থনাথের মন্দির। ভিতরে পরেশ-নাথের দুই ও নেমনাথের তিন মূর্ত্তি আছে। সরযূ বা ঘর্ঘরাতটে গোলা-ঘাট নালার নিকট চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথের পাদযুগল আছে। অল্প-দিন হইল আলমগরী মহল্লায় আর এক অজিতনাথের মন্দির হইয়াছে। অযোধ্যায় নির্ব্বাণী, নির্ম্মায়ী, দিগম্বরী, খাকী, মহানির্ব্বাণী, শান্তকী ও নিরা-লম্বী এই পঞ্চ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের মঠ আছে। কোন২ মঠে ৩০০।৪০০ করিয়া লোক থাকে, বাকী ভারতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। মঠের ব্যয় জন্য লাখরাজ জমী ও অন্যান্য বন্দোবস্ত আছে। অযোধ্যার অনতিদূরে নন্দিগ্রাম। সরযূর অপর পারে দশরথ পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সুগন্ধ কেওড়াবনে আকীর্ণ। এখানকার নামাবলী, জপমালা ও তিলক-মৃত্তিকা প্রসিদ্ধ।

অযোধ্যার প্রায় ৫৮ মাইল উত্তরে গোণ্ডার নিকট রাপ্তীতটে যুবনাশ্বের শ্রাবস্তি পুরী। বর্ত্তমান নাম সাহেতমাহেত। বুদ্ধ এখানে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধ নষ্ট করিয়া পুনরায় হিন্দু নগর করেন। এক্ষণে চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ মধ্যে মধ্যে স্তূপ ও পুষ্করিণীর খাত। একদিকে ৩।০ মাইল অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্তূপটী দুর্গভিত্তির অংশ,২৫ ফীট উচ্চ স্তূপটী সুদত্তের ও ৩৫ ফীটটী অঙ্গুলি মাল্যের ও পুষ্করিণী তিনটী বৌদ্ধনিন্দাকারীদিগের বিনাস স্থান হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রাবস্তি নিকটে ভারতবর্ষীয় বিখ্যাত আট বিহারের মধ্যে এক বিহার ছিল। এখনও বর্ম্মার লোক তীর্থ করিতে আসে।

লক্ষ্ণৌ। অযোধ্যা ষ্টেসন পার হইয়া বিখ্যাত স্থান লক্ষ্ণৌ। নদীতীর হইতে লক্ষ্ণৌ দেখিতে অতি সুন্দর। গোমতীর বিমল সলিলোপরি লক্ষ্ণৌ নগর বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ সৌধমালায় নদীতীর বিকশিত। তদুপরি জাজ্বল্যমান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গম্বুজ শোভা। থাকে থাকে আকাশভেদী মিনার শ্রেণী, স্থানে স্থানে নিকুঞ্জবনের নিবিড়পত্রের অন্তরাল। দেখিলে বোধ হয় যেন কি অপরূপ রূপ দেখিতেছি। সায়ংকালের সৌন্দর্য্য বড় মনোহর। দিল্লীর পর এই নগর প্রধান হইয়াছিল, ইহারও এখন আর সে ঐশ্বর্য্য নাই, শোভা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। গোমতীর প্রস্তর সেতু ১৭৮০ অব্দে উদ্দৌলা নির্ম্মাণ করেন। গাজীউদ্দীন লৌহ সেতুর উদ্যোগ করিয়া যান। তাহার মৃত্যুর ৩০ বর্ষ পরে এই সেতু নির্ম্মিত হয়। নগর প্রবেশ করিয়া দেলখোস বাটীর দিকে যাত্রা করিলাম। সদতআলি কৃত্রিম অরণ্য প্রস্তুত করিয়া এই স্থান পরিপূর্ণ করেন। ইহাতে তিনি কামিনী সহ বনবিহার বা মৃগয়া করিতেন। বিদ্রোহ সময়ে কাম্পবেল্ এই স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর মার্টিনিয়ার বা কনষ্টাণ্টিয়া গৃহ। ৭৫ বর্ষ পুর্ব্বে মার্টিনিয়ার নামক একজন ফরাশি সেনাপতি আসক উদ্দৌলার জন্য এই প্রাসাদ আরম্ভ করেন। ইহার মধ্যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট গৃহ আছে। মার্টিনিয়ার এক অদ্ভুত রকমের লোক ছিলেন। সকল দেশীয় সকল প্রকার গৃহের অনুকরণ করিয়া তিনি ইহার এক এক অংশ নির্ম্মাণ করেন। কোথাও বা প্রকাণ্ড সিংহের প্রতিমূর্ত্তি, কোথাও বা চীনদেশীয় সন্ন্যাসীর আকার,

কোথাও বা মস্তক নাড়িয়া বেড়ায় এমন সকল স্ত্রীলোকের অবয়ব ও কোথাও বা নানাদেশীয় নানা দেব দেবীর প্রতিকৃতি। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ও তন্মধ্যে একটা স্তম্ভ। প্রাসাদ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু পাছে নবাব দখল করেন এজন্য তথায় আপনার কবর মণ্ডপ ও এক স্কুল স্থাপন করিয়া যান। ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহীরা মার্টিনের দেহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনেকাংশ বিনষ্ট করিয়াছে।

তদনন্তর সেকেন্দরবাগ। নবাব ওয়াজাদ আলি সেকেন্দর মহল নামক তাঁহার এক পত্নীর জন্য এই উদ্যান প্রস্তুত করেন। স্থানটী প্রত্যেক-দিকে ২৪০ হাত। চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রবেশের একটী প্রকাণ্ড দরজা। বিদ্রোহ কালে দুই সহস্র সিপাহী এখান হইতে ইংরেজদের উপর ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিল। ইংরেজেরা বহুকষ্টে উদ্যান অধিকৃত করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করেন। তদনন্তর নজীব অসরক বা সন-জফ। ইহা অযোধ্যার প্রথম সুবাদার গাজীউদ্দিন হাইদরের কবর। এই কবর আরবদেশস্থ নজফ পর্ব্বতস্থিত মহম্মদ জামাতার কবরের অনু-করণ বলিয়া ইহার নাম নজফ হইয়াছে। গাজীউদ্দীন ইহার সংস্করণ জন্য বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এখানে অযোধ্যার নবাব ও তাহাদের বেগম-গণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে। লক্ষ্ণৌ অধিকার কালে কমাণ্ডরনচীফ এই স্থানে বার বার বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে পিল সাহেবের কামান দ্বারা দুই ঘণ্টা কাল গোলাবৃষ্টির পর বিভিন্ন হইলে ইংরেজেরা নগর প্রবেশ করিলেন। বামে কমিশনর উইং ফিল্‌ড সাহেবের উদ্যান। বৃক্ষ-গুলি উৎকৃষ্টরূপ শ্রেণীবদ্ধ, মধ্যে নানাজাতীয় হরিণ চরিতেছে। অনতি-দূরে গির্জ্জা। বেগম কুঠী আক্রমণ কালে এই স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মেজর হডসন প্রাণত্যাগ করেন।

অনন্তর সুশোভিত হজরথগঞ্জের পথ পার হইয়া কায়সরবাগ। কায়সর অযোধ্যার সুবাদারদিগের গর্ব্বসূচক উপাধিমাত্র। ইহাদিগের মোহরেও ঐ নাম আছে। পদচ্যুত রাজা ওয়াজাদ আলি ১৮৪৮ অব্দে আরম্ভ করিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই উদ্যান সমাপন করেন। ইহাতে আসবাব সহ ৮০ লক্ষটাকা ব্যয় হইয়াছে। উত্তর পূর্ব্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে তারা-

বালি কুঠীর সম্মুখে এক অনাবৃত স্থান। ইহারই ডাইনদিকের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বন্দীগণ কারাগারে নীত হইত। দ্বারের সম্মুখে জিলেখানা নামক স্থানে নবাব বাহির হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্রীগণ সজ্জিত হইত। তাহার ডাইনদিকে চীনবাসনে সজ্জিত চীনাবাগ ছিল, তাহার পর অর্দ্ধমনুষ্যাকার মৎস্য-মূর্ত্তি শোভিত গেট পার হইয়া হজরতবাগ। ডাইনদিকে চণ্ডীবালী বারদ্বারী। এই স্থান রৌপ্যদ্বারা সজ্জিত থাকিত। এই স্থানেই খাসমহল ও বাদসাহেদ মনজল। ওয়াজাদআলি সদতআলি নির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত বাদসাহী মন্দির আপন রাজবাটীর অন্তর্ভুক্ত করেন। হরিত অর্দ্ধমৎস্যাকার মনুষ্য শোভিত গেটে আলিলখী খাঁ মন্ত্রী বাস করিতেন। বামদিকে রাজনাপিত আজীমউলা খাঁ নির্ম্মিত চৌলকলহায়র নামক গৃহপুঞ্জ। বাদসাহ বেগমদের আবাসের জন্য চারিলক্ষ টাকায় এই স্থান খরিদ করেন। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহী বেগম এই স্থানে বাস করিতেন এবং এইস্থানে ব্রিটীশ বন্দীগণ আবদ্ধ ছিল। কিছুদূর গমন করিলে মার্ব্বেল-মণ্ডিত বৃক্ষতল। মেলার দিন ওয়াজাদআলি সা ফকীরের পীতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এই স্থানে বসিতেন। কিছু দূর পরে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত লাখী দরওয়াজা। লাখী দরওয়াজা পার হইয়া কায়সরবাগের বিস্তীর্ণ সমচতুষ্কোণ মণ্ডল। এই স্থানে আগষ্ট মাসে মেলা হইত, এবং এই মসজিদের পার্শ্বস্থ হর্ম্ম্য সমূহে বহুতর বেগম বাস করিত। লাখী দরওয়াজার অনতিদূরে বামদিকে চাকচিক্যশালী অর্দ্ধচন্দ্রাকার কায়হর পছন্দ। নাসীরউদ্দীন হায়দরের মন্ত্রী রসুমউদ্দৌলা ইহা নির্ম্মাণ করেন। ওয়াজাদআলি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া প্রিয়তমা মহল মাসুকুল সুলতানাকে দেন। ইহারই নিম্নে ধোরেরার রাজার প্রেরিত ব্রিটিশ বন্দীগণ বধের জন্য রক্ষিত ছিল। ডাইনদিকে আর একটী জিলেখানা। এই জিলেখানা পূর্ব্বদিকের জিলেখানার জবাব মাত্র। এই দরজা দিয়া আমরা কায়সরবাগের বাহির হইলাম। নিকটে সের দরজা বা নীল-দরজা। এখানে সেনাপতি নীল কায়সরবাগের দরজা হইতে ক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। কায়সরবাগের বিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ মণ্ডল ও চিনিবাজারের মধ্যে সদৎআলি বা জিনিৎ আরমাগ ও তাঁহার

বেগম মুরশিদজাদীর কবর। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গাজীউদ্দীন হাইদর এই কবর নির্ম্মাণ করেন। কায়সরবাগের সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে তারাওয়ালী কুঠী বা মানমন্দির। ইংরেজেরা এখানে এখন ব্যাঙ্ক করিয়াছেন। ইহারই সম্মুখে ধৌরেরা ও মিথৌলি রাজা প্রেরিত ব্রিটিশ বন্দীগণকে হত্যা করা হয়। এখন ইংরেজেরা স্মরণচিহ্ন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নদীতীরে নসিরউদ্দীন হাইদরের বাসস্থান ফরহদবক্স ও তাহার পত্নীগণের বাসস্থান ছত্রমনজিল। গিল্টি করা ছত্র শোভিত ছিল বলিয়া ছত্রমনজিল নাম হইয়াছে। ইংরেজেরা এক্ষণে পুস্তকাগার করিয়াছেন। ফরহদবক্স অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ গৃহ সদতআলির সময়াবধি ওয়াজাদ আলির সময়পর্য্যন্ত রাজবাটী ছিল। ইহার নদীতীরস্থ অংশ জেনেরেল মার্টিন সাহেব প্রস্তুত করিয়া অযোধ্যাপতিকে বিক্রয় করেন। অবশিষ্টাংশ সদত আলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যস্থ দরবারগৃহের নাম কছরুস-সুলতান বা লালবারদারী। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পোষ্টআফিস করিয়াছেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট এই স্থানে বাদসাহদিগকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নজর প্রদান করিতেন। এই জন্ম বাদসাহা বেগম ও মুনাজান বেগম এখানকার সিংহাসনে বসিবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং বিদ্রোহী সিপাহীরাও মুনাজান বেগমের সাপেক্ষে রেসিডেণ্ট কর্ণেল লো সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিল। ফরহদবক্সের নদীতীরস্থ অংশে স্বর্ণবর্ণে জাজ্বল্যমান গম্বুজ শোভিত তিনটী অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য আছে। অপর পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে সৌধমালা শোভিত প্রশস্ত প্রাঙ্গন পরম্পরা, মৎস্যাদি পূরিত সরোবর নিচয়, প্রাচীন গ্রীক বীরগণের মার্ব্বেলমূর্ত্তি ও উদ্যানের মনোহর শোভা। দরবার হর্ম্ম্য পঞ্চতলবিশিষ্ট। সর্ব্ব নিম্নে দরবারগৃহ। তাহার নিকটস্থ ভাগ অশ্বশালা, ভৃত্যশালা, পত্নীশালা, ও অপরাপর গৃহ লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আবৃত। ফরহদবক্সের ছাদের উপর হইতে সুদৃশ্য লক্ষ্ণৌনগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার পর ইংরেজদিগের রেসিডেন্সি। সদত আলির সময়ে ত্রিতল বিশিষ্ট এই কুঠী নির্ম্মিত হয়। এখানে বিদ্রোহকালে ৫ মাস কাল কয়েকজন ইংরেজ আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত গৃহেই গুলি গোলার দাগ,

বিপৎকালে কয়েকজন ইংরেজের উপর যে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়ে এখন তাহা সেই রূপই আছে। হর্ম্মোর উত্তর পূর্ব্বগৃহে হেনরি লরেন্স যুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। নিকটে সেই গৃহ যেখানে ব্রিটিশ মহিলা বালক ও পীড়িতগণ প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পার্শ্বস্থ গির্জ্জা চূর্ণিত প্রায়। নিকটের মসজীদ ও দেশীয়দের গৃহ সকল ইংরেজেরা ভূমিসাৎ করিয়াছেন। এখন সকলই ভদবস্থায় পতিত। কেবল কবরভূমির পারিপাট্য হইয়াছে। এই সকল কবর মধ্যে লরেন্স নীল ও ব্যাকআদি বীরগণ নিহিত আছেন। রেসিডেন্সির অনতিদূরে মুখ্য ভবন বা কেল্লা। ২০০ বর্ষ পূর্ব্বে ইহা এক প্রধান কেল্লা ছিল। বিদ্রোহকালে ইংরেজেরা সংস্কারের ইচ্ছা করেন। কিন্তু সৈন্য অল্প থাকাতে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর আমরা এমামবারায় গমন করিলাম। প্রথমে একটী প্রকাণ্ড দরজা। পরে একটী প্রশস্ত স্থান। তাহার পরেই বিখ্যাত রোমী দরওয়াজা, এত উচ্চ, এত বিস্তৃত, এরূপ সজ্জিত ও এত শোভাশালী যে পৃথিবীতে এরূপ দরজা আর নাই। রোমী দরওয়াজা পার হইয়া অপেক্ষাকৃত আর একটী প্রশস্ত স্থান। চারিদিকেই মসীদ বামে এমামবারার শোভা। লক্ষ্ণৌ এমামবারা দুই প্রাঙ্গনে বিভক্ত। একটী হইতে একটী বিস্তীর্ণ সিঁড়ি দিয়া অপরটীতে উঠিতে হয়। উভয়েরই প্রবেশদ্বার বিশাল ও বিস্তৃত। গৃহটী ১১৪৮০ হাত লম্বা ও ৩৫ হাত বিস্তৃত। প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৫।০ হাত বিস্তৃত এক এক কুঠারী। ইহাতেই আসফ উদ্দৌলা নিহিত আছেন। হর্ম্যাটী অতি শোভাশালী ও ভিত্তিমূল অতি গভীর। আসফ উদ্দৌলা ইহাকে ভারতের সকল হর্ম্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিতে বহু টাকা ব্যয় করেন। কৈফৎউল্লার আদর্শ মনোনীত করিয়া তাহাকে নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করা হয়। কিন্তু যেরূপ অর্থ ব্যয় হইয়াছে সেরূপ হয় নাই। অভ্যন্তরে যাহা কিছু শোভা ছিল লক্ষ্ণৌ গ্রহণ কালে ব্রিটিশ সৈন্যেরা বিনষ্ট করিয়াছে। এখন গবর্নমেণ্ট অস্ত্রাগার করিয়াছেন। প্রাঙ্গন পার্শ্বের মসীদ তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। লক্ষ্ণৌ এমামবারার নিকটে দ্বিতীয় তাজের ন্যায় শোভিত ও বিনির্ম্মিত হোসেনাবাদ এমামবারা। বিসপ্ হিবর ইহার অবয়ব দৃষ্টে মোহিত হইয়াছিলেন। অযো-

ধ্যার তৃতীয় নবার মহম্মদআলি ইহা নির্ম্মাণ করেন। এখন ইহার মলিনাবস্থা। পার্শ্বের উদ্যান শোভাকর বটে। কিন্তু তাজের অপকৃষ্ট অনুকরণ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র গৃহে আচ্ছন্ন। মহরমের রাত্রিতে আলোকিত হইলে হোসেনাবাদের মসজিদ ও হর্ম্ম্যশ্রেণী অতি শোভাশালী হইত। অল্প দূরে পথের পার্শ্বে মহম্মদআলির সরোবরতীরে তাঁহার অর্দ্ধনির্ম্মিত মসজীদ। জুমামসজীদ হইতে উৎকৃষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কার্য্যারম্ভ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। নগর দর্শনার্থ তিনি সপ্ততল বিশিষ্ট সাতখণ্ড নামক স্তম্ভ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু চারিতলের পর আর হয় নাই। তদনন্তর মুসাবাগ। একটী উদ্যান ও তম্মধ্যে হর্ম্ম্য। সদৎ আলি এখানে বন্যপশুর লড়াই দেখিতেন। মুসা পদবীধারী ফরাশি নির্ম্মাণ করেন বলিয়া মুসাবাগ নাম, ইন্দুরের কবর জন্য নহে। ইহার পর সুদৃশ্য ক্যানিং কলেজ। তৎপরে আসফউদ্দৌলা নির্ম্মিত চক। চকের দরজা দুইটা আকবরের সমকালিক বলিয়া লোকে আকবরী বলে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন লক্ষ্ণৌ নগরের ভগ্নাবস্থা। দেখিতে লক্ষ্ণৌ নগরের সকল লোকই নবাবের মত। মুসলমান পূরিত লক্ষ্ণৌ নগরে মুসলমানের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিলাস দ্রব্য পাওয়া যায়। এখানকার মাটির জিনিস, ছিট, কালাবত্তুর কাজ, সুইকার কাজ, রৌপ্যদ্রব্য ও পিতলের বিদরী কার্য্য উৎকৃষ্ট। লক্ষ্ণৌ নগরের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল দূরে গোমতীর বামতটে বিখ্যাত নৈমিষারণ্য। বর্ত্তমান নাম নিমখার। আর সে ঋষি নাই, সে বন নাই। আর সূতের স্বর কর্ণগোচর হয় না, আর যজ্ঞীয় ধূম গগনমণ্ডল শোভিত করে না। যে গোমতীতীর রণমত্ত বীরদিগের সদর্প ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিত, আজ তাহাই দাসদিগের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতেছে। যে জলে জয়োন্মত্ত বীরগণ রুধিরাক্ত হস্ত ধৌত করিয়াছিলেন, সেই জল পাদ সেবাকারী দাসদিগের ধূলি ধূসরিত হস্তে কলুষিত হইবার ভয়ে যেন অদৃশ্য হইতেছে। যেখানে একজনের কৌশলে শত শত দানবদল নিমেষ মধ্যে নিহত হইয়াছিল, সেই ভূমিতে শত শত আর্য্য বসিয়া সাতশত বর্ষ দুঃখ ভোগ করিল দেখিয়া কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? যেখানে শৌনক যষ্টি সহস্র ঋষিকে শতবর্ষ ভোজন করাই-

য়াছেন, আজ সেখানে অন্নের জন্য আর্য্যেরা লালায়িত। পূর্ব্ব গৌরবের কিছুই নাই, কেবল সেই চক্রতীর্থ বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে বিষ্ণুর চক্রনেমি শীর্ণ হইয়াছিল। চক্রতীর্থ একটী ষট্‌কোণ সরোবর। চারিদিকে মন্দির। সরোবরের বিস্তার ৮০ হাত। কুণ্ড হইতে জল উঠিয়া দক্ষিণদিকের চৌদ্দ হাত প্রশস্ত গোদাবরী নালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। উত্তরে ১১০ ফীট লম্বা ৪০০ ফীট বিস্তৃত ও ৫০০ ফীট উচ্চ এক কেল্লা।

লক্ষ্ণৌ নগরে দুই রেল সম্মিলিত। বামের রেল কাণপুরে গিয়া কলিকাতা হইতে দিল্লীগামী রেল স্পর্শ করিয়াছে। ইচ্ছা হইলে ডাইন দিকের রেলে নৈমিষের ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে পাঞ্চাল বা রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিবে। লক্ষ্ণৌ হইতে হরদুয়ি পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে অবতরণ কর নিকটে কালিগঙ্গা সঙ্গম। কিন্তু কাণপুর হইতে ফরেক্কাবাদগামী রেলে ঐ স্থান আরও নিকট হয়। এই সঙ্গমেই প্রাচীন পাঞ্চাল মহোদয় গাধিপুর কান্যকুব্জ বা কনৌজ নগর অবস্থিত। এখন গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহে কালী প্রবাহিত হইতেছে। বর্ত্তমান কনৌজ সামান্য পল্লী মাত্র। গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে রংমহল ও জয়চন্দ্রের ভগ্নপুরী। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ভিত্তি ১৬০ হস্ত দীর্ঘ ৩ হস্ত বিস্তৃত ও ২৬ হস্ত উচ্চ। উপরে ৪০ হাত অন্তরে চারিটী স্তম্ভ। তাহার ৬।০ হাত পরে আর এক ভিত্তি। ৬ হাত পরে আর একটী এবং ১৪ হাত পরে চতুর্থ ভিত্তি আছে। দুর্গের ঠিক মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড হিন্দু মন্দির ছিল। জৌনপুরের ইব্রাহিম সাহা ১৪০৬ অব্দে তাহাকে নষ্ট করিয়া জমা মসজীদ করিয়াছেন। উহার অভ্যন্তর ৭২ হাত লম্বা ১৮ হাত প্রশস্ত ও চারি থাক স্তম্ভে সজ্জিত। ভিত্তিগাত্রে অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি ছিল, এখন চূণকামে আবৃত হইয়াছে। দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব্বে ১৪৭৬ অব্দে নির্ম্মিত মখদুম জহানীয়াও একটী হিন্দু মন্দির ছিল। এখনও ঘণ্টার শৃঙ্খল ঝুলিতেছে। কনৌজের দুর্গ ত্রিকোণাকার ছিল। স্থানে স্থানে উহার ভিত্তি ৪৬ হস্ত উচ্চ রহিয়াছে। দুর্গের অনতিদূরে সিংহ ভবানী গ্রামে ৪ হাত উচ্চ এক বুদ্ধমূর্ত্তি ১৮০ হাত উচ্চ বজ্রবারাহী মহিষমর্দ্দিনী ও শিবদুর্গার মূর্ত্তি উঠিয়াছে। মকরন্দ নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে সূর্য্য কুণ্ড। এখন শুষ্ক ও আলুক্ষেত্রে পরিণত। ভাদ্রমাসে মেলা

হইয়া থাকে। গ্রামের দক্ষিণে বৌদ্ধদিগের ভগ্নবিহার। উত্তরে রাজঘাটের নিকট হাজিহরমায়ন হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে মিয়ন কাসর পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ নগরের চিহ্ন পাওয়া যায়। যে দিকে চাও কেবল ভগ্নাবশেষ ও কবর-ক্ষেত্র। যে নগরের আভিশর্য্য বর্ণন করিতে বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে নগর হর্ষবর্দ্ধনের কালে ভারতকে কম্পান্বিত করিয়াছিল, যাহার আশ্রয়ে বৌদ্ধ বিদলিত ব্রাহ্মণগণ বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, যেখানে এক কালে ত্রিশহাজার পানের দোকান ছিল এবং যাহা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় নগর বলিয়া খ্যাত ছিল, আজ তার এই দশা।

কান্যকুব্জের উত্তর ও ফরেকাবাদের কিছু দূরে কালীনদীতটে প্রাচীন সাঙকাশ্যা নগরী। বাল্মীকির সে বর্ণনার আর কিছুই নাই। কেবল এক উচ্চ ভগ্ন ভূমির উপর কয়েকখান গৃহ ও পার্শ্বে আর কতকগুলি ভগ্নস্তূপ। কেল্লার চিহ্ন ৩৷৷০ মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ পশ্চিমে আধ মাইল দূরে রাজঘাট হইতে কাকরা ঘাট পর্য্যন্ত কালীনদী প্রবাহিত হইতেছে। পল্লীর দক্ষিণ স্তূপে বিশারীর মন্দির। তাহার ৪০০ ফীট উত্তরে অশোকের ৩৫ হাত উচ্চ শুণ্ডহীন হস্তীস্তম্ভ, দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রাচীন নাগকুণ্ডের অবশেষ কান্তিয়া তালাও। কিন্তু যেখানে বৌদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র-সহ মণিময় সোপানে অবতরণ করিয়াছিলেন, যেখানে অশোক তাঁহার প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে পূর্ব্ব চারি বৌদ্ধ বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, যেখানে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার স্তূপ ছিল, যেখানে পুণ্ডরীক বর্ম্মা বৌদ্ধকে দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকল স্থান স্থির করা বড় কঠিন। ১৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে এখানে বিস্তর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। প্রায় ১৮০০ বর্ষ হইল এই নগরের আভিশয্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। চীনযাত্রী হোয়ানথসঙ্গের সময়েও দশ হিন্দুমন্দির ও লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

এগুলি দেখিতে ইচ্ছা না হইলে হরাপুরি হইতে সাজেহানপুরে অগ্রসর হইবে। সাজেহানপুরের পর মুসলমানপুরিত বরেলী। জুয়া ও শকরা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। এখানকার দোসুতী ও কাষ্ঠের জিনিস উৎকৃষ্ট। ৩০ মাইল ঈশানকোণে গয়াভাট প্রাচীন শিলিভিত নগর।

বরেলীর ১৭ মাইল পরে এওনলা ষ্টেসন। এওনলার ৭ মাইল উত্তরে

প্রাচীন অহিছত্র নগর। অর্জ্জুন সহ দ্রোণ দ্রুপদকে পরাভূত করিয়া এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। যাইতে পথে মাঝে মাঝে গাঙ্গননদীর খাত। দূর হইতে এক শিবমন্দির নেত্র গোচর হয়। নিকটে গিয়া দুর্গ দেখিলে বোধ হয় যে অর্জ্জুন যথার্থই একজন ভয়ঙ্কর বীর ছিলেন। চীনযাত্রী হোয়ান-থসং ও ইংরেজেরা ইহার দুরাক্রম্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রথ লইয়া নিকটবর্ত্তী হওয়া অত্যন্ত কঠিন। উত্তর পশ্চিমে প্রবেশের একমাত্র পথ আছে। দুর্গটী বিষমাকার সমকোণি ত্রিভুজ। একদিকে বালুকাপূর্ণ রামগঙ্গা ও অপরদিকে গভীর খাতযুক্ত গঙ্গননদী, উভয়ই পার হওয়া সুদুষ্কর। উত্তর পূর্ব্বে খাল জল ভাঙ্গাল ও গহ্বরযুক্ত ভয়ঙ্কর পিরিয়া নালা। প্রাচীর কণ্টকাবৃত,তাহার উপর অন্যূন ৩৫টী স্তম্ভ উচ্ছ্রিত হইয়াছে। কোনটা ২০ কোনটা ২৪ ও কোনটা বা ৩২ হস্ত উচ্চ। আলি মহম্মদ খাঁ এই দুর্গ দৃঢ় দেখিয়া সংস্কার আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্যয় দেখিয়া ছাড়িয়া দেন। শুনা যায় তাঁহার এক কোটি টাকা ব্যয় হইয়াও কিছু হয় নাই। ইহার বিস্তার প্রায় ৩৷৷০ মাইল। লোকে ইহাকে পাণ্ডু দুর্গ বলিয়া থাকে। দুর্গ মধ্যে তিনটা স্তূপ। উত্তর ভিত্তিরদিকে ৪০ হাত উচ্চ এক বেদী। তদুপরি ভগ্নগৃহ মধ্যে ৭ হাত স্থূল ও ৫ হাত উচ্চ মহাদেবের ভগ্নলিঙ্গ। এই গৃহের প্রাচীর উত্তর দক্ষিণে ৬ হাত পুরু এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বারান্দা সহ ৯৷৷০ হাত ও ১২৷৷০ হাতস্থূল। মন্দিরের অভ্যন্তর দীর্ঘ ও প্রস্থে ১০ ও ৭ হাত এবং বহির্ভাগ ৩২ ও ২০ হাত। ইংরেজেরা ইহার বিকটাকার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে ৪০ হাত উচ্চ বেদীর উপর এই মন্দির ৬৬ হাত অপেক্ষাও অধিক উচ্চ ছিল। দুর্গ প্রাচীর অপেক্ষা বেদী ২০ হস্ত উন্নত। এজন্য বহুদূর হইতে শিবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। চীন যাত্রী ফাহিয়ান বলিয়াছেন অহিচ্ছত্রে অনেক প্রকাণ্ড শিবমন্দির আছে। কেহ কেহ বলে ঘোর শিবভক্ত অশ্বত্থামা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমে ২৪ হস্ত এবং কিছুদূরে ২০ হস্ত উন্নত দুই প্রকাণ্ড শিবালয়ের ভগ্নাবশেষ। দুর্গ বাহিরে পশ্চিমদিকে ২০০ হস্ত সমচতুষ্কোণ ও ২০ হস্ত উন্নত আর এক ভগ্ন স্তূপ। ইংরেজেরা খনন করিয়া চতুর্ভুজ ত্রিনেত্র পদ্মহস্ত একমূর্ত্তি ও লাল প্রস্তরের শঙ্খ ও খড়্গাধারী আর এক মূর্ত্তি বাহির করিয়াছেন। নিম্নে সমস্তই ভস্ম। বোধ হয় মুসলমানেরা দগ্ধ করিয়াছিল।

দুর্গের উত্তর পশ্চিমে কতকগুলি স্তূপ, তাহার দুই মাইল দূরে ১২৫ বিঘা বিস্তীর্ণ গন্ধান সাগর সরোবর। আর আধ পোয়া দূরে ১৫০ বিঘা বিস্তীর্ণ অহিছত্রের আদি রাজার সরোবর। ছত্র ও কাটারিখের নামক স্তূপ বোধ হয় বৌদ্ধ কীর্ত্তির অবশেষ। একটীর মধ্য হইতে কৌটার অভ্যন্তরে মুক্তা নীল কাচ অম্বরমালা ও ১০ টী চাখড়ির বর্ণের জপমালা পাওয়া গিয়াছে। কাটারিখেরের মধ্য হইতে ইংরেজেরা এক ভাঙ্গা বুদ্ধ মুর্ত্তি উৎখাত করিয়াছেন। অহিছত্রের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে দিলাবাড়ী নামক স্থানে সমচতুষ্কোণ স্তম্ভে গুপ্তরাজাদের বিবরণ লিখিত আছে। দুর্গের ২॥০ মাইল উত্তরে গুলারিয়া গ্রামে আর এক প্রকাণ্ড ভীম লিঙ্গ আছে।

অহিছত্রের দক্ষিণ বদাউন ও ফরেকাবাদের মধ্যে গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ তটে মহাভারতের কম্পিল্যনগর। দ্রুপদ দ্রোণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কাম্পিল্যনগর দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী করেন। এখন কাম্পিল্যের ভগ্নাবস্থা হিমালয় হইতে চম্বলপর্য্যন্ত পাঞ্চাল বিস্তৃত ছিল।

অহিছত্রের প্রায় ২৩ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার প্রাচীনপ্রবাহ তটে শরণ বা শূকরক্ষেত্র। ভগবান এই স্থলে বরাহ অবতার হইয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। এজন্য ইহার নাম শূকরক্ষেত্র। মহাভারতেরমতে এখানে গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য হয়। দুইশতবর্ষ হইল গঙ্গা এ স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন বেণ বা সোমদত্তের কেল্লার মধ্যে সীতারামজীর মন্দির। এবং পল্লীর উত্তর পশ্চিমে বরাহজীর মূর্ত্তি। মার্গশীর্ষের শুক্লএকাদশীতে মেলা হইয়া থাকে। সীতারামজীর মন্দির মুসলমানেরা ভগ্ন করে। ১৮ বর্ষ হইল সেই ভগ্ন গৃহের সংস্কার করিয়া একজন বণিক বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। এখন গর্ভগৃহ ১৮ হস্ত সমচতুষ্কোণ ও ১৬ টী প্রস্তর স্তম্ভে সংরক্ষিত। পূর্ব্বের ৩২ স্তম্ভ ও প্রকাণ্ড আয়তনের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। ভগ্নভিত্তি গাত্রে যাত্রীদের নাম লিখিত আছে। একটা সম্বৎ ১২২৬ বা ইংরেজি ১১৬৯ অব্দে লিখিত। ১৫১১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৮ যাত্রীর নাম আছে। ১২৪১ অবধি ১২৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঘোরীদের সময় ১৫ নাম। কিন্তু খিলিজি ও তোগলুকদের দিল্লীতে রাজ্যকালে কেবল ১৩৭৫ অব্দে ফেরোজের সময় এক নাম আছে। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। দুরন্ত আলাউদ্দীন ও উম্মাদ তোগলুকের সময় তীর্থ

ব্যাঘাত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, তাহার পর সৈয়দদের রাজ্যকালে মোট ৩ নাম। তদনন্তর বিলোলি;লদীর রাজ্যকালে ১০ নাম। তাহার পর ঘোর হিন্দুদ্বেষী সেকেন্দর লোদীর রাজ্যে ১৫১১ অব্দের পর আর নাম নাই। বোধ হয় এই দুরাত্মাই মন্দির নষ্ট করিয়াছিল। তাহা না হইলে প্রশংসনীয় আকবর, অমনোযোগী জেহাঙ্গির ও প্রজারঞ্জক সাজেহানের সময় নাম নাই কেন ?

এওনলা ষ্টেসন হইতে চণ্ডৌসি জংসন। বামের রেল দিয়া আলিগড়ে দিল্লীগামী রেল স্পর্শ করা যায়। পথে মহম্মদপুরে গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এথান হইতে নৌকাযোগেও শূকর ক্ষেত্রাদিতে যাওয়া যায়। ডাইনের রেল মুরদাবাদে শেষ হইয়াছে। মুরদাবাদ নগর পাহাড়ের উপর সংস্থাপিত, পাহাড়টী ঈশানকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত ও ২০ হস্ত উচ্চ। জেলার উত্তর পুর্ব্ব ভাগ পর্ব্বতময়। উত্তর পশ্চিমে হিমবানের তড়াইক্রোড় অস্বাস্থ্যকর ও জঙ্গলাকীর্ণ। এথানকার তণ্ডুল, গোধুম, আঙ্গুর, গিল্টির করণী আদি পিত্তলের উপর শিয়াকলমকারি কার্য্যাদি উৎকৃষ্ট।

মুরদাবাদ হইতে নৈনিতালের এক পথ আছে। ডুলীতে কালাডুঙ্গী পর্য্যন্ত ৪৯ মাইল। পরে পর্ব্বতোপরি ঘোড়া, ঝাঁপান বা ডাণ্ডীতে ১৬ মাইল যাইতে হয়। নৈনিতাল বা নৈনি সরোবর অতি গভীর ও স্বচ্ছ জলে পরিপুর্ণ। স্থান স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় বলিয়া ইংরেজেরা বাস করেন।

নৈনিতালের কিছু দূর পশ্চিমে গোভিষণ, দ্রোণ সাগর, উজেন বা বর্ত্তমান কাশীপুর। কথিত আছে যে দ্রোণ সাগর ও উজেন কেল্লা পাণ্ডবেরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্রোণ সাগর প্রতি দিকে ৪০০ হাত। লোকে তীর্থ করিতে যায় এবং চৈত্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে মেলা হইয়া থাকে। উজ্জেন কেল্লা মাঠ হইতে ১৩ হাত উচ্চ। কোন কোন স্থানে ছয় হাত উচ্চ প্রাচীর আছে। প্রাচীরের এক এক থানা ইট ২০ অঙ্গুল লম্বা ও ১৩ আঙ্গুল চৌড়া। দুর্গের মধ্যভাগ বিষম, প্রায় চারিদিকে পরিথা ও সর্ব্বত্র জঙ্গলাবৃত। দুর্গ মধ্যে উত্তরে ৩৪ হাত উন্নত, ৪৮ হাত লম্বা, ৪২ হাত প্রস্থ ও ৩ হাত পুরু ভিত্তিবিশিষ্ট ভীমগজ নামক এক প্রকাণ্ড ভগ্ন স্তূপ। ঈশান কোণে ৪০০ হাত লম্বা ও ৩৩৩ হাত প্রস্থ বেদীর উপর ২২ হাত উন্নত আর এক স্তূপ। দক্ষিণে ১৪ হাত বেদীতে ১৩ হস্ত প্রশস্ত আর এক মন্দিরের অব-

শেষ। নানা স্থানে নানা চিহ্ন। চীনযাত্রী ফাহিয়ান এই সকল প্রকাণ্ড হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। খড়্গপুরের নিকটে বৌদ্ধদের স্তূপ ছিল। এখন লোকে দুর্গের পূর্ব্বে জঙলা দেবী বা উজ্জয়িনী দেবীর মন্দিরে পূজা করে। এখানকার ভক্তেশ্বর মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরগুলি নূতন নির্ম্মিত।

নৈনিতালের ২২ মাইল ঈশান কোণে কমায়ুনের রাজধানী আলমোড়া নগর পর্ব্বতোপরি সংস্থিত। এই প্রদেশে নানাবিধ রত্নের আকর আছে। কমায়ুনের পর্ব্বত শোভা অতি মনোহর। হিমালয় হইতে নির্ঝরিণী সকল আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইতেছে। অলকানন্দা সহ ভাগীরথী সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ, মন্দাকিনী সঙ্গমে রুদ্রপ্রয়াগ, পিণ্ডার সঙ্গমে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দাকিনী সঙ্গমে নন্দপ্রয়াগ ও দেবলী সঙ্গমে বিষ্ণুপ্রয়াগ। আলমোড়া হইতে ৮০ মাইল উত্তরে বিষ্ণুগঙ্গার ডাইন তীরে সাগর হইতে দশ হাজার ফুট উচ্চ সুপ্রসিদ্ধ বদরীনাথ তীর্থ। বড় বরফ, বড় শীত। নিকটস্থ উষ্ণ প্রস্রবণের জলে অনেক আরাম বোধ হয়। মন্দিরটী ৩০ হাত উচ্চ, উপরে স্বর্ণবর্ণ কলস ও মধ্যস্থলে শ্যামপাষাণের নারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজমান। বিগ্রহটী প্রায় দুই হাত উচ্চ, মস্তকে বজ্রমণি, কিন্তু মূর্ত্তিটী ক্ষয় হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য জল হইতে তুলিয়া স্থাপন করেন। এখনও মলবারের ব্রাহ্মণেরা পূজা করে। ব্যয়ের জন্য গড়োয়ালে ১৭৫ ও কমায়ুনে ৫৬খানি দেবত্র গ্রাম আছে। বার্ষিক আয় ২ হাজার টাকা, বর্ষে ৭ অবধি ১০ হাজার যাত্রী যায়, প্রধান পুরোহিতকে রাওল কহে। শীতের সময় পুরোহিতেরা মন্দির বন্ধ করিয়া পাণ্ডুকেশর বা যশীমঠে আসিয়া থাকে। যশীমঠে নরসিংহ মন্দির আছে। বদরীনাথের নিকটে তিব্বত বা কৈলাস যাইবার নানা পথ। ঐ পথ দিয়া বদরিকাশ্রমের স্রোতস্বতী অল্পে অল্পে আসিতেছেন, পথে তিনখানি গ্রাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে হিমবানশৃঙ্গ হইতে বরফসঙ্ঘ নিপতিত হইয়া গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন করিয়া ফেলে। এই বিস্তীর্ণ ভয়ঙ্কর বরফসঙ্ঘকে পার্ব্বতীয়েরা হুইনগল বলে। বদরীনাথ হইতে ২৫ মাইল, কিন্তু পথের বক্রতা বশতঃ ১০৯ মাইল দূরে কেদারনাথ তীর্থ। রাস্তা অতি দুর্গম, শীত ও বরফ নিতান্ত দুঃসহ। কেদারনাথের মূর্ত্তি ষাঁড়ের ককুদের মত কতকটা প্রস্তর উন্নত হইয়া আছে মাত্র। তাহার উচ্চতা ২ হাত ও বেড় ৯ হাত হইবে। অমরসিংহ একটী মন্দির

করিয়া দিয়াছেন। পুরোহিত পূর্ব্বোক্ত মঠে থাকেন এবং কেদারে প্রতিনিধি পাঠান। ইহাঁরাও মলয়ারী ব্রাহ্মণ। মন্দিরের আয় বদরীনাথের, তিন ভাগের এক ভাগ। যাহাদের প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় তাহারা মহাপথে ভৈরব ঝম্প দেয় অর্থাৎ উত্তরদিকে গড়ানীয়া বরফের মাঠে দৌড়িয়া যায়। গড়ানীয়া বশতঃ আর উঠিতে পারে না, শীতে প্রাণ ত্যাগ করে। এখন গবর্ণমেণ্টের লোকে সে দিকে যাইতে দেয় না। হিমালয়ে পঞ্চকেদার আছেন। পাণ্ডারা বলে শিব বৃষরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করাতে শরীরের পঞ্চস্থান বাহির হয়। তাহাই পঞ্চকেদার। কেহ কেহ কেদার কল্পেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, রুদ্রনাথ ও তুঙ্গনাথ হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই পঞ্চ কেদারই দর্শন করে। বদরী, কেদার হইয়া সন্ন্যাসীরা মানা পথে না গিয়া দূরের অল্পতা বশতঃ হিমালয়ের দুর্গম জোয়ার পথ দিয়া মানস সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে যায়। রাস্তা বড় বিকট, কিন্তু পথে পচাশাও নগরে অতিথিসেবা আছে। কমায়ুন গড়োয়ালের পার্ব্বতীয় পল্লী সমূহে মাটি ও পাথরের দুই তিন তলা ঘর, নিম্নতলে গরু থাকে। তাহার উপর মানুষ ও শস্য থাকে। নদী পার হওয়া বড় দায়। কাষ্ঠ যোগ করিয়া শাঙ্গী, দড়িতে কাষ্ঠ বাঁধিয়া ঝুলা অথবা দড়ির শিকা করিয়া নদী পার হয়। পাহাড়ের ফাটে ফাটে মধ্যে মধ্যে একরূপ আঠা পাথর চুয়াইয়া পড়ে। ইহাকে ইংরেজেরা বিটিউমেন ও বৈদ্যেরা শিলা-যতু বলে। টার্পিন তৈলের বৃক্ষের কাষ্ঠ জ্বালিয়া পার্ব্বতীয়েরা মশালের কার্য্য করে। এখানে চামরা ও চুরী নামক প্রায় ২০ হাত লম্বা গাছের ফলের ভিতর নবনীত পাওয়া যায়। ফল প্রায় পিয়ারার মত, ভিতরে বীজ, খাইতে সুমিষ্ট মাখনের ন্যায়। বীজ পিসিলে তাহার তৈল জমিয়া মাখমের ন্যায় হয়। বীজে চিনিও প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার ফুল চর্ব্বণ করিলেও মধুর আস্বাদন পাওয়া যায়। কমায়ুনের লোক মধুর চাস করিয়া থাকে। পার্ব্বতীয় চুরীফুলের মধু বড় মিষ্ট। হিমালয়ে নানা জাতীয় ফল ফুল ও কাষ্ঠ, জটামাংশী পাওয়া যায়।

যদি কাশী হইতে অযোধ্যা পাঞ্চালাদি দেখিতে ইচ্ছা না হয় তবে মঙ্গল-সরাইয়ে ফিরিয়া যাইবে।

মঙ্গলসরাই পরে চুনার বা চরণাদ্রি। গঙ্গার দক্ষিণ তটে শতহস্ত উচ্চ এক প্রকাণ্ড পাহাড়। তদুপরি ১৫০০ হাত লম্বা ও ৬০০ হাত বিস্তৃত এক সুদৃঢ় দুর্গ। প্রাচীর কোথাও ৭ হাত কোথাও বা ১৪ হাত উচ্চ। তদুপরি মধ্যে মধ্যে চূড়া, কামান ও বড় বড় পাথর। অভ্যন্তরে হিন্দুরাজার এক প্রচীন প্রাসাদ, কূপ, স্থানে স্থানে তৃণ, বৃক্ষ, সেনাবাস, বারুদাগার, হাঁসপাতাল, জেল ও উৎকৃষ্ট অশ্বত্থবৃক্ষ নিম্নে এক মার্ব্বেল বেদী। লোকে বলে যে বিশ্বেশ্বর ৯ ঘণ্টা ঐ মার্ব্বেল বেদীতে বিরাজ করেন। ১৫২৯ অব্দে এই দুর্গ বাবরের ছিল। তৎপরে অনেকের পর ১৭৬৮ অব্দে ইংরাজেরা প্রাপ্ত হইয়া আয়ুধাগার করেন। এক্ষণে পীড়িত সেনাগণের আবাসস্থান। দুর্গের পুর্ব্বাংশে নগর। নগর বাহিরে কাশীমসলিমান ফকীরের কবরোপরি সম্রাট নির্ম্মিত প্রকাণ্ড মসজীদ। চুণার প্রস্তর প্রস্তরের কাঠিন্য, স্থায়িত্ব, উৎকৃষ্ট আভা ও উৎকৃষ্ট দানার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা কলিকাতায় মুর্ত্তিনির্ম্মাণ কার্য্যে নিয়োজিত হয়। ষ্টেসন পার হইয়া অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রস্তর গ্রথিত ৭ খণ্ড বিশিষ্ট জরগুনালার সেতু। প্রত্যেক খণ্ড ৪০০ হাত। বামে বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিকীর্ণ শৃঙ্গাবলী। পথে দশ মাইল মধ্যে ২১ সেতু। বর্ষায় বিন্ধ্যের জল উহার মধ্যদিয়া গঙ্গায় নিপতিত হয়। তাহার পর ডাইন দিকে গঙ্গাতটে মির্জ্জাপুর। নগরের প্রাসাদ মন্দির মসজিদ ও ঘাটশ্রেণীর শোভা ভাগীরথী হইতে অতি সুন্দর দেখায়। যে অংশে দেশীয় লোকেরা বাস করে তাহার মধ্য দিয়া উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ শোভিত তিনটী সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত ও সরল পথ চলিয়া গিয়াছে। ইহারই পার্শ্বে পার্শ্বে বালুকা প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরাবলি। চক ও উদ্যানের শোভাও প্রশংসাযোগ্য। মির্জাপুর কার্পেট পশমী রেশমী ও সূত্রবস্ত্রজন্য প্রসিদ্ধ। দুলিচা, কার্পেটপ্রস্তুতের যন্ত্র গুলি দেখিতে প্রীতিকর। লৌহের জিনিসও মন্দ নয়, এবং এলাচদানাগুলি অতি সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য। রেল হইবার পুর্ব্বে মির্জাপুর মধ্যভারতের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। ষ্টেসন হইতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির ৩ ক্রোশ দূরে। একা ভাড়া।০। রেলওয়ের পথ হইতে এই মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্ব্বে ঠক, ডাকাইত ও গাঁটকাটারা ব্যাঘ্রপূর্ণ এই পর্ব্বতপ্রান্তে বাস করিত, এখন নিবৃত্ত হইয়াছে। নবরাত্রি দিনে এখানে

মেলা হয়। এবং গঙ্গা বিন্ধ্যে সঙ্গম হওয়ায় দশগুণ কুরুক্ষেত্র ফল জন্য বহুলোক স্নান করিতে আইসে। মির্জ্জাপুর হইতে ৬ মাইল দূরে তোরা নামক সেনানিবেশ স্থানের নিকট ৪০ হস্ত উচ্চ একটী জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়, পাহাড় হইতে ঐ প্রপাত দেখিতে অতি সুন্দর। মির্জ্জাপুর হইতে ১ দিন গমন করিলে পূর্ব্ববর্ণিত শোনপ্রস্রবণের সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়। ইহারই নিকট সিন্ধ্যবাসী কয়লা ক্ষেত্র। মির্জ্জাপুর ত্যাগ করিয়া কিছু দূর পরে সিরসা রোড়। তৎপরে তমসার সেতু। তদনন্তর নইনি।

নইনি হইতে শাখা রেল জব্বলপুর হইয়া বম্বে গিয়াছে। নইনির পর যমুনার আশ্চর্য্য সেতু। নিম্ন দিয়া নৌকা, তদুপরি লোক ও তাহার উপর দিয়া রেলগাড়ি চলিতেছে। ২১৪৯ হস্ত লম্বা সেতু, পঞ্চদশ ফুকরে অর্দ্ধমাইল বিস্তীর্ণ কালিন্দীর উভয় কূল স্পর্শ করিয়াছে। প্রত্যেক ভাগ ১৩৬ হাত। তাহারই মধ্যে যমুনার নীল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এক একটা স্তম্ভ জল হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ৫০ ফীট প্রোথিত আছে। বর্ষাকালে তদুপরি আর ৪৫ ফীট জল বৃদ্ধি হয়। স্তম্ভ সমূহের নিম্নভাগ প্রস্তর ও উপরিভাগ লৌহ নির্ম্মিত। স্রোতসঙ্কুলা যমুনার বালুকায় এই স্তম্ভ প্রোথিত করিতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। সেতুর দ্বিতীয় তল দিয়া গাড়ী ঘোড়া ও লোক চলিতেছে। দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে হইলে বাঁধ দিয়া ও উত্তর মুখে প্রবেশ করিতে হইলে ৩০ টী খিলানের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই উচ্চ স্থান হইতে বালকেরা যমুনায় ঝাঁপ দিতেছে।

সেতুর ডাইনদিকে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের পতাকা কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। সেতু পার হইয়া বামদিকে পথের নিম্নে বিটপী আচ্ছাদিত প্রয়াগের খাপরল-ঘর ও শ্বেতবর্ণের গৃহ সকল দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড ষ্টেসন। ষ্টেসনের বাহিরেই দ্রব্যাদি পূর্ণ ইষ্টক নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বিশ্রামশালা। সম্মুখে কূপ, পুষ্পবাটিকা ও ডাইন দিকে কোণাংশে মলগৃহ। ষ্টেসন নিকটে দুই এক পয়সা দিলেই প্রয়াগীরা প্রয়োজনীয় বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই সামান্য পয়সায় যথেষ্ট কার্য্য হয়। বামদিকে অল্পদূরে বাঙ্গালীদের বাসস্থান বাদসাহী মুণ্ডী প্রয়াগ নগর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী। দেখিবার মধ্যে প্রথমে দ্রব্যাদিপূর্ণ চক। তাহার কিছুদূর পরে

সরাই। এই স্থানে ৫০০ ফীট বিস্তৃত সুশোভিত ও প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত এক সুদৃশ্য সমচতুষ্কোণ মণ্ডল। মধ্যে মধ্যে নিঃস্ব পথিকদিগের থাকিবার জন্য গৃহ। একদিকে মুসলমানদিগের সারাসন প্রথায় নির্ম্মিত ৪০ হাত উচ্চ ও ৩৩ হাত প্রশস্ত এক প্রকাণ্ড দ্বার আছে। উহার মধ্য দিয়া হতভাগ্য জেহাঙ্গির পুত্র খশরুর উদ্যানে প্রবেশ করা যায়। উদ্যান মধ্যে তিনটী উৎকৃষ্ট গম্বুজবিশিষ্ট খসরু পরভিজ ও জেহাঙ্গিরের মাড়োয়ারি বেগমের কবর মন্দির। এলাহাবাদ নগর বিস্তীর্ণ কিন্তু সুরম্য গৃহাদি অতি অল্প। জমা-মসজীদ পূর্ব্বে অধিবেশন গৃহ ছিল। বিদ্রোহের পর হইতে ক্যানিং টাউনে ইয়ুরোপীয়গণ রাজধানী করিয়াছেন। ইহার নিকুঞ্জশোভা অতি মনোহর। গোরাবারিক, আদালত ও হাইকোর্ট দর্শনযোগ্য বটে। এই প্রকারে এলাহাবাদ সহর দর্শন করিয়া অনেকে কেল্লা ও গঙ্গা যমুনা সঙ্গম দেখিতে যান। চক হইতে ঠিক সোজা এক রাস্তা বেণীঘাট চলিয়া গিয়াছে। প্রায় তিন ক্রোশ গঙ্গা যমুনা জলে প্লাবিত হয় বলিয়া জলের গতিরোধার্থ মাটী ফেলিয়া এলাহাবাদপার্শ্ব উচ্চ করা হইয়াছে। উহাকেই বাঁধ বলে। ষ্টেসন হইতে বাঁধ পর্য্যন্ত একা ভাড়া প্রায় ।/০। বাঁধের ডাইনদিকে যমুনা তটে কেল্লা। বর্ষাকালে কেল্লার নিকট উভয় নদীর জল আইসে। কেল্লার চতুর্দ্দিক লোহিত প্রস্তরে গ্রথিত। বেড় প্রায় পাঁচ সহস্র হস্ত। ১৫৭২ অব্দে আকবর প্রাচীন হিন্দুদুর্গের উপর এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রয়াগের নাম এলাহাবাদ রাখেন। ইহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে আরও অধিক ছিল। ইংরাজেরা ভগ্ন করিয়া বর্ত্তমান কালের যুদ্ধোপযোগী করিয়া লইয়াছেন। কেল্লা মধ্যে আকবরের গৃহ, অশোকস্তম্ভ ও অক্ষয় বটাদি দেখিবার যোগ্য। আকবরের উৎকৃষ্ট হল ১৮০ হাত লম্বা। এক্ষণে অস্ত্রাগার হইয়াছে। অশোক রাজার প্রস্তর স্তম্ভ প্রায় ২৮ হাত উচ্চ। ইহাতে পালিভাষায় অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের বিবরণ লিখিত আছে। ইহারই নিকট কেল্লায় মৃত্তিকা নিম্নে অক্ষয় বট। অভ্যন্তরে গিয়া অন্ধকার। দুই পার্শ্বে দেব দেবী মূর্ত্তিবিশিষ্ট দুই প্রস্তর প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। অল্প দূর পরেই অন্ধকারে এক শিব। এবং বটের শুষ্ক স্কন্ধ। গুঁড়ির নিম্নে একটা পিত্তলের দেবীমুখ। ইহারই পূজার নাম অক্ষয়বট-পূজা, দক্ষিণা দুই পয়সা। কেল্লা হইতে বাহির হইয়া বাঁধের নিম্নে সম্মুখে

বালির চর। চরের মাথায় সিতাসিত সঙ্গমের মনোহর শোভা। কি গম্ভীর ভাব। দক্ষিণ ও ঈষৎ পশ্চিমমুখী গঙ্গার প্রবল বেগে পূর্ব্বাভিমুখী যমুনার বেগ স্তব্ধ প্রায়। ঘাটে কেশপূর্ণ,বালির উপর নিশান পোতা,প্রয়াগী পাণ্ডাদের কুটীর ও পূজোপকরণ দ্রব্য পূর্ণ দোকান। প্রয়াগী পাণ্ডারা কাশী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, এজন্য অগ্রে চুক্তি করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মস্তক মুণ্ডন মূল্য ৵০। স্নানকালে জলমধ্যেই পুষ্পদুগ্ধাদি বিক্রেতা ও ভিক্ষুক উপস্থিত। অনেকে নৌকা করিয়া গিয়া সঙ্গমে স্নান করে। কিন্তু সমস্তই বালির চর, তথায় বুঝিয়া পদব্রজেও যাওয়া চলে। তীর্থযাত্রীদের অনেকে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিতেছে। তীর্থশ্রাদ্ধ বড় সহজ ব্যাপার নহে। পাণ্ডাদের হস্তে নিস্তার পাওয়া ভার। কুশের পরিবর্ত্তে কেশে ও সংস্কৃত মন্ত্রের পরিবর্ত্তে নানা প্রণানা আদি অপশব্দ প্রয়োগ করে। শাস্ত্রজ্ঞান বিবর্জ্জিত শৌচাচার বিহীন পাণ্ডারা পান চর্ব্বণ করিতে করিতে পাগড়ী বাঁধিয়া ইতস্তত মন্ত্রোবলায়। দেবপক্ষ পিতৃপক্ষের সম্পর্ক নাই, কেবল লুণ্ঠন পক্ষই প্রবল। এক স্থানে এক দুরন্ত পাণ্ডা এক গরিবের হস্তে পৈতা জড়াইয়া কসিয়া বাঁধিতেছে এবং ঘোর মুর্ত্তিতে বলিতেছে "আরে বোল ক্যা দেগা।,, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? বলে উহার পিতৃ পুরুষ উদ্ধার হইতেছে। ঐ গরীব শ্রাদ্ধকারীকে বলা হইল, মৃত যমের হস্ত হইতে তোমার মৃত পিতৃ পুরুষ উদ্ধার হইয়াছে, এখন জীবিত যমের হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে বুঝি বা পুলীস ডাকিতে হয়। পাণ্ডারা পুলীসের নাম শুনিয়া বন্ধন মুক্ত করিল। আর এক যাত্রী শত শত পিপীলিকা সহ ছাতু পাকাইতেছে এবং তাহার পাণ্ডা বড় খুসীতে সম্মুখে বসিয়া আছে। আর এক স্থানে গরু উৎসর্গ করিয়া দামের জন্য মারামারি। ছাঃ ধর্ম্ম! এককালে যেখানে তুমি মুর্ত্তিমান ছিলে— আজ সেখানে নিশাচর দৌরাত্ম্যে স্নান করা ভার। সমস্ত তীর্থেই শ্রাদ্ধের এই রূপ দশা। অথচ পাণ্ডাদের দৈনিক পরিশ্রমের বেতন ॥ আট আনার অধিক নহে।

সঙ্গমের বিপরীত দিকে ঝুঁসীর উল্টান কেল্লা। পূর্ব্বকালে ঝুঁসী স্থানে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানপুর ছিল। কেল্লার পার্শ্বে যমুনাতটে সরস্বতীকূপ ও প্রান্তে যমুনার ঋণমোচন ও কম্বলাশ্বতরঘাট। তদনন্তর রেল্‌পুল, তাহার পর রাম-

ঘাট ও দূরে শীখাকুণ্ডঘাট। বামদিকে গঙ্গাতীরে যে দূরে বাঁধা ঘাট দেখা যায় তাহার নিকট রাজা বাসুকীর ঘাট বা ভোগবতী। প্রতিষ্ঠান প্রয়াগ কম্বলাশ্বতর ও ভোগবতী, ইহার মধ্যস্থান প্রজাপতির বেদী। এই স্থানে দেবতা, যতি ও নরপতিগণ ভূরি যাগ করেন বলিয়া স্থানের নাম প্রয়াগ, ইহাই পরম তীর্থ। প্রতিষ্ঠানে সমুদ্রকূপ ও তদুত্তরে হংসপ্রপতন। বৈশাখ পর্য্যন্ত গঙ্গায় নৌকাসেতু দিয়া যাওয়া চলে। যমুনা দক্ষিণে দরওয়াজি নগরে অগ্নিতীর্থ, কেল্লা মধ্যে অক্ষয়বটে রুদ্রস্থান। দারাগঞ্জে বেণীমাধব ও কিয়দ্দূরে ভরদ্বাজ আশ্রম। আশ্রমে শিব ও মাটীর নিম্নে অন্ধকার গৃহে কয়েকটী প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। বাহুল্যভয়ে অন্তর্ব্বেদী ও মধ্যবেদীর ভূরি তীর্থ ও পঞ্চক্রোশী যাত্রা লিখিত হইল না। প্রয়াগমণ্ডল পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ। প্রয়াগের লোমজবস্ত্র, তরমুজ, কালাকন্দ ও পিয়ারা উৎকৃষ্ট।

প্রয়াগ বহুকালের প্রাচীন তীর্থ। নহুষের সময়াবধি রাজধানী হয়। তিনযুগে বহু ঋষির আশ্রম ছিল। কলিতে কিয়ৎকাল পতিত থাকে। ১২০০ বর্ষ পূর্ব্বে হেয়ানথসং বলেন দুই মাইল প্রশস্ত প্রকাণ্ড বালুকা ক্ষেত্রের পশ্চিমে প্রয়াগ নগর মধ্যে এক শিবমন্দির ও সম্মুখে হাড়বেষ্টিত প্রকাণ্ড অক্ষয়বট। গজনীর সমকালবর্ত্তী আবুরিহানের কথানুসারে রসিদ উদ্দিন বলেন সঙ্গমে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। আকবরের দুর্গ নির্ম্মাণকালে আবদুলকাদের বলেন যমুনাতীরে বটবৃক্ষ। শিবমন্দির ভগ্ন ও ক্রমে মৃত্তিকা প্রভাবে নগর উচ্চ হওয়াতে অক্ষয়বট ও শিব মৃত্তিকানিম্নে পড়িয়াছে। ২৪০ পূঃ খৃঃ অব্দে অশোক স্বকীয় আজ্ঞা সম্বলিত প্রস্তর স্তম্ভ উত্থাপিত করেন। তাহার পর লম্বভাবে লেখা দেখিয়া বোধ হয় পতিত ছিল। তাহার পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় জয় ঘোষণা খোদিত করেন। তাহার পর পতিত হইলে সন্ন্যাসীরা নাম লেখে। তাহার পর জেহাঙ্গির ১৬০৫ অব্দে তুলিয়া দেন। তাহার পর ১৮৩৮ অব্দে গারিষ্টন সাহেব মস্তকের ভগ্ন সিংহ পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়া দেন।

প্রয়াগের ১৫ ক্রোশ দূরে যমুনাতটে প্রসিদ্ধ কৌশাম্বী নগরের ভগ্নাবশেষ। ২ ক্রোশ বিস্তীর্ণ এক ভগ্ন দুর্গ, তন্মধ্যে অশোকের অর্দ্ধ প্রোথিত এক প্রস্তরস্তম্ভ ও চতুর্ম্মুখ ত্রিনেত্র এক শিবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। পুরুরবার ১০ম,

পুরুষ কুশাম্ব এই নগর স্থাপনা করেন। অর্জ্জুনের অষ্টম পুরুষে হস্তিনা বিনষ্ট হইলে পাণ্ডুবংশীয়েরা শেষ পর্য্যন্ত এই নগরে রাজ্য করে। পরে ইহা বৎস রাজ্যের রাজধানী হয়। উদয়নাথের সময় ইহার অত্যন্ত গৌরব ছিল। ইনিই এখানে বুদ্ধের চন্দনময় অবিকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করেন। কৌশাম্বী ভারতের ১৯ রাজধানীর মধ্যে এক রাজধানী ছিল। শতবর্ষ হইল কৌশাম্বী ত্যক্ত হইয়াছে, এখনও জৈনেরা তীর্থ করে। কৌশাম্বীর ৭ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে ও শিরাজপুরের ২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গুপ্তদের রাজধানী ঘরোয়ার ভগ্নাবশেষ। এলাহাবাদ হইতে দূরে গঙ্গাতীরে রামায়ণের শৃঙ্গবের পুর।

প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া মন্থর মধ্যদেশ দিয়া রেল চলিতেছে। সমস্তই সমতল ভূমি স্থানে স্থানে জোয়ারির ক্ষেত্র। দৃষ্টির উত্তেজক কিছুই নাই। তদনন্তর প্রধান সহর কানপুর গঙ্গার বালুকাময় তীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষ। কানপুরের দশবর্গ মাইল ইংরেজ সেনানিবেশে আচ্ছন্ন। সাতসহস্র সৈন্য স্বচ্ছন্দে থাকিবার বিলক্ষণ স্থান আছে। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে কানপুরে ভয়ঙ্কর উপদ্রব হইয়াছিল। নানার ভীষণ অত্যাচার স্মরণার্থ ইংরেজেরা একটী উদ্যান করিয়াছেন। তন্মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের গৃহ এবং যে কূপে নিহত বিবি ও বালকগণকে সিপাহীরা বিক্ষেপ করিয়াছিল তাহার উপর একটী স্বর্গীয় পরির প্রতিমূর্ত্তি যেন ক্রন্দন করিতেছে। নিকটে নানাবিধাকারে খোদিত প্রস্তরাবরণ ও নিহত লোকের সমাধি। স্থানে স্থানে দৃষ্টিপ্রীতিকর বৃক্ষ। উদ্যানের ১ মাইল দূরে ও গঙ্গার অর্দ্ধ মাইল অন্তরে হুইলর সাহেবের গড়খাই। যেখানে তিনি ২১ বার আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন জলপ্লানের কূপ ব্যতীত আর কোন চিহ্ন নাই। নিহত ব্যক্তিদিগের কবরোপরি এক একটা ক্রুশ আছে। অনন্তর শ্বেত চৌড়া ঘাটের গির্জ্জা। নানার অভয় পাইয়া ইউরোপীয়েরা চলিয়া যাইবার সময় নৌকায় এইস্থানে নিহত হয়। কানপুরের নিকটেই গঙ্গার খাল শেষ হইয়াছে। দুইকোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত এই খাল দ্বারা এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইতেছে। কানপুরের সালুকাপড়, কালাকন্দ মন্দ নহে।

কানপুর পার হইয়া পাকুণ্ডের পথে মধ্যে মধ্যে বন্যহরিণ চরিতে দেখা

যায়। তদনন্তর ইটোয়া। যমুনাতটে অবস্থিত। গবর্ণমেণ্টের সামান্যমত সৈন্য থাকে। ইটোয়ায় গ্রীষ্মের অতি দুরন্ত প্রভাব। গ্রীষ্মকালের লু অর্থাৎ গরম বায়ু এলাহাবাদ পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। গাত্র আবৃত না থাকিলে শরীর দগ্ধ হইয়া যায়। আম-পোড়া লুর মহৌষধ। যে দেশ দিয়া যমুনা বহিয়াছে, যমুনার পার্শ্বস্থ স্থানের কূপের জল প্রায়ই লবণাক্ত হয়। যমুনার তীরে ভ্রমণ করিতে স্থানে স্থানে প্রায়ই খাত পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইটোয়ায় ঠগ বাস করিত। এখানে ময়ূরের পাখা অত্যন্ত সুলভ। ইটোয়ার পর দারাসিকো স্থাপিত সিকোয়াবাদ। তদনন্তর টুণ্ডলা। টুণ্ডলা হইতে এক শাখা রেল আগরা গিয়াছে।

আগরা। পূর্ব্ব নাম অগ্রবন। কেহ বলেন এই স্থানে পরশুরামের জন্ম হয়। সেকেন্দর লোদীর কালে বাদলাগড় বলিত। আকবর নগর স্থাপন করিয়া আকবরাবাদ আখ্যা দেন। এই নগর যমুনার ডাইন তটে অবস্থিত। প্রবেশমুখে দুইপার্শ্বে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মৃত্তিকা স্তূপ। তৃণ নাই, রস নাই ও মধ্যে মধ্যে এক একটী খাত। কিন্তু অনতিদূরেই তাজের মনোহর রূপ। পশ্চিম হইতে ক্রমাগত বালি উড়িয়া আসিতেছে। রাজপুতানার মরুর এই বালুকাতে আগরার পশ্চিমভাগ আচ্ছন্নপ্রায়। পথগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। এতকাল হইয়া গিয়াছে কিন্তু কর্দ্দমের সম্পর্ক নাই। ব্রিটিশদিগের নির্ম্মিত পথ গ্রীষ্মে ধূলি ও বর্ষায় কর্দ্দমে আচ্ছন্ন হয়। চক ও অপরাপর স্থানে অত্যন্ত ঘন বসতি কিন্তু এক এক স্থলে কিছুই নাই। কেল্লা, তাজ, এতমদ্দৌলা, সেনানিবেশস্থান, সেকেন্দ্রা ও ২৪ মাইল অন্তরে ফতেপুর সিকরীর প্রাসাদ দেখিবার যোগ্য। কেল্লা কালিন্দীতটে অবস্থিত, চতুর্দ্দিকে লাল প্রস্তরের প্রাচীর দেড় মাইল বেষ্টন করিয়াছে, প্রাচীরের উচ্চতাও অল্প নয়, প্রায় ৪০ হস্ত। উপরে তীর নিক্ষেপের কাটা কাটা ফাঁক। পূর্ব্বে বাহিরে এক ভিত্তিও ছিল। এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিখা ২০ হস্ত বিস্তৃত ও তলা সমস্তই পাথরে গাঁথা। আমরা উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশের মানস করিলাম। সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড দরজা, তাহার দুই ধারে দুইটা বিশাল স্তম্ভ। যত ভিতরে যাওয়া যায় দোধারি সারি সারি ঘর তদুপরি শৃঙ্খলা মত কোলঙ্গী ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার ছিদ্র। সমস্তই খোদিত ও চিত্রিত।

দ্বার হইতে এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমাগত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরেই দেখি এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, প্রায় ৩৩৩ হাত লম্বা ও ২৪৬ হস্ত প্রশস্ত। তাহার চারিধারে বৃক্ষলতাকীর্ণ পথ, ইহারই একদিকে আকবরের বিখ্যাত দেওয়ান আম বা সদর কাছারি। গৃহটী প্রায় ১২০ হাত লম্বা ও ৪০ হাত প্রশস্ত। এখন গবর্ণমেণ্ট অস্ত্রাগার করিয়াছেন। প্রায় বিশসহস্র অস্ত্র ভিত্তি ও স্তম্ভগাত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই গৃহমধ্যে তিন থাক স্তম্ভ ছিল, এবং প্রত্যেক স্তম্ভদ্বয় যাবনিক খিলানে সংলিপ্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সে গুলি রুদ্ধ করিয়াছেন, গৃহের মধ্যভাগে শ্বেতমার্ব্বেল বিনির্ম্মিত আকবরের বিচিত্র সিংহাসন স্থান। ইহার নিম্নে একটী প্রস্তর ফলক। আকবর ইহার উপর উপবেশন করিতেন, দেওয়ান আমের গম্ভীর ভাব ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মন আকুলিত হইল। যেখানে গমন করিবার জন্য ইংরাজেরা শত শত লোকের উপাসনা করিতেন, এখন সেই খানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রিটিশ সৈন্যগণ ধূমপান করিতেছে। যে স্থানে তানসেনের সুমধুর স্বর উত্থিত হইত, আজ সেই দেওয়ান আমে চামচিকা চীৎকার করিতেছে। শত শত বিশসের স্বর্ণ সামাদানে তিন তিন গজ লম্বা কপূ'র বাতিতে যে গৃহ আলোকিত হইত, আজ সেই দেওয়ান আম অন্ধকার। যে জনপূরিত স্থানে প্রবেশ করিতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণও ভয় করিতেন, আজ সেই স্থানে একাকী করদেশে কপোল বিন্যাস করিয়া আমরা অতীত ইতিহাস স্মরণ করিতেছি। হা কাল! তুমিই ধন্য। গৃহের পার্শ্বে এলেনবরা আনীত সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠময় দরজা। প্রায় ৮ হাত উচ্চ। দ্বারের সমস্ত ভাগই উত্তমরূপ খোদিত এবং তদুপরি তিনটী ঢালের ফুল আছে। শুনা যায় এই তিনটী মহম্মদের ঢালের ফুল ছিল। দরজা যে সোমনাথের তাহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই নাই। দেওয়ানখাস বা আকবরের মফঃস্বল কাছারীর সম্মুখে অনাবৃত স্থানে ৪ হাত সমচতুষ্কোণ এক খান কাল মার্ব্বেল তক্তা পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে ফাটা ও গায়ে একস্থানে একটু লালদাগ। মুসলমানেরা বলে যে আকবরের এই তক্তায় ভরতপুরের রাজা বসাতে তক্তা ফাটিয়া যায় ও রক্ত পড়ে। এবং লর্ড এলেনবরা বসিলেও আবার রক্ত

পড়ে। ইহার সম্মুখে ক্ষুদ্র সাদা মার্ব্বেলের আর এক খান সিংহাসন। ঐ সিংহাসনে ভাঁড় বসিয়া বাদসাহ সাজিয়া আকবরের সহিত তামাসা করিত।

দেওয়ান আমের পর সম্রাটের আবাসগৃহ। আবাসগৃহের নিম্ন দিয়া কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছে। গৃহের ভিত্তি ও মধ্যভাগ সমস্তই সাদা মার্ব্বেলে ঝক ঝক করিতেছে। তদুপরি নানা রঙ্গের নানা লতা ও নানা ফুল নানারূপে চিত্রিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন কে রং দিয়া চিত্র করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সে গুলি সমস্তই জাজ্বল্যমান ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর ঐরূপ বিনিবেশিত হইয়াছে। গৃহগুলি আয়তনে হ্রস্ব, কপাট আলের ও কোল-ঙ্গার মধ্যে পূর্ব্বকালীন কোলঙ্গার ন্যায় অর্থ রাখিবার গহ্বর আছে। গৃহের বাহিরে যমুনারদিকে বারান্দা অতি মনোহর। গজদন্ত বিনিন্দিত শ্বেত মার্ব্বেলে সৌর কিরণ পতিত হইয়া তাহার উপরিভাগস্থ রত্নময় ফল পুষ্প হইতে কত রঙ্গের কতরূপ আভা নির্গত করে। উপরিভাগের মার্ব্বেল আচ্ছাদন কি চমৎকারই বিরচিত। তদুপরি স্বর্ণ বর্ণ কলস সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে সজ্জিত হইয়াছে। স্তম্ভ সকলের শোভাই বা কি? এবং স্তম্ভ যোজিকা সকল এরূপ সুগঠিত যে নিম্ন হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন উৎকৃষ্ট ঝালর সংযোজিত আছে। কামিনীগণের গৃহসমস্তই যমুনার হিল্লোলে সুখপ্রদ। ৪৬ হস্ত নিম্নে কালিন্দীর নীল প্রবাহ। দূরে নিকুঞ্জবন ও তাজের মনোহর মূর্ত্তি। গৃহে একবার উপস্থিত হইলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। অনন্তর আমরা সীসমহল বা দর্পণ গৃহে প্রবেশ করিলাম, সম্রাট এখানে স্নান করিতেন, ভিত্তির কিয়দংশ লইয়া গৃহের উর্দ্ধভাগ সমস্তই সমবিষম। ঐ সমবিষম ভাগে আয়নার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচখণ্ড সংলিপ্ত আছে। একজন প্রবেশ করিলে ঐ অসংখ্য দর্পণে প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়া অসংখ্য মূর্ত্তি দেখা যায়। কেলিকালে এক সম্রাট ও এক কামিনী শত শত সম্রাট ও শত শত কামিনী হইয়া নায়কের দর্শন পথে এক কালে পতিত হইত। ভিত্তি গাত্রে শত শত কৃত্রিম নির্ঝরিণি। জলের পথ এরূপ নির্ম্মিত যে জল আসিবার কালে বোধ হইত যেন ক্রীড়মান মৎস্য আসিতেছে। এই রূপ কৌশলে জল আসিয়া মধ্যস্থলের চৌবাচ্চায় পতিত হইত। চৌবাচ্চার

মধ্যেও এরূপ কৌশল আছে যে, উহার অভ্যন্তর ভাগ দীপ দ্বারা আলোকিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন স্থলতানের কেলিগৃহ ও সম্মুখের পুষ্পশোভিত প্রাঙ্গন সমস্তই কৃত্রিম উৎসে পরিশোভিত। এই স্থানে মার্ব্বেল ও বহুমূল্য প্রস্তরাদির শোভা আছে সত্য কিন্তু উৎসই ইহার পরম শোভা। প্রাঙ্গনের পূর্ব্বতন পুষ্প সকল এখন জঙ্গলাবস্থায় পতিত। ইহার পর আমরা ক্রীড়াগৃহে প্রবেশ করিলাম, কৃষ্ণ ও শ্বেতমার্ব্বেলফলক দ্বারা সতরঞ্চের ঘর হইয়াছে। বেগম সহ বাদসাহ কেহ রাজা, কেহ অশ্ব, কেহ গজ, সাজিয়া সতরঞ্চের গতিক্রমে পরস্পরকে ধরিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি খেলা করিত। ক্রীড়াগৃহ ত্যাগ করিয়া আমরা উপাসনা মন্দিরের দিকে গমন করিলাম। যে প্রাঙ্গনের উপর উপাসনা মন্দির আছে সেটী অতি উচ্চ, এত উচ্চ যে নিম্ন হইতে মসজিদের তিনটী সাদা গম্বুজ মাত্র দেখা যায়। অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিলে একটী দস্তাস দরজা। খুলিবামাত্র বিস্তীর্ণ বেলে-পাথরের প্রাঙ্গন, মধ্যে চৌবাচ্চা ও সম্মুখে মতিমসজিদ আছে। আহা, নামেও মতি দেখিতেও তদ্রূপ। ঊর্দ্ধে নীলবর্ণ আগরার আকাশ দেখিতে বড় সুন্দর। মতিমসজিদ অতি উৎকৃষ্টজাতীয় মার্ব্বেলে নির্ম্মিত। অতি শুভ্র, অতি রমণীয়, অতি পরিপাটী ও সম্পূর্ণ রূপ খোদকারী। দুর্গার দালানের ন্যায় ঠিক তিনকুঠুরে ও তিনভাগে বিভক্ত। স্তম্ভদ্বয় মধ্যস্থ খিলান গুলি সমস্ত সারাসন জাতীয়, ভিত্তিগাত্রে লেখা আছে, সাজেহান ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করেন। মতি মসজিদের পার্শ্বে এক অদ্ভুতকাণ্ড। ভিতের ভিতর দিয়া এক আশ্চর্য্য রকমের সিঁড়ি নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। এবং ইহার সহিত অপরাপর স্থানের যোগ আছে। সম্রাট শয়নবেশধারিণী কামিনীগণকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি ও লুকাচুরি খেলা খেলিতেন। তাহাদিগের পদালঙ্কারের ঝন্‌ঝনার রব ও সুমধুর হাস্য চারিদিক শব্দায়মান করিত। শুনা যায় যে, তাজমহল ও সেনানিবেশের মাঠ পর্য্যন্ত এই সিঁড়ির যোগ আছে। ভ্রষ্টা কামিনীগণকে নিক্ষেপ করিবার জন্য এখানে একটা কূপ ছিল। দুই জন গোরা পড়িয়া যাওয়াতে ইংরাজেরা মুখ বন্ধ করিয়াছেন। এইরূপ এখনও আকবরের অন্তঃপুর, স্নানাগার, ক্রীড়া স্থান ও কেলিকুঞ্জাদি সমস্তই বিদ্যমান আছে। অন্তঃপুরের মার্ব্বেলের জাফরী কাটা পর্দ্দা দিয়া কেবল একটী গোলা যাওয়াতে ঐ ত প্রমাণ স্থান ভগ্ন হই-

য়াছে, এবং দুই এক স্থানে কেহ বা এক আধ খান প্রস্তর তুলিয়াছে। ফোয়ারা সকল শুদ্ধ কিছু নষ্ট হয় নাই, সমস্তই বিদ্যমান, কেবল বাদসাহ নাই। কোথায় সে আকবর কোথায় বা তাঁর কামিনীগণ,কোথায় সে বীরবল, কোথায় সে মানসিংহ, কোথায় বা সে জয়সিংহ, কোথায় সে অতুল ঐশ্বর্য্য, কোথায় সে প্রবল প্রতাপ। ২০০।২৮০ বর্ষ পূর্ব্বে এখানে আইসে কাহার সাধ্য। যে অন্তঃপুরে মক্ষিকাও প্রবেশ করিতে পারিত না এখন আমরা পাদুকাসহ সেখানে ভ্রমণ করিতেছি। যেখানে কামিনীগণের কঙ্কণ.ঝনৎ-কার কর্ণগোচর হইত, হায় রে কাল! এখন ঐ দেখ সেখানে বসিয়া কে কাষ্ঠ কাটিতেছে। রজপুত কামিনীর শাঁখা চূর্ণের বিবরণ ও অপরাপর রাজবাটী বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। বেলা অপরাহ্ণ প্রায়। আমরাও কোর্ট হইতে বাহির হইলাম। কোর্ট প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রিগেড মেজরের পাস লইয়া প্রবেশ করিতে হয়।

অনন্তর তাজ পরিদর্শন। পথের বামদিকে এক প্রশস্ত রওরাক। তদুপরি লালপাথরের নানারূপে খোদিত প্রকাণ্ড গেট। এত উচ্চ যে ঊর্দ্ধমুখে দেখিতে গেলে সত্য সত্যই মাথার আবরণ খুলিয়া পড়ে। এই প্রকাণ্ড গেটের উপর সারি সারি ২৬ কলস, অন্তরাল ও বহির্দ্দেশ সমন্বিত গেট পার হইবা মাত্র এক প্রকাণ্ড উদ্যান। সম্মুখে একতলাসম লালপ্রস্তরের প্রকাণ্ড বেদী। তদুপরি মার্ব্বেলমণ্ডিত অপেক্ষাকৃত অল্প প্রশস্ত একতলাসম আর এক বিস্তীর্ণ বেদী। তাহার চারিকোণে চারিটী গগনভেদী মার্ব্বেল স্তম্ভ এবং মধ্যস্থলে মন্দির সদৃশ শ্বেতকায় প্রকাণ্ড তাজ। তাজের উদ্যানটী পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৪০ হস্ত লম্বা ও উত্তর দক্ষিণে ৬৬৬ হাত প্রশস্ত, চারিদিকে লাল-পাথরের প্রাচীর, কোণে কোণে চূড়া, দক্ষিণে ও বামেও আর দুই দরজা এবং পশ্চাতে কালিন্দীর নীল প্রবাহ। প্রবেশ গেট হইতে তাজপর্য্যন্ত সম্মুখে প্রস্রবণরাজি ক্রীড়া করিতেছে। প্রস্রবণসমূহের দুই পার্শ্বে প্রস্তরের পথ। গমনকালে পথের পার্শ্বে সমশীর্ষ,সমবর্ণ ও সমকায় বিলাতী ঝাউশ্রেণী, উদ্যানস্থ বৃক্ষের সুগন্ধ, ফোয়ারার বারিবিন্দু ও চারিদিকে নিকুঞ্জশোভার প্রভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। উদ্যানের অর্দ্ধেক পথে মার্ব্বেলের উচ্চ বেদী মধ্যে আর একটী উৎকৃষ্ট কৃত্রিম উৎস। বালকেরা উৎসের উপর

প্রমত্ত কক্ষও ফুলের ক্রীড়া দেখিয়া করতালি দিতেছে। অনন্তর তাজের লালপ্রস্তর ও মাঝে মাঝে মার্ব্বেল মণ্ডিত প্রথম বেদী। দীর্ঘে ৬৪৩ ও প্রস্থে ৩২০ হাত। ইহার দক্ষিণে ও বামে দুইদিকে দুইটী মসজিদ ও যমুনারদিকে দুইধারে দুইটী মার্ব্বেলশীর্ষ রথের মত গৃহ। প্রথম বেদীর উপর মার্ব্বেল মণ্ডিত ২০৯ হস্ত সমচতুষ্কোণ দ্বিতীয় বেদী। ইহারই চারিকোণে শত হস্ত প্র মাণ চারিটী চমৎকার মার্ব্বেল স্তম্ভ বা মিনার, তাহার উপরিভাগে বসিবার জন্ত অষ্ট স্তম্ভে সংরক্ষিত এক এক গম্বুজ। উঠিলে বহুদূর দৃষ্টিগোচর হয়। এই শুভ্র বেদীর মধ্যস্থলে তাজমন্দির। তাজের মন্দির অষ্টকোণ বিশিষ্ট, চারিদিকের চারিভিত প্রত্যেকে ৮৬ হাত ১৬ অঙ্গুল লম্বা। প্রত্যেক ভিত্তির উপরে দুইপার্শ্বে দুইটী ও মধ্যস্থলে দুইটী স্তম্ভ শীর্ষের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যস্থলে স্তম্ভদ্বয়ের ব্যবধানে ভিত্তি গাত্রে জাফরীকদ্ধ এক এক দরজা, দরজার দুইপার্শ্বে কোলঙ্গার ন্যায় ঊর্দ্ধে ও নিম্নে এক এক জোড়া জাফরীবদ্ধ প্রকাণ্ড কোলঙ্গা। ইহারই মধ্য দিয়া তাজগৃহে আলোক প্রবেশ করে। চারিকোণের চারিভিত অপেক্ষাকৃত অল্প লম্বা। এইরূপ অষ্টভিত্তিবিশিষ্ট তাজের ছাদের উপর চারিকোণে অষ্ট স্তম্ভোপরি চারিটী গম্বুজ আছে। এই চারি গম্বুজের মধ্যস্থলে তাজের বিশাল গম্বুজ। গম্বুজের ব্যাস ৪৬ হাত ১৬ অঙ্গুল বেড় ইহার তিনগুণ এবং উচ্চতা ৮০ হাত। গম্বুজের উপর স্বর্ণবর্ণ কলসোপরি চন্দ্রের স্বর্ণময় মূর্ত্তি, ভূমি হইতে চন্দ্রপর্য্যন্ত তাজ মন্দির ১৭৩ হাত ৯ অঙ্গুল উচ্চ, তাজের ছাদকে বাটীর ছাদের মত বোধ হয়, অথচ কলিকাতার মনুমেণ্ট হইতেও উচ্চ। সম্পূর্ণ রূপে শ্বেত মার্ব্বেল বিনির্ম্মিত এই প্রকাণ্ড অবয়বের আমূলাগ্র। নানাজাতীয় বহুমূল্য প্রস্তরের পত্রাদি রচনা ও বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে কোরাণের পদাবলির দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে। মুসলমানেরা সত্য সত্যই দৈত্যের ন্যায় এক প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য আরম্ভ করিয়া জহরীর ন্যায় তাহার প্রত্যেক অংশ সূক্ষ্মরূপে সমাপন করিয়াছে। তাজের মন্দিরের প্রবেশ দ্বার অতি ক্ষুদ্র। ভবিষ্যতে যদি কেহ সেলাম না করে এই কারণে প্রবেশ কালে মস্তক অবনত করাইবার জন্ত দ্বার এত ক্ষুদ্র করা হয়। প্রবেশ করিলে গৃহের মধ্যভাগে অষ্টকোণ জাফরী বা মার্ব্বেল পুরদা বেষ্টিত কবরদ্বয়।

ঐ কবরের নিম্নে যথার্থ কবর আছে, প্রবেশদ্বার ও মার্ব্বেল-পর্দ্দার মধ্যে মেঝের গহ্বর দিয়া নিম্নতলে যথার্থ কবরের অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। রক্ষকেরা পুরস্কারের প্রত্যাশায় আলো জ্বালিয়া ধরে, নানাবর্ণ প্রস্তরে সুচিত্রিত ও মাল্যদামে বিভূষিত, সম্মুখের শ্বেত-কবর রাণীর ও তৎপার্শ্বের কবর সাজেহানের। কবরের উপর তক্তীদ্বারা স্ত্রী ও কলমদান দ্বারা পুরুষ চিনিতে হয়। উপরের কবর ইহারই অনুরূপ। উপরেরজাফরীকাটা মার্ব্বেল পর্দ্দা চারি হাত উচ্চ ও নানাবিধ খোদকারিতে পূর্ণ, এই খোদকারী মধ্যে অনেকে ইটালীয় পুষ্পের চিহ্ন দেখিয়া তাজ ইটালীয়দের নির্ম্মিত বলিয়া বৃথা সন্দেহ করেন। তাজের উপর নির্ম্মাতাদের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। প্রাচীরের চারি দরজার জাফরী, অভ্যন্তরে মার্ব্বেল পরদার জাফরী ও উপরে গম্বুজ নিম্নের জাফরী দিয়া আলো প্রবেশ করাতে উপরিভাগের কবর আলোকিত হয়, কবর দুইটী চতুষ্কোণ বেদী মাত্র। নিম্নভাগ প্রশস্ত কিন্তু ঊর্দ্ধে যত উঠিয়াছে ততই ক্রমে অল্প পরিসর হইয়াছে, ইহার সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা নানাবিধ লতাপাতায় চিত্রিত আছে। সম্মুখপ্রান্তে অন্‌জিমান বানু বেগম যাহার নাম সমতাজমহল, তাঁহার জন্য ১০৪০ হিজরীতে তাজ নির্ম্মিত হয় ইত্যাদি বিবরণ লিখিত আছে। শীতল, সুখসেব্য, মসৃণ, সর্ব্বত্র শ্বেতবর্ণ ও চাকচিক্যশালী নানাবিধ রঙ্গের আভায় উজ্জ্বলিত তাজগৃহ মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। শব্দ করিলে বা গান করিলে তাহার স্বর বহুক্ষণপর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ পাইসার ব্যাপটিষ্টুরি প্রতিধ্বনি এরূপ সুমধুর নহে। তাজের রমণীয় রূপ নয়নে পতিত হইলে হৃদয় শিথিল হইয়া যায়। পরে পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার কমনীয় কান্তি, সুশোভন উদ্যানের সুবিমল সমীরণ উৎকৃষ্ট আঘ্রাণ ও উৎসলিত উৎসের ক্রীড়াসহ সাজেহানের অতীত বিবরণ স্মৃতিপথে উদিত হইলে নেত্রজল সহসা ক্ষরিত হইতে থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাজ ঈষৎ নীল, উদয়ের পর রক্তাভ, কিয়ৎক্ষণ পরে পীতবর্ণ এবং মেঘাচ্ছন্ন হইলে নীল রক্ত হয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চন্দ্রালোকেই অধিক রমণীয় হইয়া থাকে। বামদিকে যাইতে প্রায় ৮০ হাতের পর হইতে তাজ দেখিতে অতি সুন্দর, বোধ হয় যেন বায়ুতে ভাসিতেছে এবং

যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই অপসৃত হইতে থাকে, চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দৃষ্ট হওয়ায় তাজকে অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়। তাজ নীলবর্ণ আলোকে আলোকিত হইলে অতি আশ্চর্য্য দেখায়। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য ভূমণ্ডলে আর নাই। সাজেহান স্বকীয় পরমা সুন্দরী স্ত্রীর মমতাজমহলের কবরের জন্য এই হর্ম্ম্য প্রস্তুত করেন। ১৬৩০অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭ বর্ষে তাজ সমাপ্ত হয়, এবং ইহার গঠনে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। টাভারনিয়ার বলেন, বিশ-হাজার লোকে ২২ বর্ষ পরিশ্রম করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করে। কিন্তু বাদশাহের হুকুমে বিনা বেতনে অধিকাংশ লোককে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তাজ নির্ম্মাণ করিতে ইসা মহম্মদ সিরাজবাসী আমনত খাঁ ও বোগদাদ বাসী মহম্মদ হানিফ মাসিক সহস্র টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তুরুক, পারস্য, দিল্লী, পঞ্জাব, ও কটক হইতে যে সকল স্থপতি আসে তাহাদের বেতন ১০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত ছিল। জয়পুর হইতে শ্বেত মার্ব্বেল, নর্ম্মদা হইতে ৪০ টাকা গজে পীত মার্ব্বেল, চারখো পাহাড় হইতে ৯০ টাকা গজে কৃষ্ণমার্ব্বেল ও চীন হইতে ৫৭০ টাকা গজে স্বচ্ছ প্রস্তর আনীত হয়।

পঞ্জাব হইতে জবরজদ, তিব্বত হইতে ফেরোজ, ইমন হইতে এলম, লঙ্কা হইতে সংসেতারা, আরব হইতে প্রবাল, বুন্দলখণ্ড হইতে হীরা, পারস্য হইতে সোলেমানি ও অমালীয়া, লঙ্কা হইতে নীলকান্তমণি ও ফতেপুর শিকরী হইতে ১ লক্ষ চৌদ্দ হাজার গাড়ী লালপ্রস্তর আনীত হয়। খাজানার ও মজরে বিস্তর বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া হইয়াছিল। লোকে বলে ইংরাজেরা তাজের অনেক পাথর খুলিয়া লইয়াছে। ইংরাজেরা বলেন রাম! আমাদের এমন কাজ! সে সকল জাটেদের কর্ম্ম। সাজেহান নিজের জন্য নদীর বিপরীত তীরে আর এক তাজ তুল্য হর্ম্ম্য করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু শীঘ্রই পুত্রবিদ্রোহে পদচ্যুত ও বন্দী হইলেন।

এতমদ্দৌলা। নদীর অপর পারে প্রতিস্রোতঃ যমুনা অবলম্বন করিয়া গমন করিলে রামবাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামবাগ তাজ উদ্যানের অনুকরণ মত্রে। ইহার মধ্যে শাজাদা আইন বা নুরজেহানের পিতা বাদশাহের মন্ত্রাধ্যক্ষ এতমদ্দৌলার কবর। উদ্যানের চারিদিকে ভিত্তি, মধ্যস্থলে মার্ব্বেলমণ্ডিত ৩৩ হাত সমচতুষ্কোণ ও ৮ হাত উচ্চ বেদী। তদুপরি চারিকোণে ২৬ হাত

উচ্চ চারিটী স্তম্ভ, তাহার মধ্যভাগে কবরমন্দির। গৃহটী গোলাকার এবং উপরিভাগে স্বর্ণবর্ণ-অলঙ্কৃত। অভ্যন্তরে এতমদ্দৌলা বিলীন আছেন। এখন অন্যরূপে [illegible] হইয়াছে।

৩। সেকেন্দ্রা বা আকবরের কবরস্থান। আগরা হইতে মথুরা পথে ৮ মাইল। পথপ্রান্তে কয়েকটী গোড়াশালী বৃক্ষ, তাহার সম্মুখে এক অতি প্রকাণ্ড দরজা, প্রায় ৪০ হাত উচ্চ। দ্বারের চারিকোণে চারিটী স্তম্ভ, সম্মুখের স্তম্ভদ্বয়ের মস্তক ভগ্ন হইয়াছে। স্তম্ভে উঠিবার সিঁড়ি আছে, কিন্তু তদন্তর, সর্প বৃশ্চিকের অসদ্ভাব নাই। দ্বার পার হইলেই লেবু, আম, কলা, ফুল ও অশ্বত্থ পূরিত এক প্রশস্ত উদ্যান, তাহার তিন দিকে তিনটা ভাঙ্গা দরজা এবং মধ্যস্থলে কলসশোভিত কবর হর্ম্ম্য থাকে থাকে উঠিয়াছে। চারিদিকের চারি দরজা হইতে সেতুর ন্যায় চারিটী পথ গিয়া হর্ম্ম্য স্পর্শ করিয়াছে। এই পথের মধ্যে রমণীয় পুষ্করিণী ও ফোয়ারা। পূর্ব্বের মার্ব্বেলবেদী সমচতুষ্কোণ প্রত্যেক দিকে ২৬৬ হস্ত। ইহার উপর ২০০ হস্ত সমচতুষ্কোণ লালপ্রস্তরের হর্ম্ম্য পাঁচ থাকে প্রায় ৬৬ হস্ত উচ্চ হইয়াছে। প্রত্যেক থাকের চতুর্দ্দিকে খিলান করা বারান্দা, তদুপরি কলসশ্রেণী বিবিধাকারে সজ্জিত হইয়াছে। সমস্তই লাল-প্রস্তরের, কেবল সর্ব্বোপরিভাগের থাক শ্বেতমার্ব্বেলে নির্ম্মিত। হর্ম্ম্যমধ্যে কিঞ্চিৎ নিম্নগামী এক পথ দিয়া এক অন্ধকারময় খিলান করা গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, স্থানটী ভিত্তিরন্ধ্রের আলোকে নাম মাত্র আলোকিত। এ গৃহ মধ্যে আকবরের গম্ভীর কবর। বাহিরে আসিয়া ডাইন-দিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। যাইতে আকবরের পরিবারগণের আরও দুই এক কবর। সিঁড়ি দিয়া উপরে দোতলা তেতলা পার হইয়া সর্ব্বোপরি তলে শ্বেতমার্ব্বেল নির্ম্মিত চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর বেষ্টিত এক অনাবৃত ছাদ, তাহাদের মধ্যস্থলে খোদকারীতে পূর্ণ ও ঈশ্বরের ৯৯ নামবিশিষ্ট নিরেট কবরের ঠিক ঊর্দ্ধে আকবরের কবরের অবয়ব। ছাদের চতুর্দ্দিকে মার্ব্বেল প্রাচীর জাফরী করা ও অতি চমৎকাররূপে খোদিত। ইহাতে বাংলায় [illegible] সোনার চাঁদনী ছিল, জাঠেরা হরণ করিয়াছে। ছাদের প্রত্যেক কোণে জোড়া জোড়া মার্ব্বেল স্তম্ভ এবং উপরিভাগে স্বর্ণবর্ণ কলস। সেকেন্দ্রার অনতি দূরে আকবরের বেগম মেরার নামক পোর্ত্তগীজ স্ত্রীর

কবর। বিদ্রোহী সিপাহীরা অনেকাংশ নষ্ট করে। এখন কবরে যাইবার পথ বন্ধ আছে।

আগরা হইতে ২৩ মাইলদূরে জয়পুরের পথে আকবরের ফতেপুর সিকরীর রাজধানী। সম্রাট অধিকাংশ সময় এই স্থানে অতিবাহিত করিতেন। লোহিতবর্ণ বালুকাপ্রস্তরের এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকট এই মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার চারিদিক লোহিতবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীরে বেষ্টিত। তাহার বেড় প্রায় ৩৷৷০ ক্রোশ। প্রবেশকালে এক প্রকাণ্ড দরজা; বামে ও দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সকল দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়। উপরে উঠিলে এক বিস্তীর্ণ সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র। চারিদিকেই সৌধমালা, ইহার এক দিকে আকবরের দরবার গৃহ। ৩৷৷০ ক্রোশ ভ্রমণ করিতে কষ্ট হইবে বলিয়া অনেকে এইস্থানে আহারের উদ্যোগ করিয়া লন। কিঞ্চিৎ দিলে সঙ্গে এক জন দর্শক যায়। অনন্তর প্রথমে সেলিম চেস্তির কবর। সেলিম এক জন ফকীর। ইহার ভজনায় আকবরের সেলিম বা জেহাঙ্গির পুত্র হইয়াছিল। কতকগুলা সিঁড়ি উঠিয়া কবর গৃহের দরজা, কলস শীর্ষ সমন্বিত, এই দ্বার অতি বৃহৎ। কেবল কুকর ৪৮ হাত ও কলস সহ দ্বার ৮০৷ হাত উচ্চ। প্রবেশ করিতে ডাইনদিকে আরবীতে লেখা আছে। জিসস বলিয়াছেন, পৃথিবী সেতু রূপা, পার হও, যেন উপরে গৃহ করিও না। দ্বার পার হইলে ৩৩৩ হস্ত বিস্তৃত এক সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র, তাহার চারিদিকে ৫৩ হস্ত উচ্চ স্তম্ভমালা। বামে তিনটী মার্ব্বেল গম্বুজবিশিষ্ট মনোহর মসজীদ, সম্মুখে ফকীরের কবর গৃহ। শ্বেতমার্ব্বেলমণ্ডিত গৃহটী চারিদিকে ৩১ হাত, মধ্যস্থানে কবর। কবরের চারিপার্শ্বে খোদকারীপূর্ণ মার্ব্বেল পর্দ্দা, উপরের চন্দ্রাতপ শুক্তিমণ্ডিত, নিম্নভাগ স্বর্ণকান্তমণিতে জড়িত, ভিত্তি সকল বহুমূল্য প্রস্তরে বিচিত্রিত ও দ্বারে আবলুসকাষ্ঠ সুশোভিত। মসজিদের দ্বারে দাঁড়াইলে দেখা যায় যে, কি অদ্ভুতকাণ্ড করিয়া পাহাড়ের উপর জল আসিত। সম্মুখে অতিদূরে ভরতপুরের মন্দিরের শীর্ষ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। কবর গৃহের পার্শ্বেই সম্রাটের প্রাসাদ ছিল, এখন ভগ্নাবস্থা। দরবার গৃহের কিয়দংশ অবশিষ্ট আছে, তাহার এক পার্শ্বে একখান মার্ব্বেল সিংহাসন দেখা যায়। তাহার পর আকবরের মন্ত্রী ও সখা বীরবলের গৃহ। গৃহটী দ্বিতল, ঘরগুলি ছোট ছোট কিন্তু

চমৎকার খোদকারীতে পূর্ণ। কল্পবটের বৃক্ষের পার্শ্বে তাঁহার পোর্ত্তুগীজ স্ত্রীর ঘর। ইহাতে পর্ত্তুগীজ বাহা বাঁধা গ্রন্থের মতবাদের কার্য্য সকল চিত্রিত আছে। আবার জানালার ধারে ধারে গণেশ মহাদেব ও লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি। কোন কোন স্থানে যীশুর ক্রুশচিহ্নও আছে। নিকটে পাঁচমহল বা পঞ্চমহল। চতুষ্কোণ পাঁচ গৃহ উচ্চ খোদিত স্তম্ভোপরি ক্রমে হ্রস্বীকৃত হইয়া বহুদূর উঠিয়াছে। অদূরে শতরঞ্চ খেলিবার চিত্রিত ঘর। প্রাঙ্গনের কোণের দিকে কামিনীগণ খেলিবার খোলা কর্ণাকার ঘর, কিছুদূরে দেওয়ানখাস বা মন্ত্রণাস্থল কাছারি। গৃহটী বাহির হইতে দেখিতে যেন দ্বিতল। প্রতি কোণে এক একটী কলস। কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখা যায় যে, একটী একতলা ঘর জানালা পর্য্যন্ত উচ্চ স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত হইয়াছে। স্তম্ভমস্তক উত্তমরূপ খোদিত ও স্তম্ভাপেক্ষা তিন গুণ বিস্তৃত। ইহার সহিত সেতুর ন্যায় প্রস্তর পথ দ্বারা চারিদিকের চারি গৃহ যোজিত আছে। আকবর স্তম্ভের মধ্যস্থলে বসিতেন এবং প্রধান প্রধান লোক চারিকোণে বসিয়া ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন, কিন্তু নিম্নস্থ সকলের সহিত উপবেশন করিতেন না। এজন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট এ স্তম্ভের উপর উৎকৃষ্ট খোদিত প্রস্তরের চন্দ্রাতপবিশিষ্ট স্থান নিকটে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার কার্ণিস সর্পাকার। নাম শুককামণ্ডী। অনন্তর কনষ্টান্টিনোপলের সুলতানার ঘর। ইহার প্রত্যেক ইঞ্চি বিবিধাকারে খোদিত, এবং এমন স্থান ফাঁক নাই যেখানে কোন রূপ না কোন রূপ বৃক্ষলতাদি চিত্রিত হইয়াছে। ভাস্করগণকে কতরূপ কসরাই করিতে হইয়াছিল। পাথর গুলি যেন পাথর। অনন্তর তৃণপূরিত টাকশালের চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। তদনন্তর ২০০ ঘোড়ার প্রস্তর নির্ম্মিত ডাবা ও লৌহ কড়াযুক্ত লালপ্রস্তরের অশ্বশালা। বীরবলের বাটীর উত্তরে হাতী দরওয়াজা, আকবর দুর্গ নির্ম্মাণ ইচ্ছা করিয়া এই দরজা পত্তন করেন। ইহার অষ্টকোণ বুরুজদ্বয় অতি বিকটাকার, দুই পার্শ্বে বেদীর উপর শুণ্ডভাঙ্গা প্রস্তরের দুই প্রকাণ্ড হস্তী। অনন্তর দুইটী উদ্যানের মধ্য দিয়া ক্রমে এক উচ্চ পথ। পার্শ্বে স্থানে স্থানে ভাঙ্গাবাড়ী, তাহার পর আধুনিক প্রস্তরের হস্তীদন্তে বিভূষিত এক বৃহৎ হস্তীস্তম্ভ। আকবর বহু ব্যয় করিয়া এই সকল হর্ম্ম্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু যে ফকীর আকবরের সন্তানের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, সে আপ-

নার ভজন স্থানে গোলযোগ দেখিয়া এক দিন আকবরকে কহিল, হয় তুমি স্থান পরিত্যাগ কর, নয় আমি স্থান পরিত্যাগ করি। ফকীরের কুটীরের কাছে রাজবাটীর গোল কেন!- আকবর বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, যদি নিকটে না রাখেন, তবে এই ভৃত্যই স্থান ত্যাগ করিতেছে। এই বলিয়া তিনি আগরা নির্ম্মাণ করিলেন। তদবধি ফতেপুর পরিত্যক্ত হইল। আগ্রার সাদা পাথরের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি, জয়পুরের আমদানী পাথরের নানা দেবমূর্ত্তি, উৎকৃষ্ট সতরঞ্চ বা দড়ি, লোমজবস্ত্র গুড়গুড়ির নল, আম ও শিশুকাষ্ঠের জিনিস, চুড়ী, উত্তম জাক, নারাঙ্গী, তরমুজ, ডালভাজা ও কালাকন্দ বা বরফী, নকলদানা পাওয়া যায়। আগ্রা অঞ্চলে ছাগ উষ্ট্রাদির সকল দুগ্ধ একত্রে দোহন করে এজন্ত সাবধান হইয়া খরিদ করা উচিত।

আগরার পরে ভরতপুর। উর্ব্বরা ক্ষেত্র ও সুন্দর বনরাজি বেষ্টিত ভরতপুর। চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা প্রাচীর ও পরিখা। নগরের অভ্যন্তরে পাকা কেল্লা, পরিখা এত বিস্তৃত যে একটী ক্ষুদ্র নদী বলিয়া বোধ হয়। তন্মধ্যে রাজবাটী, ৮ কোশ দূরে রাজার সুপ্রসিদ্ধ ডিগের উদ্যান, লম্বে ৩১৬ ও প্রস্থে ২৩৩ হাত। উদ্যান মধ্যে একটী অষ্টকোণ পুষ্করিণী, তাহার ৪ দিক হইতে চারিটী পথ চারি প্রাসাদে গিয়াছে। সে গুলি ভরতপুরের বালিজাত অতি উৎকৃষ্ট বালুকা প্রস্তরে নির্ম্মিত, ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে ভারতে এরূপ নির্ম্মাণ কৌশল অতি অল্প আছে। উদ্যানের গোপালভবন অতি শোভাকর, আগরা ভগ্ন করিয়া এই গোপাল ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে, কোয়ারার সৌন্দর্য্য অত্যন্ত অধিক, মধ্যস্থ ভবনের দ্বার, স্তম্ভপ্রভৃতি নানা স্থান হইতে উৎস উঠিতেছে। উহার জল উঠিবার প্রথা এরূপ চমৎকার যে তদুপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া গৃহ মধ্যে দুই ইন্দ্রধনুকের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজার এক প্রাসাদের উপর কৃত্রিম পুষ্করিণী আছে, গ্রীষ্মকালে সেই স্থান অতি শীতল থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ভরতপুরের কেল্লা নগরের দক্ষিণে এক দিনের পথে বর্ত্তমান আছে। প্রকাণ্ড পর্ব্বতোপরি অতি সুদৃঢ় কেল্লা। অভ্যন্তরে গভীর কুণ্ড ও খোদিত প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভ। গৃহের এক স্তম্ভে

হস্তের অঙ্গুলি চিহ্ন, বার বার উত্তম করিয়া ইংরাজেরা এই দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে ১৮২৬ অব্দে অধিকার করেন।

ভরতপুরের বিপরীত জয়পুর। দক্ষিণ ব্যতীত তিনদিকে পাহাড়, মধ্যস্থল বালুকাময়, চারিদিকে পাকা প্রাচীর, ইহার অভ্যন্তরে তিন মাইল লম্বা ও দেড় মাইল প্রশস্ত সহর, জয়পুরের তুল্য শৃঙ্খলাবদ্ধ নগর অতি অল্প দেখা যায়। পথ সকল প্রশস্ত ও সম্পূর্ণ রূপ সরল, পথ প্রান্তস্থ গৃহ সকলের প্রাচীর এক রেখায় সম্মিলিত আছে। সৌধসমূহ নিতান্ত ধবল ও স্বর্ণবর্ণ কলসে বিভূষিত। কেহ কেহ বলেন, জয়সিংহ নগর পত্তনের পূর্ব্বে এক জন ইটালীয় কর্ম্মকার দ্বারা রথ্যাদি প্রস্তুত করান, তাহার পর অধিবাসিরা সেই মতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই জন্ত সর্ব্ববিভাগই দেখিতে এরূপ সুদৃশ্য। রাজবাটী প্রায় সহরের চতুর্থাংশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যস্থ উদ্যান কোয়ারা গোবিন্দজির মন্দির ও রাজার ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ অত্যন্ত রমণীয়। জয়পুরের দোকান সকল উত্তম রূপ সুসজ্জিত। কিন্তু দোকানের পার্শ্বে বিস্তর পায়রা চরিয়া থাকে। বর্ষায় এখানে বালুকা বশতঃ কিছুমাত্র কর্দ্দম হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দুরন্ত গ্রীষ্ম ও পথের উত্তপ্ত বালুকাতে গমনাগমন প্রায় বন্ধ হয়। এখানে শ্বেতপাথরের দ্রব্য, চিত্রপট, স্বর্ণমোহর অতি উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়। এখানকার লোকে উচ্ছিষ্ট ভোজন পাত্রাদি জলে ধৌত না করিয়া শুষ্ক বালিতে মাঁজিয়া ঝাড়িয়া ফেলে, ব্রাহ্মণভোজনাদি রাজপথে হইয়া থাকে। জয়পুরের রাজার বার্ষিক আয় ৮৫ লক্ষটাকা, ইহার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ টাকা জায়গীর ও কৃষ্ণ সেবায় ব্যয়িত হয়। আরাংজেবের দৌরাত্ম্য সময়ে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী এখানে আনীত হন। এখানকার জৈন মন্দির সকলও উৎকৃষ্ট। জয়পুরের ৩ মাইল অগ্নিকোণে সুন্দর মন্দির ও কুণ্ডাদি আছে, চারি মাইল দূরে প্রাচীন রাজধানী ও নানা রঙ্গের কাচের শার্সী শোভিত রাজার শীশ মহল। নিকটে কেল্লার অভ্যন্তরে পাশ মার্গে কতক গুলি খাত আছে, উহার মধ্যে বিশেষ দোষীদিগকে রুটী ও লবণাক্ত জল দেওয়া হয়। ইহার অবস্থা বলিতে অতি অল্প লোক বাহির হইয়াছে। কেল্লা মধ্যে কি ইংরেজ কি অপর কেহই যাইতে

পার না, ৭৫ মাইল অগ্নিকোণে বিখ্যাত রিন্তাম্বোরের কেল্লা। যেখানে হাম্বারে চৌহান আলায়ুদ্দিন সহ যুদ্ধে রণশায়ী হন এবং রাজপুত রাণীরা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। জয়পুরই বিখ্যাত মৎস্যদেশ। জয়পুরের ৫০।৫৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও দিল্লির ৪৩ ক্রোশ নৈর্ঋতকোণে প্রাচীন বিরাট নগর, তথায় পাণ্ডুপর্ব্বত ভীমগুহা ও কিছুদূরে অশোকের স্তম্ভ আছে। পর্ব্বত হইতে বড় বড় পাথর খসিয়া পড়িয়াছে এবং ঐরূপ এক প্রস্তরে অশোকের আজ্ঞালিপি খোদিত, ভীমগুহার বেড় ৪০ হাত ও উচ্চতা ১০ হাত। জয়পুর হইতে ডাইনদিকে এক রেল সাম্বর হ্রদে ও দক্ষিণদিকে এক রেল কৃষ্ণগড় হইয়া আজমীর গিয়াছে। আজমীর পর্ব্বত-পার্শ্বে সংস্থিত। কিন্তু উপত্যকা ভূমি প্রশস্ত হ্রদ পুষ্করিণী ও অশ্বত্থ তেঁতুলাদি বৃক্ষের হরিত শোভায় শোভিত, এখানকার দুর্গ অতি দৃঢ়, তন্মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত মৈউদ্দীনের কবর। কবরগৃহ পূর্ব্বে জৈনমন্দির ছিল। আজমীরের ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে প্রসিদ্ধ পুষ্কর তীর্থ, জনপূরিত পুষ্কর নগর পুষ্কর হ্রদের তীরে অবস্থিত, হ্রদটী বিকসিত পদ্মপুষ্পের শোভায় অতি রমণীয়, তীরে ব্রহ্মার মন্দির. পর্ব্বতের উপর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ও মধ্যম পুষ্করাদি স্থানে আছে, কিন্তু সরস্বতী নদী প্রবাহিত নাই, এখানকার দ্রাক্ষা সিরাজের দ্রাক্ষা তুল্য বৃহৎ ও মধুর। আজমীর হইতে নসীরাবাদ, এখান হইতে রাজপুতানার অপরাপর স্থানে যাওয়া চলে, উদয়পুরের নাথদোয়ারার সেবা অতি প্রসিদ্ধ, এই বিগ্রহ বৃন্দাবনের তিন প্রসিদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে আর একটী।

রাজপুতানা দেখিতে ইচ্ছা না হইলে আগরা টুণ্ডলায় ফিরিবে। তাহার পর হাটারস জংসন, বামে মথুরার রেল। মন্দির ও ঘাট সমন্বিত মথুরা যমুনার ডাইন তটে অবস্থিত। ৩ ক্রোশ দূরে বৃন্দাবন ও যমুনা, বামে গোকুল, গোকুলকে পদ্মের কর্ণিকা করিয়া পুরাণে চারিদিকের বিখ্যাত স্থান সকল লিখিত হইয়াছে। অগ্নিকোণে দ্বিতীয় দলে নিকুঞ্জক, পূর্ব্বদিকে তৃতীয়দলে শতগজাসম তীর্থ, ঈশানে চতুর্থদলে বস্ত্রহরণ, উত্তরে পঞ্চমদলে দ্বাদশাদিত্য স্থান, বায়ুতে ষষ্ঠদলে কালীয়হ্রদ, পশ্চিমে সপ্তমদলে অঘাসুর নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মমোহন এবং নৈর্ঋতে অষ্টমদলে শঙ্খচূড়বধ স্থান

বৃন্দাবন। তৎপরে ঐরূপ ক্রমে আর ষোড়শদলের প্রথমদলে মধুবন, দ্বিতীয়ে খদিরারণ্য, তৃতীয়ে গোবর্দ্ধন, চতুর্থে জনবস্থলী, পঞ্চমে নন্দীশ্বর, ষষ্ঠে নন্দবন, সপ্তমে বকুলারণ্য, অষ্টমে তালবন, নবমে কুমুদবন, দশমে কাম্য-বন, একাদশে সেতুবন্ধ নির্ম্মাণ, দ্বাদশে ভাণ্ডীর, ত্রয়োদশে ভদ্রবন, চতুর্দ্দশে শ্রীবন, পঞ্চদশে লৌহবন ও ষোড়শে মহাবন। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন যমুনার পূর্ব্বকূলে ও তাল, খদির, বহুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন পশ্চিমকূলে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ উপবন, দ্বাদশ প্রতিবন ও দ্বাদশ অধিবন আছে।

আমরা চারিদিকে বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে লাগিলাম। নানা দিকে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আর সে গোপাল নাই, আর সে রাখাল নাই, আর সে রাই অভিসারে যায় না, আর কেহ রাধা রাধা বলিয়াও ডাকে না। কিন্তু সেই গোবর্দ্ধন, সেই যমুনা, সেই বনস্থান এখনও আছে। কোকিলের কলরব, ভ্রমরের গুঞ্জন ও ময়ূরের নৃত্য এখনও বৃন্দাবন শোভিত করিয়াছে। মন্দির ঘাটে যমুনাতীর আকীর্ণ। চারি-দিকে কৃষ্ণরূপ, চারিদিকে কৃষ্ণনাম, গাত্রে কৃষ্ণ, বস্ত্রে কৃষ্ণ, লোকে বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। মধ্যে মধ্যে জয় রাধারাণী শব্দে গগন বিস্ফারিত হইতেছে। পদে পদে নিকুঞ্জশোভা।

যত দেখি তত চাই, ফিরে ফিরে পুনঃ চাই,
নব নব ভাব যেন বিকসিত তায় রে।
বারে বারে মনে করি, একি সেই মধুপুরী,
যাহার বর্ণনে ব্যাস উন্মত্তের প্রায় রে।

পূর্ব্বে এই পুরী মধুবন নামে খ্যাত ছিল। ধ্রুব এই বনে কিছুকাল তপস্যা করিয়াছিল। তাহার পর মধু দৈত্য বাস করিয়াছিল, শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বধ করিয়া মথুরা নগর নির্ম্মাণ করেন। কালে এই নগরী উগ্র-সেনের হস্তগত হয়। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া কংস রাজা প্রাপ্ত হন। কংসকে কৃষ্ণ বধ করিয়া পুনরায় উগ্রসেনকে সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ ভয়ঙ্কর বারম্বার মথুরা আক্রমণ করিত, মাঠ সকল শবময় ও ইজ্জাপার বলিয়া থাকে। ফেরোজের কোটিলা হইতে হুমায়ুনের কবর

প্রাচীর ভগ্ন করিয়াছিল। কংসের সময় কৃষ্ণ ব্রজনিবাসে বাস করিতেন। ব্রজনিবাসের উত্তর একক্রোশ নিকপদ্রব ছিল। তাহার পরেই সর্পপুরিত কালীয় হ্রদ, গোবর্দ্ধনে প্রকাণ্ড ভাণ্ডীরবট বর্ষার নীপ অর্জ্জুন ও কদম্ব-শোভিত যমুনা ছিল ও গোবর্দ্ধনের উত্তরে যমুনাতীরে তালবন ছিল। কাষ্ঠ ও তৃণবহুল বৃন্দাবনের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও প্রস্তর গুটিকাদি শূন্য দেখিয়া কৃষ্ণ তথায় গোচারণ করিতেন। মথুরায় কংসবধ হইলে জরাসন্ধের সহিত তাঁহাকে বারম্বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শেষে প্রাচীরাদি ভগ্ন হইলে কিছুকাল তিনি মথুরা ত্যাগ করিয়া যান। কুরুযুদ্ধের পর মথুরায় কৃষ্ণ-বংশীয়েরা রাজ্য করিয়াছিল, এখন যমুনা অপসৃত হওয়ায় কালীয় হ্রদ ভূমি মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বৌদ্ধ আবার এখানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় মথুরার প্রাচীন দুর্গের ১ মাইল পশ্চিমে কাঠরায় ও কাঠরার তিন মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের মন্দির ও বিহার ছিল। ৪০০ খৃঃ অব্দে ফাহিয়ান তিন সহস্র বৌদ্ধপূর্ণ ২০ বিহার ও ৬৩৪ খৃঃ অব্দে হোয়ান-থসং ঐস্থানে ২ সহস্র বৌদ্ধ দেখেন। তৎকালে ব্রাহ্মণদের পাঁচ ও বৌদ্ধ-দের ৭ প্রধান মন্দির ছিল। ১০১৭ অব্দে মহম্মদ গজনী আসিয়া বিশাল মন্দির শোভা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত মুসলমান বিশদিন মথুরা লুণ্ঠন করিয়াছিল, যবনেরা মাণিক্যের চক্ষুযুক্ত পাঁচটী স্বর্ণবিগ্রহ ও একখণ্ড ／১৮০ সের নীলকান্তমণি জড়িত আর এক প্রকাণ্ড স্বর্ণমূর্ত্তি এবং ১০৮ উষ্ট্রের উপর ১০৮ রৌপ্যমূর্ত্তি লইয়া যায়। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন গজনী মথুরায় অসংখ্য স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। গজনীর পরবর্ত্তী মুসলমানেরা মথুরার মন্দির সকল চূর্ণিত করে। কাঠ-রায় কেশব রায়ের মন্দির বলিয়া এখনও একটার কিয়দংশ বর্ত্তমান আছে। আরংজেব এই মন্দিরে জমামসজিদ স্থাপন করিয়াছিল। ইহার গাত্রের প্রস্তরে ১৭২০ সম্বৎ পর্য্যন্ত সম্রাটের নাম খোদিত আছে। অতএব অন্ততঃ ৫ বর্ষকাল আরংজেবের রাজ্য সময়েও এই মন্দির হিন্দুদিগের দেবালয় ছিল। তাহার পর মসজিদ হয়। কিন্তু গজনীর পর হইতে মথুরা ও বৃন্দাবনের দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছিল। অনেক স্থান জঙ্গলময় হয়, গৌরাঙ্গ ও রূপ সনাতন অনেক উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের

সময় মথুরা ও বৃন্দাবন একবারে চিহ্নহীন হয় নাই, ঘোরীদের সময়েও লোকে রীতিমতে তীর্থ করিয়াছিল। গৌরাঙ্গের অল্পকাল পূর্ব্বে মন্দির সকল লুণ্ঠিত হয়। লোকের সমস্তই স্মরণ ছিল, এখনও লোকে বৌদ্ধশিষ্য আনন্দ ও বিনায়কের স্তূপ আনন্দটিলা ও বিনায়কটিলা বলিয়া দেখাইয়া থাকে। গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে গোবিন্দজী মদনমোহন ও গোপী-নাথের মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। আকবরের সময়ে মানসিংহ মথুরা ও বৃন্দা-বনের বিলক্ষণ শোভা সম্পাদন করেন। জয়সিংহ মথুরাতে এক মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জ্যোতিবৃত্ত যাম্যোত্তর ভিত্তিযন্ত্র, নাড়ীবলয় ও অগ্রযন্ত্রাদি সকল ভগ্ন প্রায়। এই সময়েই সুপ্রসিদ্ধ তানসেন ও তাহার গুরু হরিদাস এই স্থানে বসিয়া কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। আক-বর বৃন্দাবনে আসিয়া তানসেনকে সঙ্গে লইয়া যান, আকবরের সময়ে মথুরা ও বৃন্দাবনের যে সকল উন্নতি হইয়াছিল আরংজেবের সময় তাহার অধিকাংশ বিনষ্ট হয়, এই পামরের রাজ্যকালেই গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় স্থাপিত প্রধান প্রধান বিগ্রহ রাজপুতানায় চলিয়া যায়। আরংজেবের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রীয়কালে সিন্ধিয়া, জয়পুর ও রাজপুতানা প্রবল হইলে পুনরায় মথুরা শোভিত হইল। বৈরাগী, বানর ও ব্রজমায়ী পূরিত বৃন্দাবনে সতত কোলাহল হইতেছে। বর্ত্তমান বিগ্রহের মধ্যে গোবিন্দজী, মদনমোহন গোপীনাথ এই কয়েকটী প্রধান, গোবিন্দজীর গৃহে প্রবেশ করিবার তিনটী খিলান ও সম্মুখে বারান্দা, অভ্যন্তরে বনাতের লালকানাৎ ঝুলিতেছে, দুইদিকে দুইটা পিত্তলের সামাদান। মূর্ত্তিটী সুন্দর, বামে রাধিকা ও দক্ষিণে ললিতা। গোপীনাথ মূর্ত্তি গোবিন্দজীর তুল্য উৎকৃষ্ট নহে। এখানে গোবিন্দজী দর্শনকালে যে ভেট দিতে হয় আর দুই বাড়িতে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনে বিস্তর রাজার মন্দির ও দানশালা আছে। মথুরা বৃন্দাবনের অপরাপর কীর্ত্তির মধ্যে শেঠেদের মন্দিরাদি দেখিবার যোগ্য, বৃন্দাবনে দ্রব্যাদি সুলভ কিন্তু কুঞ্জওয়ালারা দালালী লয় বলিয়া ক্রেতার ন্যায় করিয়া মাত্র অধিক মূল্য লয়। বৃন্দাবনের রাবড়ী, পেড়া, খুরচুন আদি দুগ্ধজাত বিবিধ দ্রব্য, ছোলা ভাজা, পিত্তলের লোটা ও জয়পুরী লোককৃত ছাপা কাপড়, চুনরী প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

তদনন্তর আলিগড় জংসন। এখানকার অধিবাসীরা এক্ষণে তুলার ব্যবসায়ে রত। আলীগড়ের কেল্লা মহারাষ্ট্রীয়দের সময় দৃঢ় ছিল। এখানকার মাটির সরাই বা জলের কুজা ও সতরঞ্চ মন্দ নহে।

দিল্লী। আলিগড় পার হইয়া দিল্লী প্রবেশ করিতে যমুনার দ্বিতীয় আশ্চর্য্য সেতু। দ্বাদশ খণ্ডের মধ্য দিয়া বালুকাপূরিত যমুনা বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক খণ্ড ১৩৬ হস্ত বিস্তৃত। পুলের উত্তর পার্শ্বে জাফরী, সর্ব্বনিম্নে নদী, তদুপরি লোক ও তদুপরি দিয়া রেলগাড়ী চলিতেছে। প্রথমেই সেলিম গড়ের কেল্লা। দুধারের প্রকাণ্ড কাণ্ড দেখিয়া বোধ হয় যেন সত্য সত্যই কোন মহানগরীতে প্রবেশ করিতেছি। তদনন্তর দিল্লী নগর। দিল্লী কতবার কতস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সহরের নাম নয়া বা নূতন দিল্লী। দুই শত বর্ষ হইল সাজেহান এই নগর স্থাপন করিয়াছেন,ইহার চতুর্দ্দিকে লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর বেষ্টিত, তাহার বেড় প্রায় ৫॥০ মাইল, প্রাচীরের উপর তীর নিক্ষেপের জন্য কাটা কাটা ফাক। নগর প্রবেশের এক্ষণে দশটী মাত্র দ্বার আছে। তন্মধ্যে কলিকাতা, কাশ্মীর, মোরী, লাহোর ও দিল্লী এই পাঁচটী প্রধান। উত্তর পূর্ব্বে সালিমগড় বা কলিকাতা উত্তরে কাশ্মীর ও মোরী, পশ্চিমে কাবুল ও লাহোর, দক্ষিণ পশ্চিমে ফরাস ও আজমীর, দক্ষিণে তুর্কিস্থান ও দিল্লী ও পূর্ব্বে যমুনাদিকে রাজঘাট এই দশটী ক্রমান্বয়ে আছে। নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে নানা সময়ের স্থাপিত পূর্ব্ব দিল্লী সমূহের ভগ্নাবশেষ ক্রমাগত দশ মাইল চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সহরের ফেরোজসহরে কোটিলার নিকট এই ভগ্নাবশেষের উত্তর প্রান্ত তিন মাইল ও কেল্লা রায়পিথোরা হইতে তোগলককাবাদ পর্য্যন্ত ইহার দক্ষিণ প্রান্তের বিস্তার ৬ মাইল। এই ৪৫ বর্গ মাইল জুড়িয়া নানা সময়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। দিল্লী বহুকাল ভারতের রাজধানী ছিল, কতবার শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে ও কতবার ধ্বংস হইয়াছে, শত্রু কর্ত্তৃক প্রাচীন সহর বিনষ্ট হইলে কোন সম্রাটের উৎকৃষ্টতর সহর নির্ম্মাণ ইচ্ছা হইলে প্রাচীন সহরের স্থান পরিত্যক্ত হইত। এইরূপে রায় পিথোরা হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে বর্ত্তমান সহর, সর্ব্বপ্রাচীন সহরের ১০ মাইল দূরে পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সহরের সর্ব্ব প্রধান রাস্তার

নাম চাঁদনী চৌক। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিস্তর দোকান, গুড়গুড়ীর নল, গিল্টী কলকী, জরীর টুপি, ও কাপড়াদি বিক্রয় করিতেছে। রাস্তাটি অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ৮০ হাত বিস্তৃত, পরিষ্কৃত, সুরক্ষিত এবং উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাদি দ্বারা শোভিত। দিল্লীর পূর্ব্বপ্রান্ত স্থিত যমুনাতীরে সম্রাটের বাটীর লাহোর দ্বারে আরম্ভ হইয়া নগরের ঠিক মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকস্থ লাহোরী দরওয়াজায় আসিয়া এই রাস্তা শেষ হইয়াছে। এই পথেই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত দিল্লী ইনষ্টিটিউট নামে বিদ্যালয় আছে। এই পথেই সেই কোতো-য়ালি, যেখানে গবর্ণমেণ্ট নগর অধিকার করিয়া বিদ্রোহীগণকে বধ করেন। ইহারই নিকট সেই ভয়ানক মসজীদ, যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া ১৭৩৮ অব্দে নাদীর সাহ নগর লুণ্ঠনে আদেশ করিলে একদিনে বধ্যমান লক্ষ নগরবাসীর প্রাণত্যাগ কালীন চীৎকার শব্দে দিল্লীতে আকাশ বিস্ফারিত হইতে লাগিল। এইরূপ হত্যা করিয়া নাদীর ময়ূর সিংহাসন লইয়া প্রস্থান করেন। ইহারই সম্মুখে মহারাণীর বাগান। কাশ্মীর দরজা হইতে উত্তর দক্ষিণে লম্বা আর এক রাস্তা দ্বারা দিল্লী সহর পূর্ব্ব পশ্চিমভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই রাস্তার পার্শ্বে কর্ণেল স্কিনির গির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারই সন্নিধানে গবর্ণমেণ্টের সিলাখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। পাছে বারুদ ও অস্ত্রাগার বিদ্রোহীর হস্তে পতিত হয় এই ভয়ে ১৮৫৭ অব্দে লেপ্টনেণ্ট উইলাবি ইহাতে অগ্নি প্রদান করেন।

রাজবাটী বা দুর্গ। যমুনাকূলে এক মাইল বিস্তীর্ণ তিন দিকে লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর, বেড় ১॥০ মাইল, উচ্চতা ২৬ হস্ত উপরিভাগ শীর্ষ ও কলসে শোভিত। দুইটী প্রশস্ত দ্বার আছে, লাহোর ও দিল্লী। পরপারে সেলিম গড়ের কেল্লা, এই দুর্গের সহিত এক সঙ্কীর্ণ সেতু সংযোজিত আছে। আমরা লাহোর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে এক বিশাল চূড়ার নিম্নে এক প্রশস্ত দ্বার। তাহার পর খিলানে আবৃত এক পথ বরাবর চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী অষ্টকোণ গৃহ। ভিত্তি সকল নানারঙ্গের প্রস্তরখচিত, তদনন্তর এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন, চারিদিকে প্রস্তর [illegible] এবং সম্মুখে দেওয়ান আম বা সকল [illegible], দেওয়ান আম অতি প্রশস্ত, তিনদিক খোলা। মধ্যে লোহিত প্রস্তর স্তম্ভ শ্রেণী, পূর্ব্বে স্তম্ভভাগ সুন্দররূপ নির্ম্মিত

ছিল। এখন ইংলণ্ডীয়দের হস্তে চূর্ণ দ্বারা আবৃত হইয়াছে। দেওয়ান আম মধ্যে ভিত্তি গাত্রে দশফিট উচ্চ সিংহাসন স্থান। তন্নিম্নে সিঁড়ি, উপরে প্রস্তরের চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের চারি প্রান্ত শ্বেত মার্ব্বেলের স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। সমস্তই চিত্রিতের ন্যায় নানাবিধ প্রস্তর দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট সজ্জিতহইয়াছে। সিংহাসনের পশ্চাতে একটী দরজা সম্রাট অন্তঃপুর হইতে ঐ দরজা দিয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিতেন। সিংহাসনের পার্শ্বস্থ ভিত্তি সকল নানাবিধ বহু মূল্য প্রস্তরদ্বারা শোভাশালী। পুষ্প, ফল, পক্ষী ও পশুতে চিত্রিত হইয়াছে। অধিকাংশই একণে নষ্ট প্রায়। নিকটেই দেওয়ান খাস বা মফঃস্বলকাছারি। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থানে সংস্থাপিত। গৃহটী সমচতুষ্কোণ এবং ইহার স্তম্ভও সমচতুষ্কোণ। স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট খিলান। সমস্তই মার্ব্বেল নির্ম্মিত এবং ইহার মার্ব্বেল অতি চাকচিক্যশালী। অধিক ঝাড় বুটাকাটা নাই বটে কিন্তু যাহা দুই একটী আছে তাহা অতি সুন্দর। দেওয়ানা খাসের এক দিকে প্রাঙ্গন অপর দিকে উদ্যান শোভা আর এক দিকে যমুনা ও অবশিষ্টদিক অন্তঃপুরের ভিত্তি সংলগ্ন। বাহিরের স্তম্ভগুলি অতি উৎকৃষ্টরূপ খোদিত মার্ব্বেল গরাদিয়ায় সংযুক্ত, উপর ছাদে প্রত্যেক কোণে এক একটী মার্ব্বেল শীর্ষ তদুপরি গিল্টী করা গম্বুজ। গৃহটী লম্বে ৪০ হস্ত, পূর্ব্বে উপরিভাগ সুবর্ণ ও রজতময় জালে আচ্ছন্ন ছিল। তন্নিম্নে সুপ্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন থাকিত। সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগ নানাবিধ রত্ন খচিত হইয়া ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় শোভা ধারণ করিত বলিয়া লোকে ইহাকে তক্ত তাউস বা ময়ূরসিংহাসন কহিত। ময়ূর সিংহাসন সমস্তই নিরেট সুবর্ণে নির্ম্মিত ছিল। লম্বে ৪ হাত ও প্রস্থে ২ হাত ১৬ অঙ্গুল। উপরে দ্বাদশটী সুবর্ণ স্তম্ভ। তদুপরি স্বর্ণের চন্দ্রাতপ। চারিদিকে মতির ঝালর। আমূলাগ্র সমস্তই বহুমূল্য রত্নে খচিত। দুই পার্শ্বে বহুমণিমণ্ডিত দুই ছত্র দণ্ড, লম্বে ৫ হাত আট অঙ্গুল। ছত্রের আবরণ লোহিত মখমল। তদুপরি স্বর্ণছিত্র ও মুক্তাজালের শোভা। আলোকের প্রভাবে ঐ সকল রত্ন হইতে নানা বর্ণের আভা বহির্গত হইয়া সভার অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। নূতন দিল্লী সংস্থাপক সাজেহানের আজ্ঞা ক্রমে অষ্টিন ডি বোর্ডো এই সিংহাসন প্রস্তুত করেন। ফরাশি জহুরি টাভুরণিয়ার পরীক্ষা করিয়া

লিখিয়াছেন যে, দুর কল্পিত ইহার মূল্য ৬ কোটি টাকা ছিল। নাজীরসাহ দিল্লী লুণ্ঠন কালে এই সিংহাসন লইয়া যান, গৃহের স্বর্ণময় চন্দ্রাতপ ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা লইয়া যায়, এবং গলাইয়া ফেলে, তাহার মূল্য ১৭ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। অন্তঃপুরে দেওয়ান খাসের সহিত সংলগ্ন ছিল, এখন অতি অল্প অংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্য দিয়া হাম্মাম বা স্নানাগারের পথ। স্নানাগার তিনটী প্রশস্ত গৃহ, তদুপরি মার্ব্বেল গম্বুজ, সমস্ত মার্ব্বেলের কাজ এবং তিন গৃহমধ্যে তিনটী মার্ব্বেল ফোয়ারা তৎপরে মতিমসজিদ। ক্ষুদ্র ও মার্ব্বেলে সুনির্ম্মিত, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংরেজেরা সম্রাটের আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। সমস্তই ভূমিসাৎ করিয়া সৈন্যদের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

জুমা মসজিদ। কেল্লার অনতিদূরে সহর মধ্যে সংস্থিত, এই মসজিদ ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিখ্যাত। একটী পাহাড়ের চারি পার্শ্বে সিঁড়ি গাঁথিয়া এরূপ উচ্চ করা হইয়াছে যে পূর্ব্বে যে তাহা পাহাড় ছিল ইহা বুঝিবার যো নাই। ক্রমশঃ উচ্চগামী এই বিস্তীর্ণ সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিলে এক প্রকাণ্ড দরজা, পূর্ব্বদিকের এই দরজা দিয়া প্রবেশ মাত্র এক বিস্তীর্ণ প্রস্তরমণ্ডিত প্রাঙ্গন, এক এক দিকে তিন তিন শত হাত, মধ্যস্থলে এক মার্ব্বেল চৌবাচ্চা, তিন দিকে খিলান সংযুক্ত স্তম্ভশ্রেণী, চারি কোণে চারিটী নওবৎখানার মত অষ্টকোণ গৃহ, পশ্চিমদিকে মসজিদ, মসজিদগৃহ লম্বে ১৩৪ ও প্রস্থে ৮০ হাত, উপরে তিনটী উৎকৃষ্ট মার্ব্বেল-নির্ম্মিত গম্বুজোপরি গিল্টি করা তাম্রশীর্ষ, গৃহের সম্মুখভাগে কিয়দংশ শ্বেত মার্ব্বেলমণ্ডিত, কারনিস ১০ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ৬ হাত ১৬ অঙ্গুল লম্বা ও ১ হাত ৮ অঙ্গুল প্রশস্ত, তাহাতে কাল-মার্ব্বেল বসান অক্ষরে লিখিত আছে যে, ১৬২০ খৃঃ অব্দে সাজেহান ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ বর্ষে এই মসজীদ নির্ম্মাণ করেন। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ শ্বেত-মার্ব্বেল টালিতে মণ্ডিত, প্রত্যেক টালি ২ হাত লম্বা ও ১ হাত চৌড়া, মুখে কাল-মার্ব্বেলের পাড় থাকাতে অতি সুন্দর লাগিতেছে, ভিতরের ভিত্তির কতকটা শাদা-মার্ব্বেলে আবৃত। কিবলা অর্থাৎ মক্কা প্রদর্শনকারী দিকে একটী সুন্দর তাক আছে, তাহার প্রস্তর গুলি এত সুন্দররূপে খোদিত ও সংযো-

জিত যেন বোধ হয় ৪ ফিট উচ্চ ও ৬ ফিট প্রশস্ত এক খণ্ড শাদা-মার্ব্বেল কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। মসজীদের উভয় পার্শ্বে শ্বেত মার্ব্বেল ও লোহিত-বালুকা প্রস্তরে গ্রথিত ৮৯৪০ হাত লম্বা দুই বিশাল স্তম্ভ আছে স্তম্ভের গাত্রে ঠিক সম সম দূরে তিনটী শ্বেত-মার্ব্বেলের আবরণ দেওয়া বারান্দা, স্তম্ভের উঠিবার জন্য সিঁড়ি স্তম্ভের মধ্য দিয়া আছে। ইহার উপর হইতে দূরে বহুবিধ সময়ের ভগ্নাভগ্ন হর্ম্ম্যপূর্ণ দিল্লী দেখিতে যুগপৎ শোক ও আনন্দের উদয় হয়, প্রাতঃকালে সময়ে সময়ে বরফমণ্ডিত হিমালয়ের শীর্ষদেশের সামান্য আভাও দেখা যায়। মসজীদের সকল অংশেই লোকে গমনাগমন করে, কেবল উত্তর পশ্চিমাংশে সুন্দর মার্ব্বেলের পর্দ্দা দেওয়া কয়েকটী গৃহে মহম্মদের দাড়ির চুল প্রভৃতি ঐ প্রকারের কয়েকটী দ্রব্য থাকায় মুসলমানেরা যাইতে কিঞ্চিৎ আপত্তি করে।

কালামসজীদ। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ফেরোজ নির্ম্মাণ করেন, গাঁথনি মোটা ও দস্তাল, নূতন দিল্লীর দেখিবার উপযুক্ত এই কয়েকটী বিষয় বর্ণিত হইল। এই নগর ৭ বার লুণ্ঠিত হয়। এবং সাতবার এই নগর ঘোর ডঙ্কার শব্দ করিতে করিতে জেতৃগণের ভীষণ প্রবেশ দর্শন করিয়াছে। সাতবার শত্রুর সিংহনাদ, মহিলাগণের রোদনধ্বনি ও বধ্যমান হতভাগ্যগণের চীৎকারে এই নগর প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। পাহাড় ও যমুনার মধ্যস্থলে নূতন দিল্লী। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে বিস্তীর্ণ খাণ্ডবের বন ছিল, যাহা অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ দগ্ধ করিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপর দিয়া এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। কাশ্মীর গেটের বাহিরে অনেক স্থান ইংরেজেরা পাহাড়ে তোপ রাখিয়া ভগ্ন করিয়াছেন, তাহার পর পাহাড়ে উঠিতে বামদিকে দিল্লী দখলকারী সাহেবের কবর, তাহার পর লডলো ক্যাছল, যেখানে ২ নং ব্যাটারি বা কামান বসাইয়া ইংরেজেরা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর প্রবেশের পথ করেন। আর কিছু দূরে ডাইনদিকে মেটকাফের ভগ্নপুরী, বামদিকে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ ভাগে ফ্ল্যাগ, ষ্টাকটাউর বা ইংরেজদিগের পতাকা মন্দির, এই স্থানে বিদ্রোহকালে ইংরেজেরা আশ্রয় লইয়াছিলেন, মনোযোগ করিয়াছিলেন মিরট হইতে সাহায্য পাইবেন। তাহার বিপক্ষে পাহাড়ের উপর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি হিন্দু-

রাজের উৎকৃষ্ট বাটী। ইহার বাটীর নিকট একটী আশ্চর্য্য কূপ আছে, সিঁড়ি দিয়া তাহাতে নামা যায়। হিন্দুরাজার বাটীর নিকটে মিরাট হইতে আনীত ২২ হস্ত অশোক স্তম্ভ পাঁচ খণ্ড পড়িয়া আছে, যুদ্ধকালে ইংরেজদের সৈন্য পাহাড়ের উত্তর ছাউনীতে ছিল, পাহাড়ের সম্মুখস্থ এই সকল মাঠে দিল্লীর দরবার হইয়াছিল, পাহাড়ের নানা স্থান খুজিয়া দেখিলে নানা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠে যে যমুনার নহর দেখা যায়, ঐ নহর সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আছে।

অনন্তর প্রাচীন দিল্লী সহরের ভগ্নাবশেষ ও কুতব দেখিতে যাত্রা করিতে হইলে দিল্লী দরওজা হইয়া দিল্লীত্যাগ সুবিধা। এক পথ দিল্লী হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে হুমায়ুনের কবর ও তোগল্লকাবাদ হইয়া কুতব গিয়াছে। আর এক পথ দিল্লী হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে কুবত হইয়া তোগলকাবাদ গিয়াছে। কুবত হইতে তোকলকাবাদ ৫ মাইল পূর্ব্ব। তাজা দিল্লী দরজা হইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে প্রথমে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর উপর একটা প্রস্তর স্তম্ভ দেখা যায়। নাম ফেরোজ সার লাট, স্তম্ভটী লাল বালুকা প্রস্তরের। পৌনে সাতাইশ হাত উচ্চ ও গোড়ার বেড় প্রায় ৭ হাত ক্রমে কিছু সরু হইয়া উঠিয়াছে। এটী প্রথমে দিল্লীর ৯ ক্রোশ দূরে যমুনার পশ্চিম তীরে পর্ব্বতের নিকট ত্রস্ম বা বর্ত্তমান পাণ্ডী নামক স্থানে ছিল। ১৩৫৬ খৃঃ অব্দে ফেরোজ আনয়ন করেন। অশোক আপনার আজ্ঞা লিখিয়া এই সকল শিলাস্তম্ভ প্রোথিত করেন। শেষ ছত্রে লিখিয়াছেন। শিলাস্তম্ভে ও শিলাফলকে খোদিত আমার আজ্ঞা যেন চিরকাল বিদ্যমান থাকে। অক্ষর ও ভাষা পালি। অশোকের উপরে ও নিম্নে ১১৬৩ অব্দে চাহুমান বংশীয় বিশালের জয় প্রকাশ আছে। নিম্নে নানা সময়ের নানা লোকের নাম। ১৫২৪ অব্দে নাগরীতে ইব্রাহিম লোদী নিজ বিবরণ লেখাইয়াছেন। স্তম্ভের পর দিল্লীর দুই মাইল দূরে প্রাচীন পাঠানদিগের নির্ম্মিত পুরাণ কেল্লা। প্রত্যেক কোণে এক এক গোলাকার বুরুজ এবং প্রত্যেক দিকে এক এক দরজা। দরজার পার্শ্বে দুই দুই স্তম্ভ। তীর নিক্ষেপের জন্য তাহার মধ্যে মধ্যে ছিদ্র, ১৫৩৫ অব্দে হুমায়ুন ইহার সংস্কার করেন। এই স্থানের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, এখনও লোকে

পর্য্যন্ত যমুনা তীরে ধর্ম্মরাজের রাজধানী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবারণ্য পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং এই নগর পরিমাণ করেন। নূতন দিল্লীর উত্তর রেলওয়ে পুলের নিকট নিগমবোধ ঘাট। যেখানে ধর্ম্মরাজ রাজসূয় যজ্ঞকালে স্নান করিয়াছিলেন। এখন একটী মন্দির মাত্র আছে, সোম-বারে অমাবস্যা হইলে মেলা হইয়া থাকে। ফেরোজসাহ প্রাচীন ইন্দ্র-প্রস্থে ফেরোজাবাদ নির্ম্মাণ করেন এবং পাঠানেরা যুধিষ্ঠিরের কেল্লার উপর কেল্লা নির্ম্মাণ করে। তাহাই এই পুরাণ কেল্লা। যমুনা কালাঘরী হইতে হুমায়ুনের কালে পুরাণ কেল্লা ও ফেরোজের কোটিলার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল।

কেল্লা মধ্যে কিল্লাখানা মসজীদ ও সের মঞ্জিল। কিল্লাখানা মসজীদের গঠন ও খোদকারী চমৎকার। সের মঞ্জিল অতি উচ্চ অষ্টকোণ ও ত্রিতল বিশিষ্ট, আকবরের পিতা হুমায়ুনের পুস্তকালয় ছিল। এই স্থান হইতে পড়িয়া আঘাত পাওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার দেড় মাইল দক্ষিণে হুমায়ুনের কবর। কবর হর্ম্ম্য এক উচ্চ প্রাঙ্গনের উপর নির্ম্মিত। প্রাঙ্গন প্রতিদিকে ১৩৩ হাত লম্বা ও ১৬ হাত উচ্চ, প্রত্যেক পার্শ্বই খিলান বিশিষ্ট এবং উঠিবার জন্য চারিদিকে প্রস্তরের সিঁড়িতে শোভিত। কবর হর্ম্ম্যও বিলক্ষণ প্রশস্ত প্রায় ৬৬ হস্ত সমচতুষ্কোণ। ভিত্তি গাত্রে তিন প্রকাণ্ড খিলান, তন্মধ্যে মার্ব্বেল লাল-প্রস্তরে সজ্জিত দ্বার ও জানালা। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর মার্ব্বেল ও লাল-প্রস্তরের শোভা, উপরে এক প্রকাণ্ড মার্ব্বেল-গম্বুজ, তন্নিম্নে গোলাকার গৃহ মধ্যে হুমায়ুনের শ্বেত-মার্ব্বেল নির্ম্মিত কবর। এই গর্ভ গৃহের পার্শ্বে চারিটী অষ্টকোণ গৃহ। এতন্মধ্যে সম্রাটের মন্ত্রীদ্বয় ও পরিবারগণের কবর আছে। ভিত্তির পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠি-বার সিঁড়ি, উপর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত নানাবিধ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহারই পার্শ্বে সের সার দিল্লী ছিল।

তদনন্তর আকবরকা সরাই নামক গ্রাম। প্রবেশ কালেই প্রসিদ্ধ ৬৪ খাম্বা নামক গৃহ, সমস্তই শ্বেত-মার্ব্বেল নির্ম্মিত। ৬৪টী উৎকৃষ্ট সমচতুষ্কোণ খাম্বা আছে, তাহার মস্তক নানাবিধ খোদকারীতে পরিপূর্ণ, উপরে ২৫ খিলানা, তদুপরি উৎকৃষ্ট গম্বুজ, চারিদিকে মার্ব্বেল ছিল এখন বিনষ্ট প্রায়,

গৃহমধ্যে মার্ব্বেলাচ্ছাদিত কতকগুলি কবর, ইহারই একটীর মধ্যে আক-বরের পালক-পিতা আতাগাখাঁর পুত্র আজিত নিহিত আছে। কিছু দূর পশ্চিমে আরও কতকগুলি কবর ও একটী ক্ষুদ্র পরিষ্কার মার্ব্বেল নির্ম্মিত মসজিদ, চারিদিকে স্তম্ভ শ্রেণী, খোদকারী পূর্ণ খিলান, শীর্ষদেশে মার্ব্বেল গম্বুজ। ইহার মধ্যে নাজীমউদ্দীন নিহিত, নাজীম চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একজন সিদ্ধ ফকীর ছিলেন, এখনও মুসলমান যাত্রীরা কবর দর্শন করে। ইহারই নিকট শ্বেত-মার্ব্বেল নির্ম্মিত আর একটী উৎকৃষ্ট কবর গৃহ, দ্বিতীয় আকবর যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া স্বপুত্র জেহাঙ্গিরের ১৮৩২ অব্দে এই কবর নির্ম্মাণ করেন। বিদ্রোহসূচনা করাতে ব্রিটীশগবর্ণমেণ্ট ইহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই বাগবাহার লেখক খসরুর কবর আছে। ১৩৫৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, নিকটে মার্ব্বেল পর্দ্দা বেষ্টিত আরও অনেক কবর, একটীতে লিখিত আছে এই তৃণ মৃত্তিকাই জন্মদুঃখিনী, অনিত্যদেহা বীক্তি-শিষ্যা সাজেহান কন্যা জেহানার উপযুক্ত কবরাবরণ। জেহানারার উদ্যো-গেই দিল্লীর জুমামসজীদ হয়, এবং সাজেহান কারারুদ্ধ হইলে পিতার শুশ্রূষা জন্য জেহানারাও স্বয়ং কারাগার গমন করে। শুনা যায় সাজে-হানের মৃত্যুর পর দুরাত্মা আরংজেব এ নিরীহাকেও বিষদান করে। এই কবরস্থানের সন্নিকটে ৬০০ বর্ষ পুর্ব্বের তোগলক নির্ম্মিত মসজিদ, লোহিত প্রস্তরময় উপরে এক গম্বুজ, তদুপরি আরবী লিখিত, ইহার নিকটে এক প্রকাণ্ড বাউলী বা কূপ প্রায় ৪০ ফীট আয়ত, উপর হইতে জল পর্য্যন্ত ২৪ হাত এবং জলের গভীরতা ২৬ হাত, চারিদিকে হর্ম্ম্য থাকায় ইহার জল অত্যন্ত শীতল। পয়সার লোভে বালকেরা ইহার মধ্যে ঝম্প দেয় এবং উপরে উঠিয়া বকসিস প্রার্থনা করে।

আজমীর দরজা দিয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে বামে জয়পুররাজ জয়সিংহের যন্ত্রমন্ত্র। ইনি কাশীর মানমন্দিরেরন্যায় এখানেও এই গ্রহবেধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বৃহৎ হর্ম্ম্যটীর নাম সম্রাট যন্ত্র। এটী একটী প্রকাণ্ড শঙ্কু বা সূর্য্যঘটীকা। ইহার সমকোণের সম্মুখস্থ বাহু বা ভিত্তির পরিমাণ ১১৮ ফীট ৫ ইঞ্চি, ভুজ ১০৪ ফীট ও লম্বে ৫৬ ফীট। এক্ষণে ইহার ভগ্না-বস্থা। অনতিদূরে এই জাতীয় আর একটী হর্ম্ম্য। মধ্য দিয়া উপরি উঠি-

বার সিঁড়ি আছে। ইহার পার্শ্বের ভিত্তিগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তার্দ্ধ সমূহের লম্ব স্বরূপ। এতদ্দ্বারা দিল্লীর যাম্যোত্তর রেখার সহিত অপর স্থানের যাম্যোত্তর রেখার অন্তর জানা যাইত। বাহিরের পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ভিত্তি সকল অংশাদিতে বিভক্ত বৃত্তপাদের লম্বস্বরূপ হইয়াছে। অপর এক ভিত্তিদ্বারা চারি লম্ব সংযোজিত আছে। ইহারই উত্তরে গ্রহগণের প্রাত্যহিক উচ্চতা জানিবার জন্য চারিভাগে বিভক্ত একটী বৃত্তার্দ্ধ। সম্রাট যন্ত্রের দক্ষিণে একটী পূর্ব্বভাগে ও একটী পশ্চিমভাগে দুইদিকে দুইটী মাথা খোলা, গোলাকার গৃহ আছে, তাহার কেন্দ্র হইতে এক একটী স্তম্ভ উঠিয়াছে, স্তম্ভের মূল হইতে ত্রিশটী প্রস্তরের ব্যাসার্দ্ধ ভূমির সমান্তরাল ভাবে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ৬ অংশ। ব্যাসার্দ্ধ সমূহের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল যোজিত হইলে সাকল্যে ৩৬০ অংশ হইবে। ব্যাসার্দ্ধ ও তদন্তরের মধ্যবর্ত্তী ভাগে ভিত্তি গাত্রে পর্য্যবেক্ষণ ফল পড়িয়া লইবার জন্য রীতিমত স্থানে, চতুষ্কোণ ছিদ্র সমূহ আছে। প্রত্যেক অন্তরে দুইটী করিয়া জানালা বা খোলা স্থান ছিল। অন্তরে অগ্রভাগে সূর্য্যের উচ্চতায় জ্যাপিণ্ড জানিবার চিহ্ন আছে। স্তম্ভের ছায়া দ্বারা ১ হইতে ৪৫ অংশ পর্য্যন্ত জানিবার উপায় আছে, তদপেক্ষা অধিক হইলে ব্যাসার্দ্ধের অঙ্ক গণনা করিয়া ৯০ হইতে উচ্চতার বিয়োগ ফল জানা যাইত। অংশ সকল কলায় বিভক্ত আছে। ইহাতে ছায়া পড়িলে দিল্লীর যাম্যোত্তর রেখা হইতে সূর্য্যের Azimuth প্রাত্যহিক অবস্থিতি স্থানের অন্তর জানা যাইত। গ্রহ নক্ষত্রেরও এইরূপ করিয়া দেখা হইত।

চন্দ্রযন্ত্রের তিন মাইল দক্ষিণে ডাইনদিকে সফদরজঙ্গের কবর। ইনি ১৭৪৮ অব্দে দিল্লীর সম্রাট আহম্মদ সার উজীর ছিলেন। ইনিই অযোধ্যার সুবাদার বংশের আদি পুরুষ। ইহাঁর পুত্র এই কবর নির্ম্মাণ করে। প্রবেশদ্বার প্রশস্ত, ও উৎকৃষ্ট, প্রবেশ করিয়াই একটী বাগান, চারিদিকে লালপাথরের প্রাচীর। এখন লোকে সরাই করিয়া বাগানের দুরবস্থা করিয়াছে। এই উদ্যানের মধ্যে কবর হর্ম্ম্য, প্রতিদিকে প্রায় ৬৬ হাত লম্বা, চারিকোণে শীর্ষশোভিত চারিস্তম্ভ, মধ্যস্থলে এক মার্ব্বেল চবুতরা, তদুপরি

অতি উৎকৃষ্ট শ্বেতমার্ব্বেলের গম্বুজবিশিষ্ট কবর হর্ম্ম্য। ভিত্তিগুলি লাল পাথরের, কিন্তু খিলান সমূহ মার্ব্বেল মণ্ডিত। জানালা দুই সারি আছে। চারিদিকে চারিটী খিলান করা প্রবেশদ্বার। মধ্যে একটী প্রশস্ত ও চারিটী ক্ষুদ্র গৃহ। প্রশস্ত গৃহ মধ্যে খোদকারীতে পূর্ণ মার্ব্বেলের জবাব বা নকল কবর। নিম্নস্থানে বস্ত্র ও পুষ্পশোভিত মৃত্তিকার যথার্থ কবর।

কুতবের তিন মাইল দূরে রাস্তার বামদিকে খিরকীগ্রাম। ইহাতে কেল্লা ও একটী মসজীদ আছে। ফেরোজের উজীর খান দেহান ১৩৮০ অব্দে এই মসজীদ নির্ম্মাণ করেন। ইনি একজন তৈলঙ্গী হিন্দু। হিসার ও ফেরোজ-সারের জলের জন্য যমুনা ও শতদ্রুর খাল ইনিই খনন করিয়াছেন। খিরকীর মসজীদ অতি প্রকাণ্ড এবং উচ্চ ভূমির উপর সংস্থিত। সমস্তভাগ কৃষ্ণবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহটী দ্বিতল এবং চারিদিকে সমান। কোণের স্তম্ভগুলি ৩৩ হস্ত উচ্চ। উপরে ৮৯ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজ, নিম্নে খিলান করা ১০৪ টী প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ চারিদিকে ৬ হাত। দ্বারের ও চূড়ার নিম্নেও এক একটী প্রকোষ্ঠ আছে, সাকল্যে ১১২ প্রকোষ্ঠ। উপরে যাইতে তিনটী দ্বার আছে, উত্তরদিকেরটী কেবল এখন খোলা আছে।

ইহার পর বিখ্যাত কুতব মিনার, কুতবভূমি ও তন্নিকটস্থ স্থান সকল ভগ্নস্তূপ নিকুঞ্জবন ও লতাবিতান সুশোভিত। নূতন দিল্লী হইতে এই স্থান ১০ মাইল অন্তর। কুতবমিনার একটা প্রকাণ্ড উচ্চ স্তম্ভ, গোড়াটা মোটা, ক্রমে কিছু সরু হইয়া উঠিয়াছে। গোড়ার বেড় ৯৪ হাত ৮ আঙ্গুল, মাথার বেড় ১৮ হাত। গায়ে পাঁচতলায় পাঁচটী বারান্দা লাগান। বারান্দাগুলি সমান দূরে নাই, যত উপরে উঠিয়াছে ততই ক্রমে কাছাকাছি। স্তম্ভের প্রথমকার তিনতলা লালপাথরে গাঁথা, তদুপরি দুইতলায় মার্ব্বেল মিশ্রিত আছে। প্রথম তলার গাত্রে বড় বড় পারসী অক্ষরে ছয় ছত্র লেখা স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়াছে। ৬ষ্ঠ ছত্র কোরাণ তন্নিম্ন পঞ্চম ছত্র ঈশ্বরের ৯০ নাম, তন্নিম্নে চতুর্থ ছত্র কিম্মিয়া উদ্দীন আবুল মিজাফর মহম্মদ বেগশায়ের প্রশংসা, তন্নিম্নে কোরাণ, তন্নিম্নে ঐ বেগশায়ের প্রশংসা, তন্নিম্নে প্রথম ছত্রে আমীর উল ওমরা বই আর পড়া যায় না। স্তম্ভের দ্বিতীয় তলার উপর ২ ছত্র ও তৃতীয় তলের উপর এক ছত্র আছে, এতদ্ব্যং

তীত স্তম্ভের আমূলাগ্র গাত্রটী সমস্তই বিট কাটা। কুতবমিনার পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ। ১৭৯৩ অব্দে ইহার উচ্চতা ১৬৭ হাত ৮ অঙ্গুল ছিল, এখন উপরিকার মণ্ডলা ভাঙ্গিয়া পড়াতে ১৫৮ হাত ১৬ অঙ্গুল উচ্চ আছে। কুতবে উঠিবার জন্য ভিতরে ৩৭৯ টী সিঁড়ি আছে। কুতবের পত্তন ১।০ হাত তদুপরি প্রথমতলা প্রায় ৬৩ হাত দ্বিতীয়তলা ৩৪ হাত তৃতীয়তলা ২৭ হাত চতুর্থতলা ১৭ হাত পঞ্চমতলা ১৫ হাত ও তদুপরি ভগ্নভাগ ১।০ হাত উচ্চ। কুতবের উপর উঠিবার জন্য ভিতর দিয়া ৩৭৯ সিঁড়ি আছে। স্তম্ভের প্রবেশ দ্বারে লেখা আছে যে সুলতান সমসউদ্দীন আলতামসের স্তম্ভ জখমী হইলে বেহলদ পুত্র সেকেন্দর সার রাজ্যকালে খাসখাঁর পুত্র ফত্তা খাঁ ইহা হিজরী ৯০৯ অর্থাৎ ইংরেজি ১৫০৩ অব্দে সংস্কার করিলেন। দ্বিতীয় তলের দ্বারে লিখিত আছে আলতামস এই স্তম্ভ সম্পূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তন্নিম্ন ছত্রে আলতামসের প্রশংসা, তন্নিম্নে শুক্রবারে ভজনাজন্য কোরাণের আদেশ, তৃতীয়তলের দ্বারে আলতামসের প্রশংসা। চতুর্থতলের দ্বারে আছে আলতামসের রাজ্যকালে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করা হইয়াছিল, পঞ্চমতলের দ্বারে আছে এই স্তম্ভ বজ্রাহত হইলে সম্রাট ফেরোজ সাহ ৭৭০ হিজরী অর্থাৎ ১৩৬৮ খৃঃ অব্দে সংস্কার করান। ইংরেজদের সময়ে ১৮০৩ অব্দের ১লা আগষ্টে ভয়ানক ভূমিকম্পে কুতবের মাথা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং স্তম্ভ জখম হয়। পরে ১৮২৮ অব্দে ইনজিনিয়ার রবার্ট স্মিথ সাহেব ১৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার সংস্কার করেন। চারিদিকের ভাঙ্গা ইমারত পরিষ্কার করিতে আরও পাঁচ হাজার টাকা লাগিয়াছিল। কুতব কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে নানা মতামত আছে, কেহ বলেন, কোন ফকীর আলতামসের সন্তান হইবে বলেন, তাঁহার মান্যার্থে আলতামস ৪০ বর্ষে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেহ বলেন পৃথ্বী-রাজকন্যা উপরে উঠিয়া প্রত্যহ যমুনা-দর্শন ও ঈশ্বর উপাসনার জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়। কেহ বলেন, সুলতান সমসউদ্দীন স্বীয় জয়ের স্মরণার্থ এক মসজীদ নির্ম্মাণ মনস্থ করেন, তাহারই দরজায় একটা স্তম্ভ, অপরটী নির্ম্মিত হইতেছিল, কিন্তু অপরটা ইহার যোড়া হইতেছিল কি করিয়া বলা যাইবে। কুতবের

২৮০ হাত উত্তরে একটী আছে। ইহার বেড় কুতবের দ্বিগুণ এবং এখন ২৬ হাত উচ্চ। মুসলমানেরা যোড়া এত মিলাইয়া করে যে চেনা ভার। যাহা হউক কুতব হিন্দু কি মুসলমানের নির্ম্মিত তদ্বিষয়ে অনেক মতামত আছে। এখনও শ্রীযুক্ত কনিংহাম ও শ্রীযুক্ত বেগলার সাহেবে বিবাদ ভঞ্জন হয় নাই।

কুতবমিনার পার্শ্বেই কুতব উদ্দীনের জমা মসজীদ। ১১৯৩ অব্দে পৃথুকে জয় করিয়া ২৭টী হিন্দু মন্দির ভগ্ন করিয়া কুতবউদ্দীন তিন বৎসরে এই মসজীদ নির্ম্মাণ করেন। মসজীদের সম্মুখের ভিত্তির বেধ ৫।০ হাত। তাহার ৭টী খিলানবিশিষ্ট দরজা। মধ্যকার দরজাটী পৌনে পনর হাত বিস্তৃত ও ৩৫।০ হাত উচ্চ। পার্শ্বের দরজাগুলি ৬।০ হাত বিস্তৃত ও ১৬ হাত উচ্চ। এই দ্বার দিয়া প্রথমে দিল্লীর মুসলমানেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম মসজীদে প্রবেশ করে। মসজীদ ঘর ৯০ হাত লম্বা ২০৸০ হাত বিস্তৃত ও দেখিতে জমকাল। ঘরে পাঁচটী অতি রমণীয় উচ্চ স্তম্ভ আছে। সমস্ত গুলিই হিন্দু মন্দিরের স্তম্ভ। প্রাঙ্গন চারিদিকে ঘেরা, পূর্ব্ব পশ্চিমে ৯৬ হাত ও উত্তর দক্ষিণে ৬৪ হাত প্রশস্ত। এই প্রাঙ্গনের পশ্চিমার্দ্ধে বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ ১৪॥০ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভটী কৃষ্ণবর্ণ, বোধ হয় অষ্টধাতু নির্ম্মিত, ইহার বেড় পৌনে তিন হাত। ৪২ হাত খুঁড়িয়াও ইহার তলা পাওয়া যায় নাই। ইংরাজেরা আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে, এত বড় থাম কিরূপে নির্ম্মাণ করিল এবং কি রূপেই বা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিল। নাদীর সাহা এই স্তম্ভটী ভগ্ন করিবার জন্য কয়েকটী গোলা মারিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহার দাগ আছে। লোকে বলে রাজা চির-স্থায়ী করিবার জন্য বেলামবের যজ্ঞ করিয়া বাসুকী মস্তক পর্য্যন্ত এই যুপ সংস্থাপন করেন। পরে মস্তকপর্য্যন্ত যায় নাই সন্দেহ করিয়া পুনর্ব্বার উৎপাত করিয়া দেখিলেন, বাসুকীর মস্তকের রক্ত রহিয়াছে। তাহার পর আর সম্পূর্ণরূপ বসিল না। ১৪॥০ হস্ত উচ্চ হইয়া রহিল। পূজারার ও ইভান লিখিয়াছেন যে, বিশাখানক্ষত্রে কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে ৭৯২ সম্বতে চন্দ্র অভিজিৎ গত হইলে তোমররাজ রাজা রক্ষার্থ ইহা প্রোথিত

করেন। স্তম্ভগাত্রে ১১০৯ সম্বতে অনঙ্গপাল, ১৮৮৩ সম্বতে পৃথ্বীরাজের উনত্রিংশ পুরুষ বোহন ছত্রসিংহ ইত্যাদির নাম খোদিত আছে।

লৌহস্তম্ভের নিকট প্রাঙ্গন মধ্যে হিন্দুদিগের আরও কতকগুলি প্রাচীন স্তম্ভ আছে। ইহাদের গঠন প্রণালী ও খোদকারী অতি চমৎকার। প্রাঙ্গন প্রবেশ করিবার তিনটী দ্বার আছে। পূর্ব্বদিকের দ্বারই প্রধান, দক্ষিণের দ্বারটী বিনষ্ট হইয়াছে। কুতবজামাতা আলতামস এই প্রাঙ্গনের উত্তর দক্ষিণ পার্শ্ব বৃদ্ধি করেন, এবং প্রথম প্রাঙ্গন অপেক্ষা ছয় গুণ বিস্তৃত আর এক প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কুতববাটীর উত্তর পশ্চিমে ১২৩৬ খৃঃ অব্দে মৃত সম্রাট আলতামসের কবর গৃহ। গৃহের অভ্যন্তর ভাগ ২০ হাত প্রশস্ত ও উত্তমরূপ সজ্জিত। নিকটেই দক্ষিণ পশ্চিমে খিলিজীবংশীয় তৃতীয় সম্রাট আলাউদ্দীনের বাটী। ইনিই সর্ব্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠন করেন এবং আপনাকে গর্ব্ব করিয়া দ্বিতীয় সেকেন্দর বলিতেন। বাটীর দরজাটী প্রকাণ্ড। আরবীতে দুই তিন দরজায় সেকেন্দর ছানি পদবী সহ আলাউদ্দীনের নাম লেখা আছে। তারিখ হিজরী ৭১০ বা খৃঃ ১৩১০। প্রধান হর্ম্যটী সমচতুষ্কোণ, অভ্যন্তরভাগ ২৩ হাত প্রশস্ত, বহির্ভাগ ৩৭॥০ হাত ও ভিত্তির বেধ ৭।০ হাত। প্রতিপার্শ্বে এক এক উচ্চ খিলান দ্বার। খিলান ঘোড়াখুরে বাহিরের কিনারা ঘসা। অভ্যন্তরে পতর আঁটার ন্যায়, কোণ, কোলঙ্গান ন্যায় খাঁজকাটা প্রতি কোণে দুই জনালা, কিন্তু মার্ব্বেলের জাফরীতে আবৃত। বাহিরের ভিত্তি মার্ব্বেলের পতরবিশিষ্ট দেখিতে অতি সুন্দর। উপরে মার্ব্বেলের অর্দ্ধবৃত্তাকার গম্বুজ, এই হর্ম্যটী খিলিজি পাঠানের আদর্শ স্বরূপ। ঘোড়াখুরে খিলানবিশিষ্ট এইরূপ হর্ম্য ১২৯০ অবধি ১৩২০ পর্য্যন্ত খিলিজীকালে নির্ম্মিত হয়।

আলিদরজার নিকটে ইমামজামিনার কবর, কুতবের দক্ষিণ পশ্চিমে আকবরের পালক-পিতার বধকারী আডাম খাঁর কবর, কুতবের নিকট বেলে পাথরের গাঁথা কতকগুলি আশ্চর্য্য রকম কূপ আছে। মিরোলি গ্রামের কূপ প্রায় ৫৫ হাত গভীর, বালকেরা সামান্য পুরস্কারের লোভে তাহাতে লাফ দিয়া পড়ে। এই গ্রামে কতকগুলি মার্ব্বেল-প্রস্তরমণ্ডিত সুন্দর কবর

আছে। নিকটে মেটকাফ হাউস, এটি আকবরের বাল্যকালের পালনকারী আতাগা মহম্মদ খাঁর কবর। দিল্লীর শেষ সম্রাটের রেসিডেণ্ট মেটকাফ সাহেব লইয়া আপনার কুঠী করেন। কুতব ভূমির উত্তর পশ্চিমে ১০৬০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল নির্ম্মিত লালকট নামক দুর্গ, বেড় ২৷৷০ মাইল, ভারতের শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরাজ ইহাতে বাস করিতেন। কেবল গৃহবিচ্ছেদে সেই বীর ১১৯৩ অব্দে মহম্মদ ষেণ শাম বা ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিহত হইলেন। কুতবের নিকট ইহাঁর কুলদেবতা মায়া দেবীর মন্দির। এখন একটী সিন্দুর দেওয়া ভগ্নঠাকুর, দুর্গের ভিত্তিমূল অত্যন্ত দৃঢ় এবং ভগ্নাবস্থাতেও ভয়াবহ, ইহার বাহিরে ৪ মাইল আবৃত্ত করিয়া আর এক দুর্গের ভিত্তি ইহারই অভ্যন্তরে পৃথুর রাজধানী প্রাচীন দিল্লী ছিল।

কুতবের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে তোগলকাবাদ। তোগলক বংশের দ্বিতীয় রাজা অর্দ্ধোমত্ত তোগলক এই নগর নির্ম্মাণ করেন, সহরটী ষট্‌কোণ ক্ষেত্রের অর্দ্ধভাগের মত ছিল। তিন বাহু প্রত্যেকে প্রায় পৌনে এক মাইল লম্বা। চতুর্থবাহু দেড় মাইল। বেড় কিঞ্চিদূন চারি মাইল। কেল্লা পাহাড়ের উপর সংস্থিত, প্রাচীরের পাথর এত বড় যে বোধ হয় ঐ পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া ছিল। এক এক পাথর ৯ হাত লম্বা ১৷৷০ হাত চৌড়া এক হাত ৫ অঙ্গুল পুরু ও প্রায় ১৮০ মণ ভারী। উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বে গভীর পরিখা। এবং প্রশস্ত দক্ষিণদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি। এই পাহাড়ের উপর দিকের প্রধান প্রাচীর ২৬ হাত উচ্চ, তাহার অগ্রভাগে ৫ হাত উচ্চ এবং তাহার পশ্চাতে ১০ হাত উচ্চ আর এক প্রাচীর। ভূমি হইতে প্রাচীরের অগ্রভাগ ৬০ হাত উচ্চ হইবে। এই দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সহরের বড় ভাগের ভাগ আবৃত্ত করিয়া রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ। দুর্গ প্রাচীরের পার্শ্বে রক্ষাকারী সৈন্যদের ছোট ছোট ঘর। ভিত্তির মধ্য দিয়া আলো যাইবার এবং উপরিভাগ দিয়া তীর চলিবার ছিদ্র আছে। প্রাচীর অভ্যন্তরের দিকে ক্রমে ঢাল হইয়াছে। তোগলক পাঠানদের নির্ম্মিত প্রাচীন প্রাচীর মাত্রই ঢাল। কেল্লার ১৩ দরজা ও রাজবাটীর তিন দরজা দেখা যায়। প্রাচীন সহরের অবশেষের মধ্যে ৭টী পুষ্করিণী জমামসজীদ ও বীরাজ মন্দির প্রভৃতি কয়েকটী ভগ্ন দেখা যায়।

ফেরোজপুরের মধ্য দিয়া হুমায়ুনের কেল্লার দক্ষিণে গিয়া প্রথম দিনের পথ ধরে।

দিল্লী প্রথমে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। তাহার পর লৌহস্তম্ভে ধব রাজার নাম খোদিত দেখা যায়। বিক্রমাদিত্যের পর হইতে প্রায় ৭০০ বর্ষ শূন্য থাকে। ইহার পর কান্যকুব্জ হইতে পৃথুবংশীয়েরা গিয়া রাজধানী করেন। তদনন্তর মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। দিল্লী হইতে এক রেল দক্ষিণমুখে ভরতপুরে গিয়া জয়পুর রেলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

দিল্লীর আচার, কালাবতুর কাজ, স্বর্ণালঙ্কার, গজদন্তের দ্রব্য, মৃত্তিকা-দ্রব্য, সূইকার দ্রব্য, গুড়গুড়ির নল উত্তম।

দিল্লী হইতে পেশোয়ার।

আমরা দিল্লী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। গাড়ীর বেগের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের পর গৃহ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে যে শেষাংশ লক্ষিত হইতেছিল তাহাও দিক্‌প্রান্তে বিলীন হইয়া গেল। দিল্লীর আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল নিবিড় বৃক্ষ ও নীলবর্ণ আকাশ। কিয়ৎকাল পরে পুনরায় গাজীয়াবাদে উপস্থিত। গাজিয়াবাদ পার হইয়া ট্রেন উত্তর মুখে মিরটের দিকে চলিতে লাগিল। আমরাও ক্রমে অন্তর্বেদীর উচ্চ বিভাগে আরোহণ করিতে লাগিলাম। উভয় পার্শ্বের ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা। বর্ষাকালে যে সকল ক্ষেত্র প্রচুর নীলপ্রসব করিয়াছিল তাহাই এক্ষণে গোধূমের হরিত-শোভা বিস্তার করিয়াছে। স্থানের জল বায়ু এরূপ উৎকৃষ্ট যে, কি গ্রীষ্ম কি সব উত্তর মণ্ডলের শস্যাদিই ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যেন ইংলণ্ড ও ভারত একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। অধিবাসীরা সকলেই বলিষ্ঠ, সকলেই প্রফুল্ল-চিত্ত। এই মাঠের মধ্য দিয়া হস্তিনা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের বিস্তীর্ণ পথ ছিল। কতবার শুকদেব এই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সকল স্মরণ করিতে করিতে আমরা মিরট ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। মিরট নগরের চারিদিকে ভগ্নপ্রাচীর। অভ্যন্তরে প্রায় ৪০ হাজার লোকের বাস। বিদ্রোহের পর

ইহার শোভা বিনষ্ট হইয়াছে। সহরের এক ক্রোশ উত্তরে ছাউনী, আমরা ছাউনী দেখিতে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে পবিত্র লক্ষণ সকল দেখিয়া ঋষিদের আশ্রম বোধ হইত। এক্ষণে উপরে চিল শকুনি উড়িতেছে, নিম্নে কুকুর শব্দ করিতেছে, চারিদিকে খানার দুর্গন্ধ উঠিতেছে, ভিস্তী ও খানসামা দৌড়া-দৌড়ী করিতেছে, সুসজ্জিত বৃক্ষ আছে কিন্তু গুলির ভয়ে উৎকৃষ্ট পক্ষীয়ার নাই, এই সকল দেখিয়া বোধ হইল ইংরেজদের আবাসের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। মিরট ছাউনী প্রকাণ্ড সেনানিবেশ স্থান ও যুদ্ধসম্পর্কীয় সরঞ্জামে পূর্ণ, রয়েল হরস্ আরটিলরির চিহ্ন সকল চারিদিকে লক্ষিত হইতে লাগিল। এখানকার গির্জ্জা অতি প্রকাণ্ড। গঙ্গাখালের ইঞ্জিনিয়ার এই স্থানেই অবস্থিতি করেন। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সর্ব্ব প্রথমে মিরটেই হইয়াছিল।

মিরটের ২৫ মাইল ঈশান কোণে গঙ্গার ডাইনতটে সুপ্রসিদ্ধ হস্তিনা নগর। হস্তিনার মাঠ দৃষ্টিপথে পতিতমাত্র মহাভারতের সেই ধুমধাম স্মৃতিপথে উদিত হইল। হায় রে কাল! আজ সে সকল কোথায় গেল! আজ কেন হস্তিনার সে কোলাহল কর্ণগোচর হয় না। আহা! এই স্থানে বসিয়া নিরীহ যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিবার জন্য দুর্য্যোধনেরা কত মন্ত্রণা করিয়াছিল। সেই পরাৎপর ব্যাকুল হৃদয়ে এই স্থানে সন্ধিজন্য কত উদ্যোগ করিয়াছিলেন। যে নগরের জন্য এত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছিল, আজ একটা শৃগালও সে স্থান প্রার্থনা করে না। আজ সে হস্তিনায় ঐ মন্দির এই বল্মীক ও দূরে গঙ্গা ব্যতীত আর কি আছে? যুধিষ্ঠিরের পঞ্চ পুরুষ পরেই গঙ্গা হস্তিনা গ্রাস করেন।

যাহা হউক মিরট ছাউনী পার হইয়া সরধন ষ্টেসন। বেগম সোমরের প্রপৌত্রের কবর ও এক প্রকাণ্ড গির্জ্জা এই স্থান শোভিত করিয়াছে। মহ-ম্মদ বংশোদ্ভব বেগম জর্মান সেনাপতি রিনহার্ড বা সোমরুকে বিবাহ করিয়া ধনশালী হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সরধনে রাজধানী করিয়া মহারাষ্ট্রীর সঙ্গে যোগ দিয়া আসেয়ের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ইংরেজদের সহ সন্ধি করেন। রোমান কাথলিক বেগম প্রকাণ্ড গির্জ্জা করিয়া ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইটালীতে নির্মিত মসৃণ সব প্রস্তরমূর্ত্তি তথায় স্থাপন করিয়া গিয়া-

শিবমূর্ত্তি ও ষাঁড়। তাহার পর দক্ষিণে মায়াপুর। মায়াপুরের দক্ষিণ হইতে গঙ্গাখাল দক্ষিণ পশ্চিমে কতকটা গিয়াছে। খালে ভতনা নদীর মুখ। এই স্থানে নারায়ণ শিলা মন্দির। মন্দিরের এক একখান ইট চারি দিকে অর্দ্ধ হস্ত ও তিন অঙ্গুল পুরু। নিকটে ৫০০ হাত সমচতুষ্কোণ বেণ কেল্লা। এ সকল দেখিতে ইচ্ছা না হইলে মায়াপুরের দক্ষিণে খাল আরম্ভের স্থানে খাল পার হইয়া কিছু দূর দক্ষিণে যাইবে। সেখানে পূর্ব্বোক্ত চরা বা দ্বীপের শেষে পূর্ব্বদিকের ধারা হইতে একধারা আসিয়া পশ্চিম ধারায় মিলিত হইয়াছে। মিলন স্থানে জলের বিস্তার দুই সহস্র হাত। ইহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ কনখল তীর্থ। এই স্থানে শিব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। এখানে সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব আছেন। প্রাচীন মন্দির বটবৃক্ষে ভগ্ন হওয়ায় নূতন মন্দির ১৭৭০ শকে নির্ম্মিত হইয়াছে। অভ্যন্তরে এক নেপাল প্রদত্ত ঘণ্টা। বিষ্ণুপদ ঘাট হইতে কনখল পর্য্যন্ত দেড় ক্রোশ পথ। হরিদ্বারস্থ হিমালয়ের নাম শিবালিক পর্ব্বত, পুরাণে ইহারই নাম কনখল শ্রেণী। কনখল পর্ব্বতের উপর দেখিবার অনেক গুলি বিষয় আছে। যাত্রীরা সচরাচর যে পর্ব্বতে উঠে তাহার পূর্ব্ব হরিদ্বারের দিকে ঢালু। কিন্তু আলগা মাটি ও প্রস্তরখণ্ড থাকায় সাবধানে উঠিতে হয়। পর্ব্বতের উপর বেদী মধ্যে ৯ হাত উচ্চ এক প্রস্তরত্রিশূল প্রোথিত আছে। শূলের উপর চন্দ্র সূর্য্যমূর্ত্তি ও শূলদণ্ডে গণেশ। নিম্নভাগে পূর্ব্বদিকে কালিকা দেবী ও পশ্চিমে হনুমান মূর্ত্তি। শীতকালে হরিদ্বারে বড় শীত ও বরফ পড়ে। এত শীত যে লোহার জিনিস কিছুকাল স্পর্শ করিলে হাত জ্বালা করে। চৈত্রসংক্রান্তিতে স্নানের কাল। দ্বাদশ বর্ষান্তে বৃহস্পতি কুম্ভরাশি প্রবেশ করিলে বড় মেলা হয়। ১৭৮৮ ও ১৮০০ ইত্যাদি সালে মেলা হইয়াছিল। মেলার সময় সন্ন্যাসীর বড় গোল। গবর্ণমেণ্ট সৈন্যসহ সতর্ক থাকেন। ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও [illegible] আখড়াধারে সন্ন্যাসীগণ বিভক্ত হইয়া বাস করে। যখন [illegible] উৎসবে মত্ত ও শিরে জুটাবন্ধিত দীর্ঘকেশ কতক জটাধারী, কতক উদাস, খাকী, মাধ্বাচারী, রামানুজী, নানা আদি ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়গণ বর্শা ছুরি, চামর ও পতাকাদি লইয়া দলে দলে ডঙ্কা পার্শ্বে চীৎকার করিতে করিতে

হরিদ্বারের অপ্রশস্ত পথদিয়া বিষ্ণুপদ ঘাটে গমন করিতে থাকে ও যখন উভয় পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের সহিত রক্ষকগণ সাবধানের শব্দ করিতে থাকে তখন মনে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। কতকগুলা হরে হরে বম বম করিতে করিতে গিয়া জলে পড়িল। তাহার পর আর এক দল হরে নারায়ণ হরে নারায়ণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। আর এক দল জয় শিব শম্ভো জয় শিব শম্ভো করিয়া আসিতে লাগিল। প্রায় সন্ধ্যাপর্য্যন্ত এইরূপ ভীড় থাকে। হরিদ্বারের নিকট মাঠ ও পর্ব্বত না থাকিলে এই সকল অসংখ্য সৈনিক ও সন্ন্যাসীর বাসস্থান পাওয়া ভার হইত।

গঙ্গাদ্বারে প্রায় ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন মধ্যবার নগর। পৃথু-রাজের প্রস্তর নির্ম্মিত দেবালয় ভগ্ন করিয়া একজন ঘোরী সুলতান বর্ত্তমান জমামসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। এখনকার অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত পিরানি তলাও বৌদ্ধদের বিমলমিত্রের সরোবর ছিল। হোয়ানথসঙ্গের সময়ে এখানে বৌদ্ধদের দ্বাদশ ও ব্রাহ্মণদের পঞ্চাশৎ মন্দির ছিল। মধ্যবারের দুই মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ 'মালিনী' নদী। যাহার তীরে কণ্বের আশ্রম ছিল এবং যেখানে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পতিলাভ করেন। মালিনীর তীরে এখনও চক্রবাক ডাকে, কিন্তু আর সে শকুন্তলা নাই।

সাহরনপুর হইতে লোকে মসৌরি ও লাণ্ডর যায়। ৪৮ মাইল দূরে পর্ব্বত প্রান্তে রাজপুর পর্য্যন্ত লোক প্রতি অমনিবস গাড়ীভাড়া এগার টাকা। পথে শাল জঙ্গলপূরিত দেশ মধ্যে ডেহারা। এখান হইতে গঙ্গা ও যমুনার লীলা দেখিতে বড় সুন্দর, উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থ সমতল ক্ষেত্রের নাম দুন বলিয়া লোকে এই ভাগকে দেরাদুন কহে। ডেহারা শীকদের গুরুদ্বারা। হিমালয়ের নিকট ২,৪০০ ফীট ঊর্দ্ধে সংস্থিত বলিয়া এখানে গ্রীষ্ম ও শীতপ্রধান উভয় দেশের শস্যাদি উৎপন্ন হয়। চাও জন্মিয়া থাকে। দেহারার ৬ মাইল পর রাজপুর। রাজপুর হইতে লাণ্ডর ১৭ মাইল। মসৌরি ও লাণ্ডর বরফমণ্ডিত হিমালয়ের সান্নিধ্যে ৬ হাজার ফীট উচ্চ পর্ব্বতোপরি ইংরেজসৈন্যগণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। পাহাড়ের গভীর খাদের উপর পর্ব্বতপ্রান্তে মসলা জমাট করিয়া ইহার

অনেক ভাগ নির্ম্মিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে উন্মত্ত ব্রিটিশ সৈন্য ও যৌবনোন্মত্তা ব্রিটিশ কামিনীরা তথায় অবলীলাক্রমে রঙ্গ রস করিয়া বেড়ায়।

এই সকল দেখিয়া সারনপুরে ফিরিবে। সারনপুর পার হইয়া সিরসা ষ্টেসন। পাঁচ মাইল দূরে ৭৩ হাত অন্তর ২৪ খণ্ডবিশিষ্ট যমুনার আর এক পুল। পুলের ইষ্টকস্তম্ভ সকল জল হইতে ৩০।৩২ হাত নিম্নে প্রোথিত। এখানহইতে হিমবানের রূপ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। দর্শক দূরবীক্ষণ ধারণ কর, আমি গিরি সকলের পরিচয় দিব। মুজঃফর নগর হইতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছ এবং লুধিয়ানা পর্য্যন্ত দেখিবে। সম্মুখে ঐ যে গিরি দেখিতেছ, যাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে, উহাই মসৌরি ও লাণ্ডরের পাহাড়। উহার ডাইনদিকে পশ্চাতে যে সকল শিখর রহিয়াছে, ঐ গুলি সুসী ও ডেরালিতে গঙ্গার ডাইনতটে অবস্থিত। ঐ সকল গিরি হইতে গঙ্গা ঝঙ্কার দিয়া পতিত হইতেছে। ঐ গিরির নিকটই ভাগীরথী ও জাহ্নবীর ভয়াবহ সঙ্গম। প্রথমে শ্রীকণ্ঠ, তৎপার্শ্বে শিব-মুক্ষ, তৎপার্শ্বে রুদ্র হিমালয় ও তদনন্তর গঙ্গোত্রী শৃঙ্গ। গঙ্গোত্রীর ৫ ক্রোশ দূরে গোমুখাকৃতি বরফগুহা হইতে ভাগীরথী নির্গত হইতেছে। বামে কেদারকণ্ঠ ও তৎপশ্চাতে যমুনোত্রী শিখর। তথায় আশ্চর্য্য উষ্ণ-প্রস্রবণ দিবানিশি প্রধূমিত হইতেছে। উহার তাপে বিগলিত বরফ যমুনারূপে উদ্ভূত হইতেছে। ঐ সকল শৃঙ্গ পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার ফীট উচ্চ। উহার উপরে প্রাণীর নাম মাত্র নাই। কেবল এক আকাশ ও ঐশীভাব বিরাজ করিতেছে। ২০ হাজার ফীটের উর্দ্ধে আর মনুষ্য উঠিতে পারে না। নিশ্বাস আকর্ষণ অসাধ্য হয়। এদিকে পুলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমরা যমুনাপুল পার হইলাম। যমুনাপুল হইতে শতদ্রুপর্য্যন্ত হিমালয় নিঃসৃত নদী সকল পার হইতে বিস্তর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮০ ফীট অন্তর ২ খণ্ডে একটী নামহীন নদী ও সরস্বতী, তিনখণ্ডে চিত্রি লুধিয়ানা ও বুধর, ৬ খণ্ডে তাংরি এবং ৮ খণ্ডে দৃশদ্বতী বা ঘাগর ও ১১১ ফীট অন্তর একাদশ খণ্ডে নির্ম্মিত মার্কণ্ডা এই কয়েকটী নদীর সেতু প্রধান। জল হইতে ২০।২৫ ফীট নিম্নপর্য্যন্ত স্তম্ভ প্রোথিত আছে। যাহা হউক আমরা যমুনা পার হইয়া কয়ে

পরে পঞ্জাব মুখে সেনানিবেশ স্থান অম্বালায় পঁহুছিলাম। অম্বালার মাটি সকল উর্ব্বর ও শস্যশালী, কিন্তু গ্রীষ্মকালের ঘোর গ্রীষ্মে ভূমি বিদগ্ধ হইতে থাকে। সহর জনপূর্ণ, প্রাচীর বেষ্টিত ও সংকীর্ণ পথশালী. কেল্লা সহরের উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। অম্বালা হইতে উত্তরে শিমলা ও দক্ষিণে কুরুক্ষেত্রের পথ।

আমরা অম্বালা হইতে ছয় ঘণ্টায় ডাকগাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বর পঁহুছিলাম। স্থানুতীর্থ হইতে থানেশ্বর নাম হইয়াছে। পথিতে স্থানে স্থানে আমের নিকুঞ্জ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে কাঁটাল গাছ নাই। আম্রও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। পানও দুর্ম্মূল্য। প্রাচীন থানেশ্বর নগর সম ভূমি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারই উপরে বর্ত্তমান পল্লী নির্ম্মিত। থানেশ্বরের নিকটে কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী প্রকাণ্ড সরোবর। তাহার চারিদিক বাঁধান ও সোপানবিশিষ্ট। সরোবরটী পূর্ব্ব পশ্চিমে ২০৬৪ হাত দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ১২৬৬ হাত প্রশস্ত। মধ্য-স্থলে ৬০৬ হাত বিস্তীর্ণ একটী চতুষ্কোণ দ্বীপ। উত্তর দক্ষিণ হইতে ১৮ হাত বিস্তৃত দুই ভাগ সেতু ইহার দুইদিক স্পর্শ করিয়াছে। দ্বীপের চারিপার্শ্ব প্রাচীরাবৃত ও তন্মধ্যে পশ্চিম বিভাগে চন্দ্রকূপ, এই সরোবর মহাতীর্থ। সূর্য্যগ্রহণে বিস্তর যাত্রী স্নান ও তীরে শ্রাদ্ধ করে। আকবরের কালে বীরবল ইহার চতুর্দ্দিক গ্রথিত করেন। আরংজেব ইহার অনেক বিনষ্ট করিয়াছে এবং দ্বীপ হইতে স্নানের যাত্রীগণকে গুলি করিতে আদেশ দিয়াছিল। সরোবর হইতে উত্তর ও পরে পশ্চিমে গমন করিলে তিনটী পথ মিলিত দেখা যায়। বামের পথ কৈথলে, মধ্যের পথ পৃথূদকে এবং ডাহিনের পথ সরস্বতীর আয়ুজস ঘাটে গিয়াছে। সরস্বতী শুষ্কপ্রায় জল নিতান্ত অল্প। অতিস্রোতা সরস্বতী অবলম্বন করিয়া গমন করিলে আয়ুজসের উত্তরে অস্থি-পুর পাওয়া যায়। ৬৩৪ খৃঃ অব্দে হোয়ানথসং এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অস্থি দেখিয়া গিয়াছেন। অস্থিপুরের উত্তরে পাণ্ডুদের পানার্থ ক্ষীরবাস ঘাট, তদনন্তর বিখ্যাত স্থানুতীর্থ, তৎপরে গঙ্গাতীর্থ ইত্যাদি আয়ুজস ঘাট হইতে থানেশ্বরের উত্তর পূর্ব্বে রত্নযক্ষ পর্য্যন্ত ৫ মাইল মধ্যে ৯১ তীর্থ। চক্রতীর্থের মধ্যস্থ প্রকাণ্ড বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি গজনবী ভগ্ন করিয়াছে। সরোবরের উত্তরে

অম্বালা রাস্তার পার্শ্বে দিলীপগড়ের সমস্ত হিন্দুকীর্ত্তি নষ্ট করিয়া মুসলমানেরা মাদ্রাসা প্রস্তর মসজীদ, সৈয়দ জেলালী ও জমামসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

সরোবরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে আমীনা বা অভিমন্যু বধের স্থান। কিছুদূর দক্ষিণে পাণ্ডারা স্যমন্ত পঞ্চকের আর চারি হ্রদ দেখাইয়া দেয়। সরোবরের এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কর্ণগড়। ইহার ভিত্তি নিম্নে৫৩৩ হাত ও উপরে ৩৩৩ হাত লম্বা। ভিত্তির উচ্চতা ২৬ হাত। মধ্যস্থলে ৩৬ হাত গভীর ও ২৬ হাত বেষ্টন এক শুষ্ক কূপ। নিকটে কুরুধ্বজ তীর্থ ও ভগ্ন মন্দিরাদি। ইহার ইট অতি প্রশস্ত। কুরুক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। মনুমতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত। দৃশদ্বতী বর্ত্তমান ঘাগর। মহাভারতে লিখিত আছে যে, তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও সমচক্রুক মধ্যে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ পিতামহের উত্তর বেদী। ঝিন্দের রাজা বলেন,'রামহ্রদ এমত পবিত্র স্থান অবশ্যই আমার রাজ্য মধ্যে আছে। এইরূপে রাজা ও পাণ্ডারা স্বমত স্থাপন করিতে গিয়া সমস্তই গোল করিয়াছে। অরন্তুক একমতে উত্তর পশ্চিম কোণে পিহোর দুই ক্রোশ পশ্চিম। মতান্তরে ইহারই নাম বহর যক্ষ। ইহা সরস্বতী তটে পিহো হইতে ১১ ক্রোশ এবং রত্নযক্ষ হইতে ২০ ক্রোশ পশ্চিম। রামহ্রদ একমতে ঝিন্দের দুই ক্রোশ নিকট অপর মতে পুন্ড্রী বা পুণ্ডরীক তীর্থের সমীপস্থ। পাণ্ডারা রত্নযক্ষ বহরযক্ষ ও তৃকযক্ষাদি দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করে। দর্শক এখন পাণ্ডার গোলোযোগ পরিত্যাগ করুন। কুরুক্ষেত্র এক বিস্তীর্ণ স্থান। পূর্ব্বে এই স্থানে বহুদূর ব্যাপক কুরুজাঙ্গল নামে জঙ্গল ছিল। মহাভারতে লিখিত আছে, যমুনা কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। শ্রীকৃষ্ণ যে হিরন্বতী তীরে পাণ্ডবদের শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃশদ্বতী, ইহার মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত বিনশন প্রদেশ অর্থাৎ যেখানে সরস্বতী লুপ্ত হইয়াছে তাহার পূর্ব্বস্থ কুরুক্ষেত্র মধ্য দেশের অন্তর্ভুত। এবং মৎস্য ও পাঞ্চালের সহিত সংলিপ্ত যে কুরুক্ষেত্র তাহা ব্রহ্মর্ষি দেশ মধ্যে ধৃত হয়। স্থান ভেদে পুণ্যতার ভেদ আছে। কৃষ্ণ ও ভীষ্ম সেনানিবেশ করিবার কালে ঋষি সেবিত তীর্থস্থান সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যাহা

হউক থানেশ্বর পানীপথ ও কর্ণাল আদি লইয়া এই বিস্তীর্ণ স্থান একটী মহাক্ষেত্র। ইহাতে কতশত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। যজ্ঞের কোলাহল, যুদ্ধের ভীমরব ও গোমায়ুর চীৎকারে কতবার এই মাঠ কম্পিত হইয়াছে। ছয়জন ভারত আমার বলিয়া এই মাঠে উল্লাস করিয়াছে, ছয়জন ভারত আমার গেল বলিয়া রোদন করিয়াছে। এই মাঠে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভারতের জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন। আজ সেই বীরগণের অস্থির উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে মন চঞ্চল হইতেছে। আহম্মদ সা আবদালীর বিরুদ্ধে ও পাঁচ লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় বীর একত্রিত হয়। এখনও যেন তবরারির ঝঞ্ঝা ও সদাশিবের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছি। এখনও যেন সদাশিব কহিতেছেন, অরে বীরগণ! অনন্তকালের জন্য তোদের সন্তানদের দাসত্ব শৃঙ্খল শত্রুহস্তে অবলোকন কর। পরের কার্য্যের জন্য এ বাহুর সৃষ্টি হয় নাই, লৌহভার বহন জন্যও আমরা তরবারি ধারণ করি নাই। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে ভীষ্ম ও দ্রোণের অস্থি উৎসাহিত করিতেছে। এ কুরুক্ষেত্রের মাঠ। হয় জয়, নয় স্বর্গ করতলস্থ হইবে। আমরা মুগ্ধ হইয়া বহুদূর ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এই সরস্বতীর তীরে আর্য্যেরা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই নদী ইহার তীরে কতবার ঋষিমুখনিসৃত বেদ গান শ্রবণ করিয়াছে ও কতবার উৎসাহপূর্ণ বীরগণের মুখকান্তি দর্শন করিয়াছে। এই জলের গুণেই নিখিল বেদ অসংখ্য পুরাণ ও ভূরি দর্শন আবির্ভূত হইয়াছিল। এ জল পান করিলে কি আর সে ভাব উদয় হইবে, না সে তেজ আবির্ভূত হইবে। বীরপূজিতা সরস্বতী এখন ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। যাহাহউক এই প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে হিসার বা হরিয়ানার জঙ্গলে সিংহ পাওয়া যায়। এখানকার গাভী বৃহৎ, সুন্দর ও দুগ্ধবতী। এক এক ষাঁড় চারি হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। পানিপথের পিত্তলের বাসন মন্দ নহে।

অম্বালা হইতে উত্তর মুখে শিমলার পথ। কালকা পর্য্যন্ত ৩৮ মাইলে ডাকগাড়ী ভাড়া চারি টাকা। পথে ২১ মাইল পরে ঘাগর নদী। তদনন্তর কালকার নিকট উৎস ও নিকুঞ্জ শোভিত পতিয়ালা রাজের বিখ্যাত পিঞ্জর উদ্যান। কালকার পর পাহাড়ের উপর নূতন পথে ৫৬ ও প্রাচীন

পথে ৪১ মাইল ঘোড়া ঝাঁপান ডাণ্ডী বা টোঙ্গায় যাওয়া যায়। ঝাঁপান ভাড়া নূতন পথে ১৭ ও প্রাচীনে ১৩ টাকা। গবর্ণমেণ্টের হর্ম্ম্যাদি শিমলার শোভা। এখানকার পার্ব্বতীয় ও আরণ্য সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। উত্তরে হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ সকল ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সুন্দর ভাবে সজ্জিত। দক্ষিণে অসিতবর্ণ গিরির মধ্যে মধ্যে গভীর খাত। দক্ষিণ পশ্চিমে সুবাতুর পাহাড়। দূরে শতদ্রু সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছে। নিকটে চারিদিকেই পর্ব্বত। তদুপরি অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল বিশাল শীর্ষ উন্নত করিয়া হরিত শোভা বিস্তার করিয়াছে। তাহার শাখায় অতি সুন্দর পক্ষী সকল গান করিতেছে। শিমলা প্রায় ৭ হাজার ফীট উচ্চ। এখানে গ্রীষ্মকালেও শীত। এবং শীতকালের খাদ্যাদি গ্রীষ্মে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর খাদ্য অতি দুর্ম্মূল্য। পূর্ব্বের ন্যায় শিমলা আর স্বাস্থ্যপ্রদ নাই। এখানকার পার্ব্বতীয় মধু অতি উৎকৃষ্ট। এখানকার পার্ব্বতীয় স্ত্রীলোকেরা দেখিতে মন্দ নহে। পয়সা পাইলে পতি ও পিতা স্ত্রী কন্যা ছাড়িয়া দেয়। বহু স্বামিও ইহাদের পক্ষে দোষাবহ নহে।

অম্বালা হইতে কুরুক্ষেত্রে বা শিমলা না গিয়া অগ্রসর হইলে রাজপুরা ষ্টেসন। এখানে মোগোল সম্রাটদিগের প্রাসাদ চূড়া ও বুরুজ বিশিষ্ট পান্থশালা ও জেলখানা আছে। এখান হইতে পতিয়ালা ২০ মাইল দূরে থাকে। তদনন্তর ভগ্ন সহর সরহিন্দ। তাহার পর শাল ও পশমী কাপড়ের প্রধান স্থান লুধিয়ানা। কাশ্মীরী কারিকর আছে কিন্তু, কাশ্মীরের তুল্য শাল হয় না। নগরে বিস্তর লোদী মুসলমান থাকায় লোদীয়ানা নাম। লুধিয়ানা পার হইয়া নিম্ন ও সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে যাইতে ফিলোর কেল্লার নিকট সতলনের বিস্তৃত সেতু। গ্রীষ্মকালে শতদ্রু ৫০০ হাত বিস্তৃত ও ৫ হাত গভীর থাকে। বর্ষায় পুলের নিকট প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত হয়। ভয়ঙ্কর গ্রাহসঙ্কুল ভীমরূপ, পূর্ব্বে এই নদের নাম হৈমবতী ছিল। প্রাণত্যাগার্থ বশিষ্ঠ নদীতে ঝাঁপ দিলে, শত ধারায় দ্রুত হয় বলিয়া শতদ্রু নাম হইয়াছে। সেতুর কয়েক মাইল পশ্চিমে শীক ও ইংরেজদিগের ভয়াবহ যুদ্ধভূমি আলিওয়াল ও সোব্রায়ন। দ্বাদশ দিবস রক্তস্রাবী যুদ্ধের পর শীকেরা সোব্রায়ন ত্যাগ করিয়া শতদ্রু পার

হয়। সেতুর কিছুদূর পরে সেনানিবেশ স্থান জলন্দর। জলন্দর নগরে লোদীগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মসজীদ সকল তাহাদের পূর্ব্ব রাজধানীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ প্রদেশের ভূমি উর্ব্বরা ও মৃত্তিকার নিম্নে দুই তিন হাত খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। জলন্দর হইতে হুশিয়ারপুর ২৫ গুগ্রেট ১৮ পরোয়েন ১৬ দেয়ারা ১৬ কাঙ্গারা ২৫ ও ধর্ম্মশালা ছাউনী ১৬ মাইল। একা ভাড়া সাড়ে সাতটাকা। কাঙ্গারা বা নগরকোট দুর্গ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত। এখানে হিন্দুদিগের তীর্থ মহামায়ার মন্দির আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে বিস্তর অর্থ সঞ্চিত ছিল। মহম্মদ গজনবী আসিয়া সেই সকল অর্থ লুণ্ঠন ও তীর্থ মন্দির ভগ্ন করিয়া যান। এ প্রদেশ পর্ব্বতময় সত্য কিন্তু নিম্ন স্থানে বিস্তর ধান্য জন্মে। কাঙ্গারার ৭০ মাইল ঈশান কোণে মনিকর্ণি তপ্তকুণ্ড। ইহার জল এত উত্তপ্ত যে বস্ত্রে তণ্ডুল বাঁধিয়া দিলে দেখিতে দেখিতে অন্ন হয়। কাঙ্গারার ২৫ মাইল ও বড় ব্যাস নদীর ৭ মাইল দূরে জ্বালামুখী তীর্থ। পর্ব্বতোপরি জ্বালামুখীর মন্দির, শিবালয়, নানাদেব মন্দির ও নির্ম্মল সলিলপূর্ণ কুণ্ড। জ্বালামুখীর মন্দিরের গম্বুজ ও কলস স্বুবর্ণবর্ণে জাজ্বল্যমান। সভামণ্ডপে নেপালরাজদত্ত প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলিতেছে। দ্বারটী রৌপ্যমণ্ডিত। অভ্যন্তরে ৩ হাত লম্বা ১৷৷০ হাত প্রস্থ ও ২ হাত গভীর এক কুণ্ড। কুণ্ডের মধ্যে বায়ুকোণে ৪।৫ অঙ্গুল ছিদ্র হইতে ১ হাত উচ্চ অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। কুণ্ডের আর কয়েকটী ছিদ্র হইতেও অগ্নিশিখা বাহির হয়। কুণ্ড ব্যতীত মন্দির ভিত্তির কোণ হইতেও একহাত অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তর ভিত্তির স্থানে স্থানে ছিদ্র দিয়া দীপশিখার ন্যায় কখন কখন অগ্নি জ্বলিয়া থাকে। মন্দিরের বায়ুকোণে শীতলজলপূর্ণ কুণ্ড। কুণ্ডের নাম গোরখড়িব্বি। সতীর জিহ্বা পতন স্থান, এই পীঠাদি দর্শন করিয়া জলন্দর ফিরিবে বা কুলু উপত্যকা দিয়া কোকসল দেখিতে যাইবে। জলন্দরের পর কপুর্রতলার নিকট কিরতারপুর ষ্টেসন। ইহার পর ১৪ মাইল দূরে ৬৬ হাত অন্তর ২৯ খণ্ড যোজিত বেরা বা বিপাশার সেতু। পাছে পুলের নিকট বালুকা কাটিয়া বেগ পরিবর্ত্তন করে এজন্য স্রোত ঠিক পথে রাখিবার নিমিত্ত বহুদূর হইতে বাঁধা হইয়াছে। জলের, নিম্নে ২৮ হাত পর্য্যন্ত স্তম্ভ প্রোথিত আছে।

পাশবদ্ধ বশিষ্ঠ এই জলে পতিত হইয়া পাশহীন হন, এজন্য নদীর নাম বিপাশা হইয়াছে।

বিপাশার পর ২৭ মাইল সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া অমৃতসর। নগরের চারিদিকে প্রাচীর পথগুলি পরিষ্কৃত প্রশস্ত ও জনাকীর্ণ। বিলাতী কাপড় আগ্রা দিল্লীর দ্রব্য চিনি শস্য ও পশ্বাদি বিক্রীত হইতেছে। শাল ও পশমী কাপড়ের কারখানায় সহর পূর্ণ। অমৃতসর শীকদিগের মহা-তীর্থ। পূর্ব্বে ইহার নাম চক ছিল। পরে শীকগুরু রামদাস ১৫৮১ অব্দে অমৃতসর নামে প্রকাণ্ড তীর্থ পুষ্করিণী খাত করে। পুষ্করিণী চতুকোণ। এক এক দিকে প্রায় ১৩৫ কদমা। রঞ্জিতসিংহ ১৭ ক্রোশ এক খাত দ্বারা ইহার সহিত ইরাবতী নদীর যোগ করিয়া দিয়াছেন। পুষ্করিণী মধ্যে দ্বীপ। তন্মধ্যে ৩০ হাত সমচতুষ্কোণ ২০ হাত উচ্চ ও স্বর্ণবর্ণে জাজ্বল্যমান গুরু গোবিন্দের মন্দির। মন্দির মধ্যে উৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ, নিম্নে গুরু নানকের ধর্ম্ম পুস্তক। পাঠানরাজ নিষ্ঠুর হোসেন আবদালী এই মন্দির ভগ্ন ও দুই বার গোরক্তে দূষিত করে। শীকেরা যবন রক্তে ধৌত করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়াছে। মন্দিরের পার্শ্বস্থ স্তম্ভের উপর হইতে নগর শোভা দেখিতে অতি সুন্দর। পুষ্করিণীর অনতিদূরে একটী উৎকৃষ্ট ঘটিকা-স্তম্ভ আছে। অমৃতসরের রামবাগ দেখিবার যোগ্য। নগরের ৩ মাইল দূরে রঞ্জিত সিংহের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দগড়। এখন পঞ্জাব মধ্যে অমৃতসর নগর উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। অমৃতসর পার হইয়া লাহোরের ছাউনী মিয়ানমিয়ার। এক দিন সার চার্লস নেপিয়র বেড়াইতে গিয়া স্বীয় নাম স্মরণার্থ জলহীন, বৃক্ষহীন, নীরস বালুকাময় এই কবর-ক্ষেত্রে সহর নির্ম্মাণ মানস করিলেন। তদবধি ইহার উৎপত্তি হইল। ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দূরে গির্জ্জা, গবর্ণ-মেণ্ট হাউস লরেন্স মণ্টগমরি হল ও পশ্বাদি পূরিত লরেন্স উদ্যান দেখিবার যোগ্য। তাহার পর উদ্যান ও হর্ম্ম্যাদি শোভিত আনারকুলি। রাজপ্রিয়-তমা আনারকুলি ভ্রষ্টা হওয়ায় জীবিতাবস্থায় তাহাকে প্রোথিত করা হয়। ইংরাজেরা তাহার অস্থি, স্তম্ভ নিম্নে প্রোথিত করিয়া তদীয় কবর হর্ম্ম্যে গির্জ্জা করিয়াছেন।

আনারকুলির পর রাভী নদীর ১ মাইল পূর্ব্বে পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর। ষ্টেসনটী সুরক্ষিত। বিপক্ষ আক্রমণ করিলে চতুর্দ্দিক রোধ করিয়া তোপ সাজান যাইতে পারে। ষ্টেসনের ৪০০ গজ পরেই লাহোরের দিল্লী দরজা। লাহোর অতি প্রকাণ্ড সহর, চারিদিকে সুরক্ষিত ভিত্তি প্রায় ২০ হাত উচ্চ। নগরের উত্তর পশ্চিমে ইরাবতীর দক্ষিণ ৭ মাইল বিস্তৃত কেল্লা। কেল্লা মধ্যে রঞ্জিতের উৎকৃষ্ট ভগ্ন গৃহ। পার্শ্বে তাঁহার মার্ব্বেল শোভিত কবরালয়। তদনন্তর আরংজেব নির্ম্মিত বাদসাহ মসজীদ। এক প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে লাল-প্রস্তর নির্ম্মিত ও গম্বুজত্রয় ভূষিত এই মসজীদ নয়নগোচর হয়। মসজীদের স্তম্ভ হইতে লাহোর দেখিতে অতি সুন্দর। উজীর খাঁর কবর হর্ম্ম্য শীকেরা শূকররক্তে দূষিত করিয়া অশ্বশালা করিয়াছে। লাহোরের সনারা মসজীদও মন্দ নহে। নৌকা সেতুতে ইরাবতী পার হইয়া লাহোরের ২ মাইল উত্তরে সাহাদ্রা বা জেহাঙ্গিরের কবর। প্রবেশ দ্বারের পর চারিদিকে ভিত্তি-বিশিষ্ট নারাঙ্গী বৃক্ষপূরিত একটী মনোহর উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে লালপ্রস্তরে গ্রথিত, মার্ব্বেল শোভায় শোভিত ও চারিকোণে ৪৬ হস্ত স্তম্ভবিশিষ্ট একটী সুন্দর হর্ম্ম্য। শ্বেত-মার্ব্বেলের উপর কাল অক্ষরে জেহাঙ্গিরের নাম ও নানাস্থানে ঈশ্বরের নাম লেখা আছে। কিন্তু অনেক প্রস্তর উৎখাত হওয়ায় সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইয়াছে। অল্প দূরেই ইহার জবাব হর্ম্ম্য। রাভী নদীর ধাকায় এখন উদ্যান প্রাচীর বিনষ্ট হইতেছে। লাহোরের ৩ মাইল উত্তর পূর্ব্বে জয়ের বাটী, সাজেহানের সলিমাবাগ। উদ্যানটী-অর্দ্ধমাইল লম্বা। মধ্যে ৪৫০ ফোয়ারা ও তিন প্রশস্ত উচ্চ বেদী উপর্য্যুপরি উঠিয়াছে। রঞ্জিত সিংহ ইহার মার্ব্বেল খুলিয়া অমৃতসর শোভিত করেন। মণ্টগমরি হল ও মিউজিয়ম দেখিবার যোগ্য। রণজিতের সময় লাহোর শ্রীবৃদ্ধিশালী ছিল। পরে তাঁহার বংশাবলীর গৃহ বিচ্ছেদে উপদ্রব আরম্ভ হইলে বহুলোক অমৃতসর ও শ্রীনগরে পলায়ন করে। ১৮৪৬ অব্দে হার্ডিঞ্জ এই নগর অধিকার করেন। লাহোরে অমৃতসর বর্ণিত সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পঞ্জাব অতি নীরস ভূমি, গ্রীষ্মে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম। জোয়ার বাজরা আদি

শস্য হয়। কিন্তু এখানকার গোধূম অতি উৎকৃষ্ট। মধ্য এসিয়ার অনেক দ্রব্য এই প্রদেশে বিক্রীত হয়। এখনও পঞ্জাবের আচার প্রাচীন মদ্র আচারের ন্যায় নিন্দনীয়। কর্ণ মহাভারতের মদ্রদিগের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। প্রাতঃকালে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে ছাদের উপর উঠিয়া প্রকাশ্যভাবে মল মূত্র ত্যাগ করে। কেহ কেহ শুষ্ক হইলে সে গুলি বিক্রয়ও করেন। পাক পাত্রের উপরে কালি থাকুক ক্ষতি নাই, অভ্যান্তর পরিষ্কৃত হইলেই শুদ্ধ। এক জনের চুলা বা তন্দুরা থাকিলে পাড়ার লোকের রুটি হয়। যদি লাঠির মস্তকে রুটি বাঁধা থাকে পথ দিয়া যাও মুসলমানে স্পর্শ করিলে দোষ নাই। স্ত্রীলোকের স্নানপ্রথা অতি জঘন্য। ভিস্তীর জলে দোষ নাই, লোটায় চর্ম্ম ঠেকিলেই দোষ। এইরূপ অনেক প্রথা পঞ্জাব ও রাজপুতানায় দেখা যায়। শীকেরা নখ দাড়ি রাখিয়া থাকে। নাপিতের সহিত সম্বন্ধ নাই। এখানকার ভয়ঙ্কর চামচিকা জাতীয় জন্তু দেখিবার যোগ্য।

লাহোর হইতে এক রেল মুলতান ও অপর রেল পেশোয়ারের দিকে ঝেলম গিয়াছে। পশ্চিম দক্ষিণগামী বামরেলে ডাইনে ইরাবতীর ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে বহু ষ্টেসন পার হইয়া মুলতান। পৃথিবীতে এরূপ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া এত অধিক দূর রেল অতি অল্প গিয়াছে। ২১৯ মাইল প্রায়ই সরল রেখা। কেবল বর্ষায় প্লাবিত হয় বলিয়া উপযুক্ত স্থানে বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। মুলতান চন্দ্রভাগা ইরাবতী ও বিতস্তা মিশ্রিত ত্রিমারের ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কিন্তু বর্ষায় এই নদী দুই হাজার হস্ত বিস্তৃত হয় ও বন্যা হইলে মুলতানে জল প্রবেশ করে। মুলতানের চারিদিকে খর্জ্জুর গাছ ও উদ্যান। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অতিশয় গ্রীষ্ম হয়। এখানকার দুর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। দুর্গের পরিখা বিস্তৃত ও গভীর, তৎপরে ২৬ হাত উচ্চ ভিত্তি, তদুপরি ৩৭ শৃঙ্গ ছিল। ২২০০ বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর আলেকজাণ্ডার এই নগর দখল করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ২৭ দিন অবরোধের পর ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে এই নগর ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। ৪ লাক্ষ পাউণ্ড বারুদ দ্বারা ইংরেজেরা ইহার ভিত্তি ভেদ করেন। কতক অংশ ভিত্তি বন্যায় নষ্ট হইয়াছে। মুলতান নিকটে বব্বর মসজীদ

ও দেবালয়ের অনেক ভগ্নাবশেষ আছে। উত্তরে সাম্‌তাব্রেজির কবর। কথিত আছে সাম্‌তাব্রেজিকে বধ করিলে সূর্য্য তাঁহার ভজনায় মুলতানে অধিকতর তাপ দিতে আরম্ভ করেন। মুলতান ও সিন্ধুদেশে হিং উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের মধ্যে এই স্থানের আম্র উৎকৃষ্ট এবং এই প্রদেশেই অনেক ফুল ফল উৎপন্ন হয়। বণিক পূরিত মুলতানে রেশমী পশমী ও কার্পাসের বস্ত্রাদি বিস্তর উৎপন্ন হয়। মুলতানে গ্রীষ্মের সময় ভুরি গোলাপের পাক-ড়ীর উপর সূক্ষ্ম চাদর বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিতে বড় আরাম বোধ হয়। লাহোর হইতে বামরেলে মুলতান গমন না করিলে ডাইনরেলে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা পার হইয়া গুজরাট ষ্টেসন। গুজরাটে নামিয়া কাশ্মীরের পথ। বৈশাখ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পথ বরফশূন্য থাকে। গুজরাট হইতে ৩০ মাইল দূরে ভিম্বরের সমগ্র গাড়ী ভাড়া ১১ টাকা। পরে সয়দাবাদ ১৫ মাইল, নৌসিরা ১২॥০ চাঙ্গা সরাই ১৩।০ রাজৌরি রামপুর ১৪ থানামণ্ডি ১৪ বরমগালা ১০॥০ পোসিয়ানা ৮ আলাবাদ সরাই ১১ হিরপুর ১২ সাপিয়ন ৮ রামু ১১ ও শ্রীনগর বা কাশ্মীর নগর ১৮ মাইল। সাকল্যে ভিম্বর হইতে ১৪২॥০ মাইল। আড্ডা প্রতি কুলিভাড়া চারি আনা, বেহারা ছয় আনা, গাধা আট আনা ও ঘোড়া এক টাকা। কুলি ২৫ সের, ও গাধা দুই মন বোঝাই মাত্র লইবে। চৈত্রের শেষে পীরপনজল পর্ব্বতে অধিক বরফ দেখিলে অনেকে থানামণ্ডি হইতে পঞ্চ ও হাজিপীর ও উরী-দিয়া যায়। কিন্তু এই পথে শ্রীনগর ১৮৭ মাইল হইবে। কাশ্মীর প্রবে-শের কোটলি, পঞ্চ, উরি, বরমুলা দিয়া একপথ, আবতাবাদ, মুজঃফরাবাদ, বরমুলা দিয়া এক পথ ও মুরী, কোহালা, বরমুলা দিয়া একপথ ইত্যাদি ভারত হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়পথ আছে। তিব্বত ও তাতার হইতে উত্তরে প্রবেশের আর ছয় পথ আছে। এখন আমরা গুজরাটে উপস্থিত। গুজ-রাটে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম। সকলেই জল জল করিয়া ব্যস্ত। কণ্ঠ শুষ্ক, শরীর ম্লান, সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধপ্রায়। সূর্য্যের কি নির্দ্দয় তাপ, বায়ুর কি অগ্নিসম ঝঞ্ঝা,। অনবরত আকাশে সৌরতেজ কম্পিত ও ভূমির উষ্ণশ্বাস নির্গত হইতেছে। জগৎ নীরব! প্রকৃতি মৃতপ্রায়। ক্ষণে ক্ষণে ঘূর্ণাবায়ু ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কর্কর বর্ষণ। বিকট তেজে জগৎ পরিব্যাপ্ত। চক্ষু উন্মীলন করে

কাহার সাধ্য ? যেন শত শত তেজ সূচিকার ন্যায় চক্ষে প্রবেশ করে। রসের লেশ নাই, তৃণের সম্পর্ক নাই, হরিতের নাম নাই, শূন্য জগতের চারিদিকে যেন হুতাশন হু হু করিতেছে। নিদারুণ দিবায় সকলেই সন্তপ্ত, সকলেই ত্রস্ত, সকলেই ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছে। সুতরাং রাত্রিকালে যাত্রা করিতে হইল। যাইতে যাইতে যামিনী শেষে নিবিড় নীরদখণ্ড দিক্ প্রান্তে লম্বমান। বোধ হইল ঘোর বৃষ্টি হইবে। বস্তুতঃ তাহা মেঘ নহে। হিমালয়ের রূপ আকাশে আবির্ভূত। অনতিকাল পরেই আমরা ভীম্বরে উপস্থিত। পর্ব্বতক্রোড়ে ভীম্বর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঘর-গুলি ছোট ছোট মাটি ও প্রস্তর নির্ম্মিত। চটীর লোক যে রূপ দুষ্ট সে পক্ষে ভীম্বরবাসীগণ কিঞ্চিৎ বেশী বই কম নহেন। ভীম্বর পার হইয়া জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতের পাকে পাকে পথ উঠিয়াছে। কিছু দূর পরেই আদাতক পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ। শীতল সুখসেব্য সমীরণ সেবিত এই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবরোহণ মাত্র সয়দাবাদ গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। আদা-তকের উচ্চ শৃঙ্গে দক্ষিণের ঝঞ্ঝা বারিত হওয়ায় এই স্থান হইতে গ্রীম-মণ্ডলের ভাব পরিবর্ত্তিত প্রায়। বায়ু অপেক্ষাকৃত অরুক্ষ। পর্ব্বত-গাত্রস্থ বনরাজির নিবিড়তা আর নাই। উচ্চতারও বিলক্ষণ ভিন্ন ভেদ। বনমধ্যস্থ প্রকাণ্ড প্রস্তর সকল সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত। সয়দাবাদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় আদাতকের ন্যায় আর এক শৃঙ্গ। ইহার গাত্রে কেলুবৃক্ষ সকল বায়ু ভরে উচ্চ শির কম্পিত করিয়া শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছে। এই গিরি পার হইয়া উপত্যকা মধ্যে নৌসিরা গ্রাম। নৌসিরা অতি মনোহর স্থান। চারিদিকে গিরি সকল বিরল পাদপ সমূহে ভূষিত। উপত্যকার মধ্যে মধ্যে হলকর্ষিত ক্ষেত্র। পল্লী পার্শ্বে পিচ, লেবু, নাশপতি প্রভৃতি বৃক্ষ ভূরি ভূরি ফলপ্রসব করিয়াছে। এবং নানা-বিধ পক্ষীগণ পত্রের অন্তরালে বসিয়া মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। নৌসিরা হইতে উপত্যকা ভূমি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া নানা শোভার আধার হইয়াছে। কোন স্থলে শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা পর্ব্বত পার্শ্ব থাকে থাকে হরিত শোভায় মণ্ডিত। তাহার মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ মুক্তামালার ন্যায় ঝক ঝক করিতেছে। এই সুদীর্ঘ উপত্যকা ভূমি পার

হইবার কালেই চাঙ্গা সরাই ও রামপুর দৃষ্টিগোচর হইবে। এখন সরাই-য়ের নিতান্ত মলিনাবস্থা। মোগোল সম্রাটেরা কাশ্মীর যাতায়াত কালে ৪৫ হাজার রক্ষক, ৪ লক্ষ সৈন্য, দেড় লক্ষ কর্ম্মচারী ও এক লক্ষ উষ্ট্র গবাদি সহ এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন। আমরা ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম, উপত্যকাও ক্রমে হ্রস্ব হইয়া নিবিড় পর্ব্বতে অন্তর্হিত হইল। আমরাও রত্নপীর পর্ব্বতপ্রান্তে থানামুণ্ডী গ্রামে পঁহুছিলাম। থানামুণ্ডীর পর পর্ব্বত নিতান্ত উচ্চ ও তাহার প্রস্থদেশ কাননপূর্ণ। বহুকষ্টে বনভাগ পার হইয়া ৮০০০ ফীট উচ্চে উপস্থিত। এখানকার দৃশ্য অতি চমৎকার। নয়ন বিস্ফারিত হয়, হৃদয় প্রসারিত হয়। পর্ব্বতের শিখরদেশ অসিতবর্ণ উন্নত কায়লমালায় ভূষিত। নিম্ন দেশে নিবিড় অরণ্যানি। সম্মুখে গভীর খাত ও দূরে তুহিনরাশি। কষ্টে উত্তরঢাল দিয়া নামিবার সময় সতেজ বনরাজির সরল মস্তক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কায়ল বৃক্ষ, দোদুল্যমান লতা ভূরি ভূরি বন্যফল ও ঝাঁকে ঝাঁকে বানর দেখিয়া মন পুলকিত হয়। নিম্নে গভীর খাতদ্বারা যেন পর্ব্বত দ্বিধা হইয়াছে। তথায় বরমগালা গ্রাম। বরমগালার পর একটী স্রোতস্বতী বাতেরিতমালার ন্যায় বক্রভাবে পর্ব্বত মধ্যে শিলাতটের পার্শ্ব দিয়া তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে। বারম্বার সেতুযোগে এই নদী পার হইয়া আমরা ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, কিছুদূর পরে পর্ব্বত গাত্রে পোসিয়ানা। পোসিয়ানার ক্ষুদ্র গৃহগুলি পর্ব্বতগাত্রে এরূপ সংলগ্ন যে, ছাদের উপর স্বেচ্ছামত পর্ব্বতে চরিতে চরিতে ছাগ সকল বিচরণ করিতেছে। পোসিয়ানা পার হইয়া পথের বিকটতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছু দূর পরে পর্ব্বতগাত্র লম্বভাবে উন্নত। সহস্র ফীট নিম্নে এক গর্জ্জনকারী নদী ফেণরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। পদে পদে স্খলন সম্ভব ও মধ্যে মধ্যে বরফ রাশি, অতি সাবধানে নিতান্ত ভীতমনে আস্তে আস্তে এই ভাগে আরোহণ করিয়া আমরা পীর-পঞ্জলে উপস্থিত হইলাম। পীরপঞ্জল সাগর হইতে প্রায় সাড়ে এগার হাজার ফীট উচ্চ। ইহার দক্ষিণে পর্ব্বত সকল ধাপে ধাপে নিম্ন হইয়া ক্ষেত্রের সহিত দূরে মিলিত। উত্তর ভাগ ক্রমে নিম্ন হইয়া কাশ্মীরের সন্নিহিত হইয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে বরফমণ্ডিত শিখর। পর্ব্বতের স্থানে

স্থানে পুষ্পবৃক্ষ। ফুল গুলি এত সুন্দর যে, আমাদের সমতল ভূমিতে তাদৃশ উজ্জ্বল বর্ণ পাওয়া নিতান্ত দুর্লভ। পর্ব্বতের উপরিস্থিত পুষ্প মাত্রেরই রং পৃথিবীর নিম্ন ও সমতল ভাগস্থ পুষ্পের অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল। পীরপঞ্জল পার হইয়া আল্লাবাদ সরাই। ইহার চারিদিকে উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ। এক একটা একবারে চৌদ্দ হাজার ফীট উচ্চ হইয়াছে। পর্ব্বতের অধোভাগ কায়লবৃক্ষে বেষ্টিত, তদূর্দ্ধ ভাগে ভূর্জ্জতরুর বেষ্টন, তদূর্দ্ধে দুই একটা সামান্য বৃক্ষ, তদূর্দ্ধে বরফমণ্ডিত শিখর ক্রমেই ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে। তথায় বৃক্ষ নাই, ঔষধ নাই, তৃণ নাই, লতা নাই, প্রাণী নাই, কেবল বরফ ধক ধক করিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড দেবদারু ও ভূর্জ্জবনের নিম্ন দিয়া যাইতে যাইতে পর্ব্বত খাত ক্রমে বিস্তৃত হইয়া যে কাশ্মীর রূপে পরিণত হইবে তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। কিছু দূর পরেই সাপিয়নে কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। সাপিয়ন হইতে কাশ্মীরপর্য্যন্ত ১৫ ক্রোশ সরল পথ। পাঁচ মাইল দূর থাকিতে পথের উভয় পার্শ্বে মোগল সম্রাটদিগের রোপিত অতি সুন্দর বৃক্ষরাজি। বিস্তর লোক গমন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হইল, আমরা কোন মহানগরের সমীপবর্ত্তী হইতেছি। কাশ্মীর দেশের স্বভাব শোভা অতি মনোহর। কিবা নবদূর্ব্বাদল, কিবা শ্যাম তরুতল, কিবা তটিনীর মনোহর রূপ, ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল যে কত ফুটিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, কত গোলাপ, কত জাতি, কত যূথি, কত রঙ্গের কত ফুল কতরূপে কত দিক আকীর্ণ করিয়াছে। ফলভরে অবনত গাছ ভূরি ভূরি। পদে পদে পদ্ম কুমুদ কহ্লার পূরিত সরোবর। নিকুঞ্জ লতাবিতান ও বিটপীর শেষ নাই। তাহারই মধ্য দিয়া কুলু কুলু রবে কল্লোলিনী সকল প্রবাহিত। ভ্রমরের গুঞ্জন, পক্ষীকুলের কলরব ও পশুগণের সাহ্লাদ ধ্বনি নিরন্তর কর্ণগোচর হয়। শীত ব্যতীত ষড়্ঋতুর ক্লেশদায়ক কোন ভাব নাই। যেন ঋতুরাজ সদা বিরাজ করিতেছেন। কি মাঠ, কি বন, কি আরাম যেখানে ইচ্ছা বিহার কর, শয়ন কর, ভোজন কর, গড়াগড়ি দেও, কি ব্যাঘ্র, কি সর্প, কোন হিংস্র জন্তুর ভয় নাই। বনে গাছভরা আঙ্গুর, যত ছেঁড় যত খাও, কাহারও কোন আপত্তি নাই।

নদীতে পরন্দা নামক নৌকা যোগে লোক অধিক গমনাগমন করে। নৌকা গুলি ছোট ছোট ও সুন্দর। তাহাতে বসিয়া ক্ষীরের ফল ছিঁড়িয়া খাইতে খাইতে গাছের ছায়ায় লোকে চলিয়া যায়। হিমালয় যেন কাশ্মীরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অত্যুচ্চ শৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টন করিয়া আছেন। শৃঙ্গ সকল বরফাবৃত ও লম্বমান মেঘমালায় সুশোভিত। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়ে ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইবার নয়। স্থল শোভা, জল শোভা, পর্ব্বত শোভা, বন শোভা, সর্ব্বশোভায় কাশ্মীর শোভান্বিত। প্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্রিত করিয়া যেন কাশ্মীরে বিকসিত হইয়াছে। সামান্য কষ্টে শস্যাদি হয় ও বিনা ক্লেশে ফুল ফল জন্মে। আমরা দীর্ঘে ৫৫ ও প্রস্থে ৩০ ক্রোশ এই রূপ দেশের ঐরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কাশ্মীর নগর পঁহুছিলাম। শ্রীনগর বা কাশ্মীর নগর বিতস্তার উভয় তীরে ৪ মাইল লম্বা। ভূকম্প ভয়ে গৃহের অধিকাংশ ভাগ কাষ্ঠ নির্ম্মিত কিন্তু তিন চারিতল বিশিষ্ট। লোকে গুলরেজি মেলার জন্য ছাদের উপর মৃত্তিকা দিয়া পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করে। গবাক্ষ দ্বার সকল সুন্দর কাষ্ঠখচিত, শীতে শীতভয়ে সূক্ষ্ম কাগজে মণ্ডিত থাকে। পথ সকল সঙ্কীর্ণ ও জনাবৃত। নৌকার অধিক ব্যবহার জন্য নদীও লোকাচ্ছন্ন। নদীতে ভদ্র স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য সিন্দুকের ন্যায় এক একটা কাষ্ঠের ঘর ভাসিয়া থাকে। কুম্ভীরাদির কোন উৎপাত নাই। নদীর উপর সাতটা কাষ্ঠের সেতু। গৃহ সকল নদীর এত নিকট যে, লোকে বারান্দা হইতে জল তুলিয়া লয়। নগরের উত্তরস্থ ২৫০ ফীট উচ্চ হরি পর্ব্বতের কেল্লার উপর উঠিলে শ্রীনগর দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হয়। দক্ষিণে সেরগড় প্রধানদের বাসস্থান। দিল্লীর মোগল সম্রাটদের সময় কাশ্মীর অধিকতর শোভাশালী ছিল। বর্ণিয়ার সাহেব যে হর্ম্যাদির বর্ণন করিয়াছেন তাহা আর নাই। এখন জাহাঙ্গিরের দৌলতসরা ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে। নসীম বাগের নিতান্ত মলিনাবস্থা, কেবল হাজার খানেক চনার বৃক্ষ আছে মাত্র। যে নশাত ও সালমার বাগে জেহাঙ্গির নুরজেহানের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া বিহার করিতেন এবং যাহাকে স্বর্গের নমুনা বলিতেন, আজ সে থানে ভাঙ্গাবাড়ী, শুষ্ক ফোয়ারা মরাগাছ ও চাসের ক্ষেত্র। শ্রীনগরের বহির্ভাগ সমস্তই মনোহর উদ্যানে

পূর্ণ। বিতস্তা পার্শ্বে বহুদূর পরম শোভা। বাদসাহের পূর্ব্বোক্ত উদ্যানের নিকটই কাশ্মীরের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ডল নামে বিশাল সরোবর। প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। পার্শ্বের স্থানে স্থানে পর্ব্বত। কোথাও কোথাও জলের উপর ঘাস ঝোপ জঙ্গল কাষ্ঠ ও তক্তা বাঁধিয়া তাহার উপর মাটি দিয়া চারি পাঁচ হাত বিস্তৃত সুদীর্ঘ কৃত্রিম দ্বীপ করতঃ লোকে তরমুজ ও খরমুজাদি বুনিয়াছে। মধ্যে কলমীর দামের মত এক একটা কাঠি পোতা। জুমার দিন এই সরোবরে নৌকাযোগে, কখন বা পদ্মবনের মধ্য দিয়া, কখন বা আঙ্গুর ও বেদমজনু কুঞ্জের নিম্ন দিয়া বিলাসীরা আহার ও গান করিতে করিতে আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়। দেখিলে মন ও নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। নৌকাযোগে বিতস্তায় বেড়াইতে হইলে নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইবে। তথায় একদিকে তুঁত ঝাউ চনার ও সফেদ বৃক্ষ সকল জলের প্রান্তপর্য্যন্ত বিস্তৃত। অপরদিকে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল অর্দ্ধ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। মধ্যস্থলে বিতস্তার সলিল প্রায় তিনশত হস্ত বিস্তৃত। নৌকায় আরোহণ করিয়া ডাইনদিকে দৃষ্টিপাত কর। সাহেবদের জন্য কয়েকখান দ্বিতল গৃহ। নিকুঞ্জ নিম্নে ইংরেজদের বিস্তর তাম্বু। কিয়ৎকাল পরে বামদিকে কয়েকখান উৎকৃষ্ট গৃহ। তদনন্তর প্রথম সেতু। সেতু কাষ্ঠনির্ম্মিত জল হইতে যত উচ্চ হইয়াছে তত স্তম্ভের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠের থাক ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া সেতুরূপ হইয়াছে। প্রথমাবধি চতুর্থ সেতু পর্য্যন্ত মৎস্যধরা নিষিদ্ধ। ইহার পর বামদিকে রাজবাটী। কতকগুলি উৎকৃষ্ট ঘর ও মধ্যস্থলে স্বর্ণবর্ণ গম্বুজ ঝক ঝক করিতেছে। ঘাটে প্রস্তরের সিঁড়ি। উপরে উঠিলে এক বিস্তীর্ণ গৃহ। ইহার প্রত্যেক ইঞ্চি কারুকার্য্যে শোভিত ও বিচিত্র স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। দেখিলে বোধ হয় যেন কাশ্মীরের শিল্পনৈপুণ্য এই স্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে। রাজবাটী পার হইয়া ক্রমশঃ উভয়তীরে ভূরি ভূরি গৃহ। তাহার কত শত অংশ নদীর দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা এই সকল অংশ সুরক্ষিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল কারুকার্য্যেরই ঘটা। তদনন্তর বিস্তর ঘাট। স্থানে স্থানে খোদিত প্রস্তরখণ্ড। এই স্থানে নদী ত্যাগ করিয়া খালে প্রবেশ করিলে কতকগুলা ভগ্নবাটী ও এক প্রকাণ্ড জমামসজীদ,

লোকে বলে এককালে এই মসজীদে ৬০ হাজার লোক একত্রিত হইত। চারিবার দগ্ধ হওয়ার পর আরংজেব সংস্কার করেন। এখান হইতে পুনরায় নদীতে আসিয়া কিছুদুর গমন করিলে মহারাজার বাজার, বাজারের সম্মুখভাগ নদীর দিকে অনাবৃত থাকায় অতি অপুর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। বাজারের পর কয়েকটা মন্দির ও সেতু পার হইয়া গমন করিতে করিতে নগর শেষ হইল। নগরের উত্তর পূর্ব্ব ভাগ খালে খালে বিচ্ছিন্ন। কাশ্মীর রাজ্যের চারিদিক হইতে পর্ব্বত কন্দর বিস্তৃত হইয়া এই উপত্যকা উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল দরীকন্দরে উপবেশন করিলে বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের ক্রীড়াভূমি স্মৃতিপথে উদিত হয়। কয়েক পদ উপরে উঠিয়া পৃথিবীর অতীত বিবরণ আলোচনা করাও প্রীতিপ্রদ। তথায় খাতের মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের বাঁধ দৃষ্টিগোচর হইবে। প্রস্তর গুলি খাতের উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতগাত্রস্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কে আনিয়া রাশীকৃত করিল? খাতের উভয় পার্শ্বও ঘসা। অত্যুচ্চ হিমালয়ের এই সকল উন্নত বিভাগে কে আসিয়া খাত ঘর্ষণ করিল! সমস্ত হিমগিরিতেই দেখা যায় যে, যেমন পর্ব্বত হইতে নিম্ন স্থানে নদী নামিয়া থাকে, সেইরূপ নিম্নস্থান পাইয়া খালদিয়া রাশীকৃত বরফ ও নামিতে থাকে। এই বরফ নদী অল্পে অল্পে যাইবার কালে সম্মুখে যত প্রস্তর পায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতে থাকে। পরে যখন কোন উষ্ণদেশ প্রাপ্ত হয় তখন বরফ নদীর সম্মুখভাগ গলিয়া যায়। প্রস্তরগুলি বাঁধের ন্যায় পড়িয়া থাকে। বরফ নদীর গাত্র ঘর্ষণে খালের তীক্ষ্ণ অংশ সকল ক্ষয় পাইয়া সমান হয়। প্রথম বাঁধের কিছু দুর পশ্চাতে আর এক বাঁধ, পরে আর এক বাঁধ। এইরূপ বরফ নদীর উৎপাদক পর্ব্বত পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বাঁধ দেখা যায়। এতদ্দ্বারা বোধ হইবে যে, দেশ ক্রমে যত উষ্ণ হইয়াছে তত বরফেরনদী অল্পদুর আসিতেই গলিয়া গিয়াছে। এখন কাশ্মীর পুর্ব্বাপেক্ষা এত উষ্ণ, যে বরফ নদীর উৎপাদক ঐ পর্ব্বতের মস্তকে পর্য্যন্তও বরফ পড়িলে গলিয়া যায়। এক স্থানে দুই জাতীয় প্রস্তর একত্রীভূত দেখিলে বোধ হইবে যে, উভয় নদীর সম্মিলনের ন্যায় বরফ নদীর সম্মিলন হইয়াছিল। পূর্ব্বে অনেক দুর নিম্ন পর্য্যন্ত হিমালয় চিরবরফে আচ্ছন্ন

ছিল। কি নেপাল, কি দারজিলিং সর্ব্বত্র এইরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়। যাহা হউক এই প্রকারে চারিদিকের বরফগলাজলে কাশ্মীর এককালে সরোবর হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থেও আছে কাশ্মীর সতীসর নামে সরোবর ছিল। কশ্যপ ঋষি জল নির্গত করিয়া দেশ স্থাপন করেন, পর্ব্বতের আর এক অংশে যে খাতের পার্শ্ব তীক্ষ্ণ আছে এবং গর্ত্তে ক্ষয়-যুক্ত নানাজাতীয় প্রস্তর বিক্ষিপ্ত এবং জলপ্রবাহের অপরাপর লক্ষণ দেখা যাইবে সেদিক দিয়া নদী ছিল। জলের বেগে গর্ত্তস্থ প্রস্তরগুলি বিলোড়নে ক্ষয় পাইয়াছে। আমাদের দেশে নদীর জল কমিয়া গেলে তীরস্থ কূটাকাটার শ্রেণী দেখিয়া জানা যায় যে কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল। পর্ব্বতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের সারি দেখিয়া জানা যাইবে যে ঐ নদীর জল কতদূর বিস্তৃত হইত। এইরূপ কতস্থানে কত পরিবর্ত্তনের চিহ্ন রহিয়াছে। কোথাও বা বিদীর্ণ পর্ব্বত খণ্ড, কোথাও বা ভূকম্পে চালিত প্রস্তর, কোথাও বা চূর্ণীকৃত শিখর, কোথাও বা প্রস্তরসহ প্রকাণ্ড তুহিনপাত, কোথাও বা প্রবল বাত্যায় পতিত রাশি রাশি উপলখণ্ড ইত্যাদি নানাস্থানে নানা চিহ্ন যুগ যুগান্তরীয় অবস্থা সকল প্রকাশ করিতেছে। এ দেবালয় নয় যে মুসল-মানেরা চূর্ণ করিবে, গ্রন্থও নয় যে ভস্মসাৎ করিবে। স্থির নেত্রে হিমালয়ের একখণ্ড শিলার উপর দৃষ্টিপাত করিলে মন চিন্তা করিতে করিতে অনাদি কালের গভীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ে ও মোহে অভিভূত হয়। নর-নারায়ণ আশ্রম, যুধিষ্ঠিরের ফছিল দর্শন, ভগীরথের গঙ্গানয়ন ইত্যাদি সহ হিমালয়ের পূর্ব্ব অবস্থা তৃতীয়খণ্ডে হিমবৎবর্ণনে প্রকাশিত হইবে।

কাশ্মীর রাজ্যের নানাস্থানে নানাতীর্থ আছে। শ্রীনগরের ৮ মঞ্জিল উত্তরে কাশ্মীরের প্রধান তীর্থ অমরনাথ। বর্ষমধ্যে শ্রাবণীপূর্ণিমায় মেলা ও দর্শন হয়। পথ অতি দুর্গম। শেষ ৭।৮ ক্রোশ অত্যন্ত বরফ। এক মঞ্জিল থাকিতে লোকে উলঙ্গ বা ভূর্জ্জপত্র কৌপীন লইয়া গমন করে। পর্ব্বত হইতে শিবলিঙ্গের ন্যায় বরফ পিণ্ডাকার হইয়া গহ্বরে পড়ে। শুনা যায় এই গহ্বর তিব্বতপর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, শুক্লাত্রয়োদশী হইতে বরফ জমিয়া ৭ দিন মধ্যে ঐরূপ মূর্ত্তি হয়। এবং তাহার পর কৃষ্ণপক্ষে গলিয়া অদৃশ্য হয়। তাহার ভিতর হইতে কখন কখন পায়রা বাহির হয়।

গহ্বর নিকটে নদীর কর্দ্দম শ্বেতবর্ণ। শ্রীনগর হইতে ৩৫ মাইল দূরে ইসলামাবাদ নগরের নিকট বিতস্তা তীরে মার্ত্তণ্ড স্থান বা মটন সাহের। এখানে যাত্রীরা কুণ্ডে শ্রাদ্ধাদি করে। পাণ্ডব নির্ম্মিত এই মার্ত্তণ্ড মন্দির মুসলমানেরা দখল করিয়াছিল। ইহারা গভীর কূপটীকে বাবলকুপ বলে। ইহার নিকটে সরোবরের একাংশে, গভীর গহ্বর আছে। ইংরেজেরা বলেন, মার্ত্তণ্ডমঠ পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্ভুত ভগ্নাবশেষ। ইয়োরোপীয় মতে দূর হইতে এই হর্ম্ম্য দেখিলে তুরস্কের বালবেক ও পালমিরা, নিকটের ভগ্নাবশেষ দেখিলে ইরানের পারসিপলিস এবং মধ্যস্থ ভাগ দেখিলে গ্রীকদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পারথেনন স্মৃতিপথে উদিত হয়। ট্রিবেক বলিয়াছেন যে, ইজিপ্টের পিরামিডও গঠনের গাঢ়তায় ইহার নিকট পরাভূত হইয়াছে। কনিংহাম মন্দিরে হিন্দুদেবমূর্ত্তি খোদিত দেখিয়া বৌদ্ধদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীনগরের ৩ মাইল দূরে সরোবর মধ্যস্থ হর্ম্ম্য ও প্রাচীন হিন্দুমন্দির এবং কাশ্মীর নিকটস্থ তক্তি সলিমান ২২০ পূঃ খৃঃ মলোকরাজ নির্ম্মিত। শ্রীনগরের ৬০ মাইল দূরে বিতস্তার উৎপত্তি স্থান। স্থানটী বড় মনোরম, পর্ব্বতের অন্তরে চারিদিকে ফল পুষ্পোপশোভিত ২৫০ হাত বিস্তৃত ও ১৬ হাত গভীর নির্ম্মলজল ও মৎস্যাদি পূর্ণ কুণ্ড হইতে বিতস্তা নির্গত হইতেছে। নিকটে প্রাচীন দেবমন্দির সম্রাটদিগের বাটীর অবশেষ, আরও অনেক কুণ্ড। শ্রীনগরের ১৮ ক্রোশ পূর্ব্বে বীরাঙ্গ নগরের নিকট পর্ব্বতোপরি ১৬ হাত এক কুণ্ড আছে। শুনা যায় উহা ১১ মাস শুষ্ক থাকে। কেবল জ্যৈষ্ঠমাসে প্রত্যহ পূর্ণ হয় ও শুষ্ক হয়। উহার নিকট ৬ মাস শুষ্ক থাকে এরূপ আর এক কুণ্ড। লোকে বলে কৃষকেরা জলের জন্য ঐ কুণ্ডের আরাধনা করিলে উহার প্রস্রবণে যথেষ্ট জল হইয়া মাঠ প্লাবিত করে। আর এক কুণ্ড কুকর নামে খ্যাত তন্নিকটে আর দুই কুণ্ড। শ্রীনগরের বায়ুকোণে তিনদিনের পথে কমলুগ্রামে এক কুণ্ড আছে। পর্ব্বতের বরফ গলিয়া নীচে নীচে জল আসিয়া উহার মধ্যে এমত আবর্ত্ত উপস্থিত করে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্রীনগরের ৪০ মাইল বায়ুকোণে নিছাহমা গ্রামের নিকট সুহোয়ম নামে এক খণ্ড ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত। কাশ্মীরের পঞ্চবড়ুয়া নগরে সপ্তদেব মন্দির

ও সুদৃশ্য নন্দীমার্গ প্রান্তর। কুঙ্কুমের উৎপত্তি স্থান পর্ণপুর নগর ও কেব্ক- নগর ও পুণ্য তীর্থ। শুনা যায়, মাড়োয়ার ধুনের নিকট সর্পপুরিত ছত্র- কোট পর্ব্বতে মধ্যে মধ্যে স্ফটিক লিঙ্গ কখন দৃশ্য ও কখনও অদৃশ্য হয়। গুণর নগরের কুণ্ডের জল হ্রাস হইলে তন্মধ্যে এক চন্দন কাষ্ঠের শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। কাণ্ডা পাড়ার শব্দায়মান নির্ঝর ও বাজোয়াল গ্রামে শালা- মার নির্ঝর দেখিবার যোগ্য। তিহাদ নগরে সপ্তসরিতের সঙ্গম আছে। ইহার জল গ্রীষ্মে শীতল ও শীতে সুখোষ্ণ হয়। আশাবলারি স্থানে সোরিগর নামে এক কুণ্ড ও প্রস্তর-মন্দির আছে। শুনা যায়, শুক্রবারে মাসের নবম দিবস হইলে ঐ কুণ্ডে জল হয়, দেব সরোবর বালাস্থানে ফেলুনাগ কুণ্ড এবং নিগম নগরে ৪০ বিঘা বিস্তীর্ণ নীলনাগ কুণ্ড। এই কুণ্ড হইতে কাশ্মী- রের তীর্থ গ্রহ নীলমত পুরাণ উৎপন্ন হয়। কোঠার স্থানে এক কুণ্ড আছে। লোকে বলে যে, ১১ বর্ষ বারিশূন্য থাকিয়া বৃহস্পতি সিংহরাশি গত হইলে প্রতি শুক্রবারে ঐ কুণ্ডে জল দেখা যায়। মহামু স্থানের নিকট এক উপ- দ্বীপ আছে। তাহার উপরিস্থিত বৃক্ষ বায়ুতে নড়িলে উপদ্বীপ নড়িতে থাকে। কাশ্মীরে ফলের মধ্যে সেউ, নাশপাতী, বিহি, গিলাস, বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুর, আলুচা, আলুবোখারা, শাহাদানা, শফতালু, শহতুত, জর্দ্দালু ও আখরোট বড় উত্তম। হিমালয় প্রান্তে কমায়ুন আদি স্থানেও এ সকল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্মীরের গিলাস ও চম্বার শফতালু অতি উৎকৃষ্ট। কাশ্মীরের পামপুর পরগণায় কেশর জন্মে। মুল পিঁয়া- জের মত, পাতা কুশতুল্য, বৃক্ষ লম্বে অর্দ্ধ হস্ত, পুষ্প ছয়দল তাহারই কেশরে কেশর কুঙ্কুম বা জাফরান হয়। এখানকার শাল, বাফত, পশমী কাপড়, কাগজ, কলমদান, গিল্টি কুজা ও রূপার জিনিস উৎকৃষ্ট। কাশ্মীরের ১৬ হাজার শাল যন্ত্র হইতে বর্ষে ৬০ হাজার শাল জন্মে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাল মূল্য ৭ সহস্র টাকা হইতে পারে। উৎকৃষ্ট শাল একবর্ষে, মধ্যম ৩।৪ মাসে ও অধম ২ মাসে হয়। তিব্বত দেশীয় ছাগলের পেটের বড় লোমের গোড়ায় যে তুলার ন্যায় লোম থাকে তাহাই পাকাইয়া সূত্র করে। এক জন সূত্রের সরু মোটা বাছে, একজন নির্ম্মাতার হস্তে যোগাইয়া দেয়, একজন বোনে ও একজন নীচে বসিয়া দেখে এজন্য নিম্নতল পরিষ্কৃত হয়। কতক

শাল ঝাঁপে তোলা কতক হইকার। কতক খণ্ড খণ্ড বুনিয়া পরে যোগা দেয়। অপকৃষ্ট শালে ভেড়া, বিড়াল, কুকুরের লোম পর্য্যন্ত মিশাল করে। এখন মহারাজা রেশমও মিশাল দিতেছেন। শুনা যায় বর্ষে মোট ৭০।৮০ মণ উৎকৃষ্ট পশম তিব্বত হইতে লভ্য হয়। কাশ্মীরে ও হিমালয়ের বরফ স্থানে মনাল, জীবজানা, সুরী, বাঁধসু, ওঁকার প্রভৃতি অতি সুন্দর পক্ষী পাওয়া যায়। কাশ্মীরের অধিকাংশ লোক মুসলমান। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের প্রস্তুত করা রুটী খান, মুসলমানের সঙ্গে আহার করেন, মুসলমানী সঙ্গে ব্যবহার করেন, কেবল সিন্ধুতটস্থ দেশের ন্যায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহটা চলে না। আবার ইহাঁরা কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভ্রষ্টাচার হইয়াছে। এখানকার অনেক স্ত্রীলোক সুশ্রী সত্য কিন্তু মাজামোটা, দুশ্চরিত্রা, উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয়। পোসাক গলা হইতে একটা কুর্ত্তি, মাথায় রুমাল বাঁধা, গলায় একটা আগুনের কাংড়ি ঝোলে। কাপড় এত ঢিল যে উহার মধ্য দিয়া আগুনের উত্তাপ সর্ব্বত্র যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের যেমন ব্যবহার পুরুষদেরও তদ্রূপ। বাজারে গেলে যেন ফেরীওয়ালারা ফেউ লাগে। এত সাবধানে দ্রব্য বাহির করে যেন দ্রব্যটা কত বহুমূল্য। কলিকাতার অনেক অপকৃষ্ট বেলোর তথায় রত্ন বলিয়া প্রচারিত। অতএব সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। রাজার ভূমির আয় ১২ লক্ষ, শালের আয় ৮ লক্ষ, মাসুল আদিতে অবশিষ্ট টাকা হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় কোটি টাকা আয় হয়। টাকায় এত খাদ যে কাশ্মীরের টাকা প্রায় গবর্ণমেন্টের টাকার অর্দ্ধেক। রাজা বেশ্যাবৃত্তিরও মাসুল লন। কাশ্মীরের প্রতি কথাতে মাসুল।

পেশোয়ার চারিদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত। কিন্তু স্থান আশ্চর্য্য উর্ব্বরা। এমন কি এখানকার তুল্য উৎকৃষ্ট তণ্ডুল পৃথিবীতে হয় না। পোলায়ের পক্ষে বড় উৎকৃষ্ট। একসের তণ্ডুল একসের ঘৃত শোষণ করিয়া ফুলিয়া চারিসের তুল্য হয়। পেশোয়ারের অধিবাসীগণ ক্রূর ও পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীয়গণ নিতান্ত অবিশ্বাসী। অতএব একাকী যথায় তথায় গমন নিতান্ত নিষিদ্ধ। এখানে বড় শীত। আকবর এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পেশোয়ারের পর পার্ব্বত মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ খাইবর পথ। এই পথ দিয়া ভারতের যত শত্রু

প্রবেশ করিয়াছিল। খাইবার পার হইয়া কিছু দূর পরে কাবুল নগর। কাবুলের ৪০ মাইল উত্তরে ৪০০ ফীট উচ্চ এক পর্ব্বত পার্শ্বে ২৫০ গজ উচ্চ ও ১০০ গজ বিস্তৃত এক আশ্চর্য্য বালুকা ক্ষেত্র আছে। উহার উপরে উঠিলে বা উহাতে প্রবল বায়ু লগিলে উহার অভ্যন্তরে বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। নিশাকালে বা মধ্যাহ্ন সময়ে হটাৎ শূন্য মাঠমধ্য বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া পথিকেরা চকিত হইয়া উঠে। কাবুল রাজ্যে সেউ, নাশপাতি, খোবানি, আঙ্গুর, দাড়িম, সর্দ্দে, আঁজির, আখরোট প্রভৃতি সুখাদ্য ফল, উৎকৃষ্ট জিরা, ৫।৭ সের ভারি লাঙ্গুলবিশিষ্ট ভেড়া, দীর্ঘ লোমযুক্ত বিড়াল ও কুক্কুর প্রভৃতি জন্তু এবং পস্তিন প্রভৃতি শীতবস্ত্র জন্মে। পূর্ব্বে এই দেশকে কাম্বোজ ও গান্ধার রাজ্যাদি কহিত। এখন কোন কোন স্থানে হিন্দুজাতির বাস ও কোথাও কোথাও হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ প্রদেশের রবাব বাদ্য অতি সুমিষ্ট।

বম্বে গমন।

দক্ষিণাপথ দেখিতে ইচ্ছা হইলে নৈনিতে আরোহণ করিবে। নৈনি কলিকাতা হইতে ৫৬০ মাইল ও এলাহাবাদ হইতে ৫ মাইল। মুঙ্গের নাড়ু প্রভৃতি কিছুকাল স্থায়ী খাদ্যাদি এই স্থানে সংগ্রহ করিবে। জব্বলপুর পর্য্যন্ত পথে খাদ্য প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। ভীষণ বিন্ধ্যাটবী পার হইতে হইবে। আর আর্য্যাবর্ত্তের সুখ প্রাপ্ত হইবে না। দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীর দিকে যাত্রা করিতে হইবে। যমুনা পার হইবার কালে সীতাসহ রঘুনাথও চঞ্চল হইয়াছিলেন। নৈনির পর স্থানে স্থানে বৃক্ষকুঞ্জ, কোথাও বা হলকর্ষিত ক্ষেত্র ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার পর জসরা ষ্টেসন। জসরা পার হইয়া ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল, কঠিনপ্রস্তর, উচ্চাবচ ভূমি ও বৃক্ষাদি শূন্য অনাবৃত প্রদেশ। অনতিকাল মধ্যেই কঠোর পাহাড়ের খাত আসিয়া উপস্থিত। দূরে বিন্ধ্যের বিশাল শ্রেণী। তদনন্তর মাণিকপুরের নিকট কয়েকখান শস্যক্ষেত্র। তাহার

পরেই পুনরায় বামে ও সম্মুখে পর্ব্বতমালা। কোন পর্ব্বতের তৃণাচ্ছাদিত গাত্র হইতে হরিতশোভা নির্গত হইতেছে। কোনটা বা সৌর কিরণে উজ্জ্বল হইয়াছে ও কোনটা বা ছায়ার ঘোর হইয়া তমোময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। ইহার পর মারকুণ্ডা ষ্টেশন। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল, এক একটা পাহাড়ের গাত্রে প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড শিথিল হইয়া রহিয়াছে। এই ষ্টেসন হইতেই ৬ ক্রোশ দূরে হামীরপুরে চিত্রকূট গমন করিতে হয়। চিত্রকূট পর্ব্বতের বনশোভা অতি সুন্দর। এক দিকে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। তত্তীরে তীর্থ মন্দির পর্ব্বতোপরি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের পাষাণময় মূর্ত্তি। এখানে লোকে রামঘাট, দেবঅঙ্গনা, হনূমানধরা, ফটিকশিলা, গুপ্ত গোদাবরী, পর্ব্বতে অনসূয় প্রতিমা, ভরতকুণ্ড, কামাখ্যানাথ পর্ব্বত, পয়োষ্ণী নদী, দাস হনূমানস্থান, বীর হনূমান স্থান, ও বালা-দিবাকর গফ হনূমানস্থান আদি দর্শন করিয়া থাকে। মারকুণ্ডা পার হইয়া ঘোরদর্শন গিরিপ্রান্ত ও বনোপশোভিত পাদদেশ সকল দৃষ্টি গোচর হইতে থাকে। এই স্থানে এক পর্ব্বতশ্রেণী উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু বামদিকে অনতিদূরেই আর এক শ্রেণী। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ঐ শ্রেণীর সন্নিকৃষ্ট হইল। পাকে পাকে এই গিরি পার হইবার সময় বন শোভিত বিন্ধ্যপৃষ্ঠ, কাননপূর্ণ উপত্যকা ভূমি সুদৃশ্য গিরিকন্দর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটীনি দেখিয়া নয়ন আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। কিয়ৎকাল পরে উচ্চস্থান মুজগ্রাম, চারিদিকে পাহাড়, অবতরণ কালে এক অনাবৃত ক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে ঝোড় ও জঙ্গল, সম্মুখে কয়েকটা বিশাল শৃঙ্গ, তাহা-রই বাম দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে। ক্ষণকাল পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন ও দুই এক খান হলকর্ষিত ক্ষেত্র, তাহার পর জিতোয়ার গ্রাম। দূরে পুন-রায় পর্ব্বত শ্রেণী, ঐ শ্রেণীর বিকটাকার শৃঙ্গ কয়েকটা পার হইয়া রেওয়া যাইবার সতনা ষ্টেসন। সতনার এক মাইল পরে সতনা নদীর তিন খণ্ড যুক্ত সেতু, বামে মোচার ন্যায় একটী আশ্চর্য্য পাহাড়, উহার উপরিভাগে সমতল ও সম্মুখের শৃঙ্গসমুহদ্বারা কিঞ্চিৎ লুক্কায়িত। অন-ন্তর দাক্ষিণাত্যের প্রবেশ পথ মাহিরি, ডাইনদিকে পিরামিডের তুল্য এক অদ্ভুত পর্ব্বত, অদ্ভুপরি একখানি গৃহ, ইহার পর দুই বিস্তীর্ণ পর্ব্বত

শ্রেণীর মধ্যস্থিত এক সুন্দর উপত্যকা দিয়া ক্রমাগত ৩০ মাইল রেল চলিয়াছে। বামে কাইমুর শ্রেণীর শৃঙ্গ সকল সমোচ্চ ও উপত্যকার দিকে ক্রমে ঢাল হইয়াছে। দক্ষিণে বুন্দিয়ার শ্রেণী যেন প্রকাণ্ড বুরুজের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্তর জকাই ষ্টেসন। এখানে শৈলসমূহ অন্তর্হিত প্রায়। কিন্তু তথাপিও বহুদূর উচ্চ ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। জকাই হইতে কটনি পর্য্যন্ত তিনটী পার্ব্বতীয় নদী, তদনন্তর সিলিমাবাদ পথ, পথে জঙ্গল অতি সুন্দর, মধ্যে মধ্যে থাক ছাড়া পাহাড়, এক একটা বনরাজি হইতে হটাৎ উচ্চ হইয়াছে। কিছু দূরে কঠিন গ্রানাইট চূর্ণ প্রস্তর ও কর্দ্দম প্রস্তর উৎখাত করিয়া রেল চলিয়াছে। এই সকল কাটিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। প্রস্তর সকল বর্ষায় ভঙ্গপ্রবণ ও গ্রীষ্মে ভয়ঙ্কর কঠিন হইয়া উঠে। এই সকল পার হইয়া জব্বলপুর ষ্টেসন।

জব্বলপুর এলাহাবাদ হইতে ২২৯ মাইল ও সাগর হইতে সহস্র ফীট উচ্চ। ষ্টেসন নিকটে পথিকদের ধর্ম্মশালা। ভূমি বালুকাময়। চারিদিকে শ্রেণীভঙ্গ পাহাড়। পাহাড়ের উপরিভাগ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পণ্ডিতদিগের নিতান্ত প্রীতিপ্রদ। কত জাতীয় গ্রানাইট নিইছ হরনব্লেড ও ফ্লিষ্টোন পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও এসব ও রত্নজাতীয় লোহিতাদি বর্ণের ভূরি ভূরি প্রস্তর, কোথাও পুরাকালিক হস্তিহাড় প্রস্তরে পরিণত ও কোথাও বা আদিম অসভ্যদিগের চকমকীর প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র। জব্বলপুর একটী প্রকাণ্ড সহর। ইহার মহাজনপটী অতি প্রশস্ত। প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া প্রবেশ মাত্র পরিষ্কৃত পথপ্রান্তে সজ্জীভূত নানা দ্রব্য দেখিতে অতি সুন্দর। নিকটে বিপণি মধ্যে অষ্টকোণ পর্দ্দা বেষ্টিত উৎকৃষ্ট কূপ কিয়দ্দূরে গির্জ্জা, তন্নিকটে শিল্পবিদ্যালয়। তদনন্তর ঠগজাতীয় কয়েদী ও তাহাদের পরস্পর বিবাহোৎপন্ন মনুষ্যদিগের কার্পেট তাম্বু ও সতরঞ্চ বুনিবার স্থান। তাহার পর লাক্ষার কারখানা। স্লিমান সাহেবের যত্নে এই নগর শোভাশালী হয়। তিনিই ইহার ময়দানে বংশবৃক্ষ রোপিত করিয়া যান। সহরের বাহিরে দাক্ষিণাত্যের রাস্তার দিকে কতকগুলি পাহাড় কাটিয়া উঠিয়াছে ও গলিতেছে। সমীপের উদ্যান মন্দ নহে। ছাউনী ও নাট্যশালার নিকট দিয়া নাগপুরের পথ। জব্বল-

পুরের ৪ মাইল দূরে নর্ম্মদা। তথায় গো যান বা অশ্ব যানে যাইতে পথের বামদিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতপুঞ্জ। ডাইনদিকের গ্রানাইট পর্ব্বতোপরি একটী ক্ষুদ্র মন্দির। আরও কিছু দূর পরে আর কতকগুলি মন্দির, দৃশ্য অতি সুন্দর। পথ পাকে পাকে পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। তাহার পর গোয়ারিঘাটে পর্ব্বতপ্রান্তে নর্ম্মদা নদী। তীর উচ্চ, জল পরিষ্কৃত ও স্রোত তীব্র। বিস্তার কাল বিশেষ ১০০ হইতে ৮০০ হস্ত হয়। ঘাটের পার্শ্বে মণ্ডলার বন হইতে আনীত কাষ্ঠ ও তীর্থ মন্দির। নর্ম্মদার বিযোজন পুণ্যক্ষেত্র। নর্ম্মদার তীর পরীক্ষা করিলে বোধ হইবে যে এই প্রাচীনা নদী পূর্ব্বে আগ্নেয় উৎপাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর পাংশুর উপর দিয়া পুনরায় প্রবাহিত হইয়াছে। জব্বলপুরের পূর্ব্বে অমরকণ্টকে নর্ম্মদা ও শোণের উৎপত্তি স্থান। ঐ স্থান হইতে শিব ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন। শিবের ত্রিপুর দগ্ধ করাই ঠিক হউক বা ইংরেজদিগের আগ্নেয় গিরির উপদ্রবই ঠিক হউক এখানে এক কালে ভীষণ আগ্নেয় উপদ্রব ঘটিয়াছিল। নর্ম্মদার প্রত্যেক স্থানই মহাতীর্থ। অমরকণ্টক হইতে সাগর পর্য্যন্ত দশকোটিতীর্থ আছে। নর্ম্মদার তীরে যেখানে সেখানে বাণলিঙ্গ শিব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১)।

জব্বলপুরের ১০ মাইল দক্ষিণে শ্বেতবর্ণ মার্ব্বেল পাহাড়। গোয়ারিঘাট পার হইয়া নর্ম্মদা চূর্ণ প্রস্তরের মধ্য দিয়া ঘর ঘর শব্দ করিতে করিতে ধুয়াধারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তথায় ইহার প্রপাত দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। তদনন্তর ২০০ হস্ত হইতে একবারে ৪০ হাত হ্রস্ব হইয়া পর্ব্বত বিদীর্ণ করত ১ ক্রোশ অতি তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার পরই আশ্চর্য্য মার্ব্বেল পাহাড় মধ্যে প্রবিষ্ট। মার্ব্বেল পাহাড় নর্ম্মদার দুই পার্শ্বে প্রাচীরের ন্যায় ৪০।৫০ হাত উচ্চ হইয়াছে। এখানে নদী নিতান্ত

---

(১) নমঃ পুণ্যজলে আদ্যে নমঃ সাগরগামিনি। নমস্তে পাপশমনি নমো দেবি বরাননে। নমোস্তুতে ঋষিগণ সিদ্ধ সেবিতে। নমোস্তুতে শঙ্কর দেহ নিসৃতে। নমোস্তুতে ধর্ম্মভৃতাং বরপ্রদে। নমোস্তুতে সর্ব্ব পবিত্র পাবনে। ইতি স্নানকালে স্তব।

অপ্রশস্ত ও অত্যন্ত গভীর। প্রস্তরের আভায় জল কোথাও বা সবুজ, কোথাও বা নীলাভ ও কোথাও বা নিতান্ত শুভ্র। পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে উর্দ্ধ ও অধোভাগে দুই পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে। নিকটের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বতে হিন্দুদিগের দেব মন্দির ও আরংজেব চূর্ণিত মূর্ত্তি। পর্ব্বত নিম্নে বেহরা ঘাটে রাসের সময় মেলা হইয়া থাকে। ডাইন তীরের অল্প দূরে গ্রানাইট পাহাড় ভূরিরূপে উত্থিত হইয়াছে। ৫ মাইল গমন করিলে পর পর্ব্বতোপরি গোন্দরাজের বাটী, একটীর নাম মদন মহল। মদন মহলের প্রাঙ্গন হইতে সৌধমালা শোভিত জব্বলপুর দূরে লক্ষিত হয়। পর্ব্বতের সান্নিধ্যে কয়েকটা পুষ্করিণী ও অসংখ্য আম্র বন। অনতি দূরে কুরঘেল নামক স্থান প্রাচীন ত্রিপুরপুর নগর। ইহার সমস্তই ভূমিমধ্যে প্রোথিত কেবল দুইটা স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। কেহ বলে যে মুসলমানেরা রাণী দুর্গাবতীকে হরণ করিবার জন্য নগর আক্রমণ করে। রাণী বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করেন। মুসলমানেরা নগরে অগ্নিপ্রদান ও অনেক দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করে। তাহারা যে সকল আম্র খাইয়া ফেলিয়াছিল তাহাতেই আম্র বন হইয়াছে। কিন্তু অনেকে কহেন যে, শতবর্ষ হইল নগর ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়াছে। ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে এখানে স্থপতি কার্য্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। বৈতুল নামক স্থানে এক উচ্চ মন্দিরের ছাদ এত বড় বড় পাথর তুলিয়া গাঁথা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালে যন্ত্র যোগেও তাহা তোলা অসম্ভব। এই স্থানের খোদিত প্রস্তর লইয়া এখন ২০ মাইল পর্য্যন্ত লোকের কার্য্য ও রেলওয়ের বিস্তর উপকার হইতেছে। কিছু দিন গত হইল এখানে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও উৎকৃষ্ট খোদা দরজা সকল উত্থিত হইয়াছে।

জব্বলপুরের পর নর্ম্মদার সেতু পার হইয়া দুরন্ত দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিবে। পথে মীরগঞ্জ ষ্টেসনে অবতরণ করিলে মার্ব্বেল পাহাড় সমীপবর্ত্তী হয়। নর্ম্মদার নিকট বিন্ধ্যের স্ফীত ভাব হঠাৎ অদৃশ্য হওয়াতে নর্ম্মদা বিন্ধ্যের ক্রোড় দিয়া প্রবাহিত। কিন্তু নর্ম্মদা পার হইয়া পুনরায় ভারত স্ফীত হইয়াছে। জব্বলপুর হইতে খাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত রেল প্রায় নর্ম্মদার সমীপবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। জব্বলপুর পার হইয়া বহির্দৃশ্য সকল আরণ্য সৌন্দর্য্যে শোভিত। অধিবাসীর সংখ্যা এ প্রদেশে নিতান্ত অল্প।

ষ্টেসন গুলি ক্ষুদ্র ও লতাজালে জড়িত। গাড়ী ও আর্য্যাবর্ত্তের গাড়ী তুল্য সুখপ্রদ নহে। জি, আই, পি, রেলওয়ের ষ্টেসনে জল পাওয়া ভার। ষ্টেসন মাষ্টার গুলি মহারাষ্ট্রীয়। মাথায় একটী গাড়ীর চাকার মত প্রকাণ্ড পাক। পরনে একখান ময়লা ধুতি। গায়ে একটী পাতলা শাদা চাপকান। পায়ে এক জোড়া চটীজুতা। কাণ দুটী মাকড়ী দেওয়া। কপালে একটী লালটিপ, বলে—“টিকিট বিতাও,,। ষ্টেসনের বাহিরে বাঘের উৎপাত। রেলওয়ের টাপাল গাড়ী অর্থাৎ মেল ট্রেন ব্যতীত যাইবার বড় অসুবিধা। অপর গাড়ীর রাত্রি হইলেই বিশ্রাম। এজন্য অজ্ঞ পথিকের অজানিত স্থানে অবতরণ করিয়া অপকৃষ্ট ধর্ম্মশালায় বাস বা নিকৃষ্ট দোকানে রাত্রি যাপন মরণতুল্য। যদি দুই আনায় এক খানা খাটিয়া পাওয়া যায় তবে মহা সৌভাগ্য। খাদ্যের মধ্যে দক্ষিণদেশতারিণী লঙ্কা, ছাতু, চুড়া, চুরমুরা পুরী, পেড়া ও দুর্গন্ধ জিলিপি দুই এক খান মিলিলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে পথিকের সময়মত খাদ্য ও জল সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তৃতীয়বার ভ্রমণে দেখিলাম ক্রমে কিছু কিছু উন্নতি হইতেছে।

জব্বলপুর হইতে ৬২ মাইল দূরে কুলেরী। এখান হইতে লোকে সাগর নগর যায়। কুরেলীর পর শূকর নদী পার হইয়া গাড়াওয়ারা ষ্টেসন। তাহার পর পাঁচমারীর ষ্টেসন পাপারিয়া। তদনন্তর সোহাগপুরে অগন নদী পার। কিছু দূর পরে হুসঙ্গাবাদের ষ্টেসন ইটারছি। নর্ম্মদার বামতটে প্রাচীন হুসঙ্গাবাদ নগর। ইহার পর হর্দ্দা। এই জেলার সিন্ধিয়া ধার ও হোলকার রাজ্য মিলিত। অনন্তর জোয়ারা ষ্টেসনে মালব দেশস্থ জোয়ারের নবাবের রাজ্যে প্রবেশ ও পিরিয়া নদী পার। তদনন্তর জব্বলপুরের ২৬৪ মাইল দূরে খণ্ডোয়া ষ্টেসন। এই স্থান সাতপুর ও মহাদেব পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। এখানে খাদ্যাদি কতক কতক পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে দেশীয় আঙ্গুরও পাওয়া গিয়া থাকে। এই স্থান হইতে হোলকারের রাজধানী ইন্দোর উজ্জয়িনী ও ওঁকারেশ্বর আদি দেখিতে ইচ্ছা হইলে বম্বেগামী রেল ছাড়িয়া ডাইনদিকের হোলকার ষ্টেট্ রেলে আরোহন করিবে। এই পথে পার্ব্বতীয় দৃশ্য অতি সুন্দর ও দর্শকের

নিতান্ত প্রীতিপ্রদ। নর্ম্মদার লীলাও চমৎকার। মরটাকা ষ্টেসন পরেই নর্ম্মদা পার। ভ্রমণকারীর ইচ্ছা হইলে নিকটে নর্ম্মদার ডাইনতটে দ্বাদশ মহালিঙ্গের এক লিঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ, ওঁকারেশ্বর শিবও নিকটবর্ত্তী, স্বভাব শোভা দেখিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন। ওঁকারেশ্বর মন্দির নিম্নে উৎকৃষ্ট ঘাট ও অদূরে পর্ব্বতোপরি মান্ধাতা ও মুচুকুন্দের কেল্লা। কেল্লা মধ্যে ও বাহিরে অনেক দূরপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বিস্তর থাম্বা চৌকাঠ ও দেবমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। এই স্থানের অল্প দূর পশ্চিমে পণ্য-দ্রব্য-পূর্ণ মণ্ডলেশ্বর নগর। ইহার পাঁচ মাইল পশ্চিমে নর্ম্মদার ডাইন তটে সুপ্রসিদ্ধ মাহিষ্মতী পুরী, চুলি, মহেশ্বর বা সহস্রবাহুকা বস্তি। এই স্থানে সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী ছিল। ইহারই অনতি দূরে জমদগ্নির আশ্রম ছিল। ইহারই নিকটে চ্যবন, শর্য্যাতির যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করেন। এখন মাহিষ্মতী পুরীতে অহল্যাবাইয়ের কেল্লা, তন্মধ্যে তাঁহার বাসবাটী ও নর্ম্মদার সুন্দর ঘাট দেখিবার যোগ্য। এসকল দেখিবার ইচ্ছা না হইলে মরটাকা হইতে সেনানিবেশ স্থানে মৌ ষ্টেসনে চলিয়া যাইবে। মৌ পার হইয়া কিছু দূর পরে ঢালু ময়দান মধ্যে বৃক্ষ-বেষ্টিত হোলকারের রাজধানী ইন্দোর নগর। রাজার বাটী দেখিতে একরূপ মন্দ নহে, কিন্তু যেরূপ নাম সেরূপ শোভা নাই। সহরে অধিকাংশই কাষ্ঠের কার্য্য। মহারাজার জমীর আয় ২২ লক্ষ টাকা। এখানে বিস্তর আফিম হয়। খিচুড়ির উপর থালিভরা ঘৃত ও বাটী হইলে এখানকার ব্রাহ্মণেরা বড় খুসী হইয়া ভোজন করেন।

ইন্দোর পার হইয়া কয়েক ষ্টেসন পরেই আমরা সুবিখ্যাত উজ্জয়িনী নগর প্রবেশ করিলাম, এই স্থানে বিন্দ অনুবিন্দের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান উজ্জয়িনী নগর প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে চূড়া, বেড় প্রায় ৬ মাইল। সহরে বিস্তর অধিবাসী, পথ সকল পাষাণময়, ঘরগুলি দ্বিতল, নিম্নতল প্রস্তর নির্ম্মিত কিন্তু উপরতলে অধিকাংশই কাষ্ঠের কাজ। এখানে চারি মসজীদ ও বিস্তর মন্দির আছে। যবন বিনষ্ট মহাকালের মন্দির পুনরায় অহল্যাবাই কর্ত্তৃক শোভিত হইয়াছে। সহরের বাহিরে অঙ্কপাতে কৃষ্ণমন্দির। লোকে বলে এখানে কৃষ্ণ বলদেব প্রথম পাঠাভ্যাস করেন।

নিকটে প্রস্তর সিঁড়িবিশিষ্ট একটী উত্তম পুষ্করিণী। ইহার কিয়দংভাগ আবৃত করিয়া প্রায় ৫৪ বর্ষ পূর্ব্বে রঙ্গরায় আপা দুই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ডাইন দিকের মন্দিরে শ্বেত-মার্ব্বেল নির্ম্মিত রাম সীতা ও লক্ষ্মণ বিরাজিত। বামের মন্দিরে কৃষ্ণ-প্রস্তরে কৃষ্ণ ও শ্বেত-মার্ব্বেলে রাধামূর্ত্তি। মূর্ত্তি গুলি অতি সুগঠিত। এখানকার বহুবাটী বেষ্টিত সিন্ধিয়ার প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপ গাম্ভীর্য্য হীন। কেবল নিকটস্থ অতি প্রাচীন দুর্গদ্বারের গঠন প্রণালী দেখিবার যোগ্য। সহরের পূর্ব্বদিকে এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি মহাদেবের মন্দির ও যোগা সেহিদ ফকীরের কবর। ইহার উপরে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে অতি সুন্দর। আমরা প্রথমে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দুই ক্রোশ দূরে শিপ্রার দ্বীপ মধ্যে কালিয়দহ নামক এক প্রাচীন প্রাসাদ। স্পষ্টভাবে দুইটী সুন্দর সমচতুষ্কোণ বাটী দূরে লক্ষিত হয়। নিম্নভাগ অটবি ভাগে বিভক্ত ও উপরিভাগে গম্বুজ শোভিত। শিপ্রার এক শাখার উপর দিয়া যাইবার সেতু রহিয়াছে। সেতু নিম্নে কয়েকটা ঘরও দেখা যায়। এই স্থানে শিপ্রা স্থপতির কৌশলে নানাদ্বীপ উৎপাদন করত আহা! কি সুন্দররূপে প্রস্তরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, ফল পুষ্প শোভিত শিপ্রাতটে অর্দ্ধপোয়া বিস্তীর্ণ ভৈঁরোগড় মধ্যে এক প্রাচীন মন্দির। কিয়দ্দূরে অভচিন্তানবিশ ও রানাখাঁর উদ্যান। একটীতে শিল্পের ও অপরটীতে স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখা যায়। তিন মাইল দূরে গ্রানাইট পর্ব্বত দ্বারা দৃষ্টি সংরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তদনন্তর দক্ষিণ পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। দুই মাইল বিস্তীর্ণ নিকুঞ্জ শেষে চিন্তামণি নামক গণেশের মন্দির। নগরের দক্ষিণেও শিপ্রা। এই দিকে আকবরের কালীন উজ্জয়িনীর সুবাদার জয়পুরের জয়সিংহ রাজার মানমন্দির। পূর্ব্বদিকে শস্যপূরিত সমতল ক্ষেত্র মধ্যে এক মোচাগ্রের ন্যায় পর্ব্বত। তন্নিকটে এক হ্রদ ও সিন্ধিয়ার হরিণ পূরিত রমনা। এইরূপে নূতন উজ্জয়িনী দেখিয়া আমরা বিক্রমাদিত্যের প্রাচীন উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হইলাম। এই নগর কোন দৈবী উৎপাতে ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া ভূগর্ভমধ্যে নিহিত আছে। ১০।১২ হাত ভূমি খনন করিলে সম্পূর্ণ প্রাচীর, প্রস্তর, স্তম্ভ ও কঠিন

কাষ্ঠাদি পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্যের কালে উজ্জয়িনী যেরূপ ছিল এখনও তাহা দেখিলে দেখা যায়। এক স্থান খনন করাতে প্রস্তর স্তম্ভ, পচাগোধূম ও কুম্ভকার দোকানের দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রোথিত নগরের পার্শ্ব দিয়া এক প্রকাণ্ড খাত আছে। দৈবী উৎপাতের প্রভাবে শিপ্রা ঐ খাত ত্যাগ করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে। শিপ্রার বর্ত্তমান বেগে প্রাচীন প্রোথিত উজ্জয়িনীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে নিম্নে একটা প্রকাণ্ড বাটী বাহির হইয়াছে। দরজার সম্মুখে উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দুই থাক স্তম্ভ। দক্ষিণমুখে প্রবেশ করিলে দুই বাটী একটী সদর ও একটী অন্তঃপুর। অন্তঃপুরে প্রস্তর স্তম্ভ ও প্রস্তরের কড়ি এবং পশ্চিমদিকে এক ত্রিকোণাকার গহ্বর বা সুড়ঙ্গ। বামে আর দুই ঘর প্রায় ৬ হাত বিস্তৃত। দক্ষিণে মৃত্তিকাপূরিত আর এক দরজা। সন্ন্যাসীরা বলে যে, কাশী ও হরিদ্বার যাইবার এখান হইতে দুই সুড়ঙ্গ ছিল। লোকে গোলোকধন্দে পড়ে বলিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। এই ঘরকে কেহ ভর্ত্তৃহরির বাটী ও কেহ বা গন্ধর্ব্বসেনের গুহা বলিয়া থাকে। কালিদাসের বর্ণিত সেই উজ্জয়িনীর আজ এইরূপ দশা। আজও অবন্তী পার্শ্বে পিক ডাকিয়া থাকে, আজও সেই বসন্ত, সেই বর্ষা উদিত হয়। কিন্তু মেঘদূতের সে সরস লেখনী আজ কোথায়? যাহাহউক এখন বর্ত্তমান উজ্জয়িনীতে দাক্ষিণাত্যের অপরাপর মুসলমানের ন্যায় বোরা বা ইস্মাইল দলস্থ মুসলমান বাস করে। এখানকার সাধারণ লোকে বাজরা শস্যের রুটী খায়। উজ্জয়িনীর মৃত্তিকা বর্ষায় যেমন কর্দ্দমাক্ত, গ্রীষ্মে তদ্রূপ কঠিন হয় ও বিস্তৃত ফাটাল ফাটে। এখানে বুরহানপুরের আমদানী আঙ্গুর ও ফজলী উৎকৃষ্ট। উজ্জয়িনী বা অবন্তি হিন্দুদিগের মহাতীর্থ ও মহাকালের আবাসস্থান। পুণ্যক্ষেত্র ১ যোজন। এখানে ৮৪ সিদ্ধ লিঙ্গ, ৮ ভৈরব, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৬ বিনায়ক ও ২৪ মাতৃ আছেন। প্রায় ৬৬০ বর্ষ গত হইল এখানে দিল্লীরাজ আলতামস অনেক বিগ্রহ ভগ্ন করেন। শিপ্রা, গন্ধবতী, নবনদী ও নীলগঙ্গা সঙ্গমে স্নান অত্যন্ত ফলপ্রদ।

মালবে প্রবেশ করিয়া এই সকল দেখিতে ইচ্ছা না হইলে খাণ্ডোয়া হইতে বম্বেগামী রেলে চান্দানী ষ্টেসন যাইবে। অল্প দূরে বামদিকে

আশীরগড় কেল্লা। উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারত প্রবেশের মুখে সাতপুরার ৭৫০ ফীট উচ্চ শীর্ষোপরি এই সুদৃঢ় দুর্গ সংস্থাপিত। একে স্বভাবতঃ দুর্গম তাহাতে আবার প্রাচীরাদি বেষ্টিত। পর্ব্বত গাত্র স্থান স্থানে ৫০ হইতে ৮০ হাত পর্য্যন্ত লম্বভাবে উন্নত হইয়াছে। এবং তাহাও এত চাঁচা যে, কোনদিকে কোন রূপে উঠিবার উপায় নাই। কেবল দুইটী মাত্র প্রবেশের পথ আছে। ঐ পথ সিন্ধিয়ার প্রকাণ্ড কামান দ্বারা উত্তমরূপ সুরক্ষিত। বুরহানপুরের বাজার ৭ ক্রোশ দূর হইলেও লোকে বলে একটার গোলা বুরহানপুর পর্য্যন্ত যায়। আসীর গড়কে কেহ কেহ অশ্বত্থামাগড় কহিয়া থাকে এবং লোকে বলে যে, সন্ধ্যাকালে অশ্বত্থামা মস্তকের বেদনা নিবারণ জন্ম তৈলভিক্ষা করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই দুর্গের বড় প্রতাপ ছিল। ১৮১৯ অব্দে জেনেরেল ডভটন কর্ত্তৃক অধিকৃত হওনাবধি ইহা ইংরেজদিগের হস্তে আছে। দুর্গ হইতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলাবৃত ভূমি দেখিতে বড় সুন্দর। পূর্ব্বে খান্দেশে মহারাষ্ট্র সময়ে এত কেল্লা ছিল যে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এক দিনের পথে বিশ কেল্লা গণা যাইত। দস্যুর আশ্রয় হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভগ্ন করিয়াছেন।

এতদনন্তর খান্দেশের প্রাচীন রাজধানী বুরহানপুর। ১৪১৪ অব্দে এই নগর সংস্থাপিত হয়, এবং ১৫৯৯ অব্দে আকবর সম্রাটের অধীনস্থ হওয়ার পূর্ব্বে ইহা অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল। এখন সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর মধ্যে প্রায় তিনহাজার বোরা মুসলমান বাস করে। তাপী বা তাপ্তীর ডাইন তটে ৪৬ হাত উচ্চ আকবরের লালকেল্লা। এখানে আরংজেব নির্ম্মিত মসজীদ ও আকবরকালীন ভগ্ন হর্ম্ম্যাদি দেখিবার যোগ্য। এখানকার সূত্রবস্ত্র, রেশমী ফুল ও জরীর কাজ খান্দেশ ও মালবে প্রসিদ্ধ।

বুরহানপুর ছাড়িয়া নিম্বোরার পর তাপ্তীনদী পার। তদনন্তর প্রকাণ্ড ভোছায়ল ষ্টেসন। এই স্থান হইতে বামরেলে লোক নাগপুর যায়। নাগপুর বা বিদর্ভরাজ্যে তাপ্তীর প্রস্রবণ, গোন্দাবাস ভয়ঙ্কর গিরিসমূহ, অমরা-

বতী, ইলিচপুর, নাগপুর, বঞ্জেরস্থান, কামটী প্রভৃতি দর্শনযোগ্য। কিন্তু স্থান নীরস, কর্কশ ও দৃষ্টির অপ্রীতিকর, ভাষাও অপকৃষ্ট।

নাগপুর দর্শনে অনিচ্ছা হইলে বম্বেগামী রেলে পাচোরা ষ্টেসন যাইবে। এই স্থান হইতে অনেকে আজাণ্টার-গুহা আরাঙ্গাবাদ ও ইলোরার গুহা দর্শন করিয়া থাকে। পাচোরার মামলতদারের নিকট প্রাপ্ত গোযানে ৮ ঘণ্টায় ৩০ মাইল, পরে ফর্দ্দাপুর পাওয়া যায়। এখানে একজন দর্শক সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ আজাণ্টা বা অজন্তী পর্ব্বত গুহা দর্শন করিবে। খান্দেশের দক্ষিণ সীমায় চান্দর নামে এই পর্ব্বত শ্রেণী তাপ্তী ও গোদাবরীর ক্ষেত্র পৃথক করিতেছে। অজন্তী গ্রামের ৩ মাইল দূরস্থিত এই সকল গুহার খোদকারী এত চমৎকার যে এরূপ খোদকারীযুক্ত গুহা অতি দুর্লভ। ২৯ গুহার মধ্যে ১, ২, ৬, ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৯, ও ২০ নম্বরের গুহার প্রাচীন চিত্রের কিছু কিছু অবশেষ দেখা যায়। যৎকালে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, এই সকল চিত্রে তৎকালীন লোকের পরিচ্ছদ কার্য্য ও অবস্থাদি চিত্রিত দেখিয়া মন গভীর কালের মধ্যে নিমগ্ন হয়। আহা! দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে ভারতের যে ভাব ছিল, আজ তাহাই দর্শন করিতেছি।

ফর্দ্দাপুর হইতে সিল্লদ পল্লী ও ফুলমারী পার হইয়া আরাঙ্গাবাদ নগর। পূর্ব্বে আরাঙ্গাবাদ এ প্রদেশের রাজধানী ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবস্থা। নগরের জলের জন্য পাহাড় কাটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পয়ঃপ্রণালী ও ফোয়ারা সকল এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে প্রশস্ত বাজার ও সম্রাট আরংজেবের ভগ্ন গৃহ। অনতিদূরে আরংজেব কন্যা রাবিয়া দুরানীর মার্ব্বেল কবর। এটী তাজমহলের অপকৃষ্ট অনুকরণ মাত্র। এখান হইতে ৭ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ দেবগিরি বা দৌলতাবাদের কেল্লা। ৫০০ ফীট উচ্চ এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের অধোভাগ ১২০ ফীট পর্য্যন্ত চাঁচিয়া চারিদিকে ঠিক প্রাচীরের মত সরল করা হইয়াছে। কোন দিকে কোনরূপে উঠিবার উপায় নাই। ইহারই চারিদিকে ভয়ঙ্কর গড়খাই তাহার পর প্রাচীর, তাহার পর পুনরায় গড়খাই, তাহার পর পুনরায় প্রাচীর। এই তিন প্রাচীর ও গড়খাই অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইবার অতি সঙ্কীর্ণ অথচ দৃঢ়রূপে রক্ষিত একটী মাত্র সেতু আছে। সেতু দিয়া গেলে

পর্ব্বত মধ্যে একটী মাত্র লোকের প্রবেশ যোগ্য এক সুড়ঙ্গ আছে। পর্ব্বতের অভ্যন্তরে খাত অন্ধকারময়, ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া ক্রমে অধিকতর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ৩ গজ চৌড়া ও ৩ গজ উচ্চ এক স্থান পাওয়া যায়। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্ববত ভিতরে ভিতরে পাহাড় কাটিয়া ধাপে ধাপে এক সিঁড়ি পাহাড়ের শীর্ষপর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে জলআনিবার খাই পর্য্যন্ত এক সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গ মুখে প্রকাণ্ড লৌহের কটাহ আছে। দৈবাৎ ঐ পথে শত্রু আসিলে কটাহের নিম্নস্থ অগ্নির তাপে ভাজা হইত, যাহাহউক এইরূপ বিকটাকার পথ দিয়া উঠিলে পর্ব্বতোপরিস্থ কেল্লায় উঠা যায়। কেল্লামধ্যে একটী জলের কুণ্ড আছে। নিকটে ১৬০ ফীট উচ্চ এক স্তম্ভ। যেখানে নবাবের নিশান খাড়া থাকে তথায় ১৮ ফীট লম্বা ও ১২ সের গোলার উপযুক্ত এক পিত্তলের কামান আছে। এই ভয়ঙ্কর কেল্লা এই অচিন্তনীয় পরিশ্রম করিয়া যে কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার নির্ণয় নাই। অর্দ্ধোন্মত্ত সম্রাট মহম্মদ তোগলক একবার এই স্থানে কয়েকদিন রাজধানী করিয়াছিলেন। এই কেল্লা দেখিতে হইলে আরাঙ্গাবাদের আসিটাণ্ট এড্‌জুটেণ্ট জেনেরেলের নিকট পাস লইতে হয়।

দৌলতাবাদের ৭ মাইল দূরে জগদ্বিখ্যাত ইলোরার গুহা। সেখানে যাইবার কালে উচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থিত প্রশস্ত স্থান মধ্যে দিল্লীস্থ ফকীর নিজামউদ্দীন শিষ্যের কবর দেখিবার যোগ্য। অনতি দূরে রৌজাগ্রাম মধ্যে সৈয়দজৈনুল আবিদীনও শ্বেত-মার্ব্বেলাবৃত ও কাষ্ঠ চন্দ্রাতপবিশিষ্ট সম্রাট আরংজেবের শোভান্বিত কবর। মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তিনি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। এই কবরের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মুসলমান ক্ষমতা ও কবর প্রাপ্ত হইল।

যাহা হউক কিয়দ্দূর পরে প্রাচীন ইলুরু, ইলোরা বা ভিরুল নগরের নিকট দূর হইতে এক অর্দ্ধ চন্দ্রকার পাহাড়ের দেড় মাইল ব্যাপ্ত করিয়া কতকগুলি পশ্চিমাভিমুখী গুহা লক্ষিত হয়। নিকটে গেলে দেখা যায় এ গুলি প্রকাণ্ড দরজা। এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে বিকটাকার পাহাড় কাটিয়া মন্দির ও হর্ম্ম্যাদির অবয়ব বাহির করা হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের কি ভীষণ অবয়ব! আশ্চর্য্য খোদকারী! ও

কি অচিন্তনীয় নির্ম্মাণ কৌশল! দেখিলে বিস্ময় ও হর্ষ যুগপৎ উদয় হয়। আমরা উত্তর প্রান্ত হইতে দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কোন কোন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কোন কোন মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, এই ৩০ গুহার মধ্যে উত্তরদিকের প্রথম ৬ অর্দ্ধ জৈন, মধ্যে ১৪ হিন্দু ও দক্ষিণ প্রান্তস্থ শেষ ১০ বৌদ্ধ সম্বন্ধীয়।

উত্তর প্রান্তে প্রথমে জগন্নাথ সভা গুহায় প্রবেশ করিলাম। ইহার বামদিকে আদিনাথ সভার গুহা ও দক্ষিণে আর কতকগুলি ক্ষুদ্র গুহা। প্রবেশ মুখে ধ্যাননিমগ্ন ২৸০ হাত এক মূর্ত্তি, নাম জগন্নাথ, পার্শ্বে জয় ও বিজয়ের প্রতিরূপ। গুহার মধ্যে দুইটী প্রশস্ত ঘর, অভ্যন্তরের ঘরটী দ্বাদশ স্তম্ভ যুক্ত। ডাইনদিকের কোণ দিয়া উপরে উঠিবার পথ। গুহা গৃহের সর্ব্বভাগ উত্তমরূপ খোদিত ও চিত্রিত। এক দিকে কতকগুলি গায়ক ও নর্ত্তকীর প্রতিরূপ। ইহাদের হস্তে বর্ত্তমান কালীন বাদ্যযন্ত্র দেখিয়া বোধ হয় গুহা নির্ম্মাণের বহুপরে চিত্রিত হইয়াছে। কড়ির নিকটস্থ স্থান সকলে কোথাও চক্র, কোথাও পাগড়ী হীন মনুষ্য ও কোথাও স্ত্রীমূর্ত্তি। জপ করিতেছে এরূপ সারি সারি মূর্ত্তি বিস্তর আছে। হস্তীর উপর মনুষ্য মূর্ত্তি তদুপরি কড়ি। যাহা হউক এই গুহার ভাব বিলক্ষণ গম্ভীর। ইহার প্রবেশ দ্বার ৩৫ ফীট বিস্তৃত, অভ্যন্তর ৫৭ ফীট লম্বা ও ৪৭ ফীট ৭ ইঞ্চি বিস্তৃত। স্তম্ভ ১১ ফীট ৪ ইঞ্চি উচ্চ ও প্রায় ৯ ফীট ৭॥০ ইঞ্চি স্থূল। প্রস্তর কড়ি ২ ফীট মোটা। অভ্যন্তরের গৃহ ৩৪ ফীট লম্বা ও ২০ ফীট বিস্তৃত।

অনন্তর আমরা আদিনাথ সভা গুহায় প্রবেশ করিলাম। এই গুহার প্রবেশ দ্বারের কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। উপরে দুই পরিচারক সহ লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি। বাত বৃষ্টিতে ক্ষয় হইয়াছে। অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠ মধ্যে ২৸০ হাত আদিনাথ মূর্ত্তি। বামে আর একটী ক্ষুদ্র গুহা মাটী পড়িয়া বুজিয়া আছে। স্তম্ভ মস্তক জগন্নাথ সভার স্তম্ভ মস্তকের ন্যায় শোভাশালী। এই গুহার দৈর্ঘ্য ৩০ হাত, বিস্তার ১৯ হাত উচ্চতা ৬ হাত এবং চতুষ্কোণ স্তম্ভের এক এক দিক দুই হাত।

অনন্তর ইন্দ্রসভা গুহা। ইন্দ্রসভা গুহাপুঞ্জ অতি চমৎকার। পর্ব্বত-গাত্রে বিবিধাকারে খোদিত এক রমণীয় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম আমূলাগ্র একটী পর্ব্বত সুন্দর মন্দির রূপ খোদিত হইয়াছে। তাহার শীর্ষঘটা যথার্থই প্রশংসনীয়। মধ্যস্থলে খোদিত সিংহাসনোপরি একধ্যায়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের বামপার্শ্বে সুগঠিত স্তম্ভোপরি কয়েকটী মূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। ডাইনদিকে আরোহীশূন্য এক প্রস্তরহস্তী। এই প্রাঙ্গনের বামে ধ্যায়ীমূর্ত্তিবিশিষ্ট ও উপরিভাগে চিত্রিত আর এক গুহা। এই গুলি অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রসভা নামক গুহার নিম্ন তলের প্রবেশ দ্বার। নিম্নতলে একধ্যায়ী মূর্ত্তি, ডাইনদিকে উপরে উঠিবার সোপান। উপরের গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রমূর্ত্তি বসান হস্তীর উপর উপবিষ্ট। ইন্দ্রের মস্তকে মুকুট, গলে উপবীত, পশ্চাতে ময়ূর শোভিত বৃক্ষ ও পার্শ্বে চামর হস্তে দুই চর। অপর দিকে ৪ সহচরীযুতা ইন্দ্রাণী বালক ক্রোড়ে করিয়া আম্রতলে শয়ান সিংহোপরি উপবিষ্টা। গৃহটী দ্বাদশ স্তম্ভদ্বারা দুই চতুষ্কে বিভক্ত হইয়াছে। অভ্যন্তরের চতুষ্ক মধ্যে সমচতুষ্কোণ বেদী। গৃহের প্রকোষ্ঠ মধ্যে ৩ হাত একধ্যায়ী মূর্ত্তি। গৃহের যে অংশ নিরীক্ষণ করা যায় কত মূর্ত্তি, কতরূপে কি চমৎকারই খোদিত হইয়াছে। ইন্দ্রসভা গুহার প্রবেশ দ্বারের উচ্চতা ৫।০ হাত বিস্তার ৪ হাত, প্রাঙ্গনের দৈর্ঘ্য ৩৬ হাত বিস্তার ৩০ হাত মন্দিরের প্রত্যেক পার্শ্ব ১২ হাত, উচ্চতা ১৮ হাত পার্শ্বের স্তম্ভ উপরিস্থিত মূর্ত্তি সহ ১৬ হাত, তাহার বেষ্টন ৮ হাত, ডাইনের হস্তী লম্বে ৯ হাত উচ্চতায় ৬ হাত, বামদিকের গুহার গভীরতা ২১ হাত বিস্তার ১৮ হাত উচ্চতা ৮ হাত, ঐ দিকে আর এক গুহার গভীরতা ১০ হাত, বিস্তার ৫ হাত উচ্চতা ৪॥০ হাত। ইন্দ্র সভা গুহার নিম্নতলের গভীরতা ৫২ হাত বিস্তার ২৫॥০ হাত উচ্চতা ৯।০ হাত সমকোণ স্তম্ভের প্রত্যেক পার্শ্ব ২॥০ হাত উপরতলের গৃহের গভীরতা বারান্দাপর্য্যন্ত ৫২ হাত বিস্তার ৪৪ হাত উচ্চতা ৯।০ হাত।

অনন্তর পরশুরাম গুহা। ইন্দ্র সভার উচ্চতলের বামদিকে এই গুহা অবস্থিত। শিল্পনৈপুণ্য প্রায় ইন্দ্র সভার তুল্য। এই গুহা হইতে জগন্নাথ সভার উপর তলে যাইবার এক পথ আছে। গুহার গভীরতা ২৪ হাত

বিস্তার ১৭ হাত, উচ্চতা ৬ হাত, সম্মুখের প্রকোষ্ঠস্থ ধ্যারী মূর্ত্তি ২ হাত।

অনন্তর ডুমারলেনা গুহা। পরশুরাম গুহা হইতে প্রায় আধপোয়া দূর, কঠোর পর্ব্বতের মধ্যে খাত এক গলি, গলির বামে মৃত্তিকাপূরিত এক গহ্বর, গলির শেষে এক প্রশস্ত স্থান তাহার সম্মুখে এক ক্ষুদ্র গুহা। প্রশস্ত স্থানের ডাইন পার্শ্বে দুই দিকে সিংহযুক্ত এক প্রকাণ্ড গুহার প্রবেশ দ্বার, প্রবেশমুখে বারান্দা। বারান্দার বামে ষষ্টি হস্ত প্রকাণ্ড ধর্ম্মের মূর্ত্তি। ডাইনদিকে বিশ্বেশ্বরের নন্দী ও প্রেতসহ তাণ্ডব নৃত্য। বারান্দার পর গুহা খণ্ডে খণ্ডে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে। চতুর্থ বা মধ্য খণ্ডের বামে একটী সমচতুষ্কোণ মন্দিরের দ্বার। তাহার ডাইনদিকে চন্দ্র ও ভবানী এবং বামে পবন ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি। এই মন্দিরের নানাদিকে নানা মূর্ত্তি ও মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ।

অনন্তর জনবাস বা বিবাহ গুহা। গবাক্ষযুক্ত বারান্দা দ্বারা গুহার অভ্যন্তর আলোকিত। দ্বারের বামে মহাদেব বিষ্ণু ও ব্রহ্মা মূর্ত্তি, ডাইনে লক্ষ্মীনারায়ণ। বামের প্রান্তভাগে বরাহ অবতারের দশনাগ্রে পৃথিবী উদ্ধার। দক্ষিণদিকের প্রান্তে নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের উদরে একটী স্ত্রীলোক হাত বুলাইতেছে। বারান্দার দৈর্ঘ্য ৪২ হাত, বিস্তার ৫।০ হাত, উচ্চতা ৮ হাত, দ্বারের বিস্তার ৩।০ হাত, উচ্চতা ৫।০ হাত, গৃহের দৈর্ঘ্য ৪৪ হাত, দুই পার্শ্বের প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৪ হাত, গৃহের বিস্তার ১৩ হাত, উচ্চতা ৭৷৷০ হাত ও অভ্যন্তরস্থ গর্ভগৃহের গভীরতা ১৫ হাত, বিস্তার ৮ হাত এবং উচ্চতা ৫৷৷০ হাত। এই গুহার কয়েক হস্ত দূরে আর এক জনাবাস। সম্মুখে ৮ হাত উচ্চ চারি স্তম্ভ ও দুই ভিত্তিলগ্ন স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। তাহার পর দুই দিকে প্রকোষ্ঠ সমন্বিত ৭৪ হাত লম্বা, ১৪ হাত বিস্তৃত ও ১০ হাত উচ্চ এক গৃহ। তদনন্তর ২৬ হাত দীর্ঘ, ২৪ হাত প্রস্থ গর্ভগৃহ স্থান। গর্ভগৃহের সম্মুখে দুইটী স্তম্ভ ও দুইটী ভিত্তিলগ্ন স্তম্ভ। স্তম্ভের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। তিনটী ধ্যারী মূর্ত্তির উপর উপরিভাগে ধুতূরা পুষ্পের ন্যায় খোদিত স্তম্ভ উত্থিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে স্তম্ভ সম উচ্চ দুইটী অর্দ্ধ উলঙ্গ স্ত্রীলোক এক হাতে নৃত্যকারী দুইটী বালকের হস্ত ধারণ ও আর এক হস্তে চামর

উল্লিখিত করিয়া দণ্ডায়মান। গর্ভগৃহ স্থানে সমচতুষ্কোণ গৃহ মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর শিবলিঙ্গ। দ্বারের পার্শ্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি।

অনন্তর কুমারবর গুহা। চারি স্তম্ভদ্বারা এই গৃহ চারি ভাগে বিভক্ত। গর্ভগৃহের দ্বারের উত্তর পার্শ্বে সুন্দর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। কিন্তু উপরকার প্রস্তর ভাঙ্গিয়া পড়াতে প্রবেশদ্বার বন্ধ প্রায়।

অনন্তর ঘানী বা তৈলযন্ত্র গুহা। এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা দেখা গেল। মধ্যে গণেশ ও মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। নিকটে ঐরূপ আর কতকগুলি গুহা।

অনন্তর নীলকণ্ঠ মহাদেব গুহা। প্রবেশমুখে ষাঁড়ের মূর্ত্তি। কালে ক্ষয় হইয়াছে। কয়েকটা সিঁড়ি উঠিয়া ভিত্তিশেষে দুই সৈনিকের প্রতি-রূপ। অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠ মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। গৃহের ভিত্তির দুই দিকে কার্ত্তিক ও গণেশমূর্ত্তি। গণেশ নিকটে সরস্বতী। প্রকোষ্ঠদ্বার পার্শ্বে লক্ষ্মীর নানারূপ। গুহার গভীরতা ২৯ হাত, প্রবেশ মুখের দৈর্ঘ্য ৪৫ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত। প্রকোষ্ঠ ১৯ হাত লম্বা ও ১১ হাত প্রশস্ত। ইহাতে স্তম্ভ ও ভিত্তিলগ্ন স্তম্ভ ১৫ টী আছে।

অনন্তর রামেশ্বর গুহা। প্রবেশ মুখে শয়ান ষাঁড়ের মূর্ত্তি। তাহার বামে চারিদিকে গাঁথান ও পরিষ্কৃত জলপূর্ণ একটী কুণ্ড। গুহা প্রবেশের পূর্ব্বে উভয় প্রান্তে কামিনীর প্রতিরূপ, প্রবেশ দ্বার অতি উত্তমরূপ খোদিত চারি প্রধান স্তম্ভ ও অর্দ্ধ স্তম্ভে শোভিত। অর্দ্ধ স্তম্ভ অর্থাৎ ভিত্তিলগ্ন স্তম্ভোপরি খোদিত স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিটী বড় মনোহর। গুহার অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ। গুহাটী প্রকোষ্ঠ সমাযুক্ত একটী প্রকাণ্ড গৃহ। প্রকোষ্ঠ গুলি খোদিত মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নওছন্দা নামক প্রকোষ্ঠ ডাইনদিকে অবস্থিত। ইহার ডাইন ভাগে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট এক কৃপণ আহারের জন্য ক্রন্দন-শীল স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ বসিয়া আছে এবং দুই জন চোর তাহার অর্থ চুরি করিতেছে। ইহার অপরদিকে কালভৈরব নৃত্য করিতেছে এবং ভূত প্রেত করতালি দিতেছে। প্রকোষ্ঠ হইতে পুনরায় গৃহে আসিয়া ডাইনদিকে গেলে দেখা যায় যে, হরপার্ব্বতী ক্রীড়া করিতেছেন ও নারদ বিবাদ লাগাই-বার জন্য মধ্যস্থলে উৎসাহ দিতেছেন। নিম্নে বিবাদ লাগিয়াছে ও একটা

চিত্র পশ্চাৎ দেশ তুলিয়া বিবাদে রঙ্গ করিতেছে। গৃহের প্রান্তে বাম-দিকের প্রকোষ্ঠে ডাইনপার্শ্বে দেব দেবী সহ ভবানী ও বামপার্শ্বে ময়ূর সহ কার্ত্তিক। প্রকোষ্ঠের মধ্যে ভিত্তির উপর জনকের বাটীতে বিবাহ উৎসব। এক জন একটা ফল ধরিয়া দণ্ডায়মান ও নিম্নে গণেশ ব্রহ্মাদি দেবগণ বসিয়া আছেন। এখান হইতে বাহির হইয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলে বামদিকে এক মনোহর মূর্ত্তি। কৈলাসে সিংহাসনোপরি চতুর্হস্ত শিব অর্দ্ধ উলঙ্গ পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে করিয়া উপবিষ্ট। এক হাত আপন উরুদেশে, আর এক হাত পার্ব্বতীর গলে ও তৃতীয় হস্ত দ্বারা পার্ব্বতীর পীন স্তনের নিম্নভাগ ধরিয়া সহাস্যমুখে মর্দ্দন করিতেছেন। দুই পার্শ্বের দুই প্রমথ চামর হস্তে তাহা দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আছে। সিংহা-সনের সিঁড়িতে বসিয়া দুইটা বানর বা ভূত হস্ত নাড়িয়া কাহাকে ডাকি-তেছে। ভীষণ মূর্ত্তি রাবণ বীরদর্পে উপবিষ্ট হইয়া কৈলাস সহ এই সিংহাসন উত্তোলন করিতেছে। তাহার অবশিষ্ট দুই হাত সাহঙ্কার ভাবে দুই উরুতে সংস্থাপিত। এই গুহার কতদিকে কতরূপ কত মূর্ত্তি। প্রকোষ্ঠ সহ গৃহের দৈর্ঘ্যতা ৬০ হাত, গভীরতা ৪৮ হাত ও উচ্চতা ১০ হাত। কৈলাস গুহা। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে এক প্রশস্ত স্থান। ৩২ হাত উচ্চ পাহাড় কাটিয়া ৯২ হাত দীর্ঘ ও ৫৮ হাত বিস্তৃত এই স্থান করা হইয়াছে। প্রবেশ দ্বারের ডাইন পার্শ্বে একটী জল-পূর্ণ কুণ্ড এবং উভয় পার্শ্বে উৎকৃষ্টরূপ খোদিত, শীর্ষ সমাযুক্ত ও একতলা সম উচ্চ দুইটা বিভাগ অগ্রসর হইয়া আছে। প্রবেশদ্বার অতি প্রশস্ত, উচ্চতা ৯ হাত, বিস্তার ৯ হাত ও গভীরতা ২৮ হাত। দ্বারে প্রবেশ করিয়া এই ২৮ হাত পার হইবার কালে দুই পার্শ্বে ১০ হাত দীর্ঘ ও ৬ হাত বিস্তৃত দুই ঘর। দরজার উপর নওপতখানা ৯ হাত লম্বা ৫ হাত চৌড়া ও ৫ হাত উচ্চ। দরজার দোতলার গৃহের বাহিরে গ্রীকজাতীয় চমৎকার স্তম্ভমালা। দরজার পথে অষ্টভুজা ভবানী ও গণেশের সুন্দর মূর্ত্তি। যাহা হউক দরজা পার হইয়া এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে পড়িতে হয়। ৬৬ হাত উচ্চ পাহাড় কাটিয়া ১৬৪ হাত দীর্ঘ ও ১০০ হাত প্রস্ত এই বিশাল স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাঙ্গনের চারিধারে চকমিলান বাটীর ন্যায় সজ্জীভূত

ঘর, এবং প্রাঙ্গনের মধ্যভাগে এক বিশাল হর্ম্য। প্রকাণ্ড পাহাড় কাটিয়া বাহির করা এই প্রস্তর গৃহের সুগঠিত শীর্ষ, আশ্চর্য্য অবয়ব, নানারূপ গঠন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খোদকারী ও বিবিধ স্থানে বিবিধরূপ কল্পনার বর্ণন করা দূরে থাকুক দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একি দৈত্যের করা! কি মানুষের কার্য্য! একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন, পুরাকালে শস্যশালিনী ভারতের প্রজাগণ সামান্য কষ্টে সকল বিষয় উপভোগ করিত। আহারান্তে তাহাদের কোন কাজ ছিল না, এই জন্য দেশের লোক একত্রিত হইয়া ভূমণ্ডলের বিস্ময়জনক এই সকল অদ্ভুত কীর্ত্তি করিয়াছে। এই গুহা প্রস্তুত করিতে এক সঙ্গে যে কত লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না।

যাহা হউক মধ্যস্থলের বিশাল হর্ম্যের উপরতলে যাইবার জন্য মধ্যস্থলের হর্ম্য ও দ্বার এই উভয়ের মধ্য ভাগে প্রাঙ্গনের উপর একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ আছে। এই গৃহের এক পার্শ্ব দ্বারের উপরতলার সহিত ও অপর পার্শ্ব মধ্যস্থ প্রধান হর্ম্যের উপর তলের সহিত দুই খণ্ড সেতু দ্বারা সংযুক্ত। মধ্যস্থলের প্রধান হর্ম্যের ডাইন ও বামদিকে স্থানেস্থানে এক একটী বিভাগ বাহির হইয়াছে। প্রথমে ডাইনে ও বামে উভয় পার্শ্বে দুইটী ঘর ইহার গাত্রে লগ্ন। কিছু দূর পরে উভয় পার্শ্বে ঐরূপ আর দুইটী বিভাগ। অল্প দূর পরে ঐরূপ আর দুই গৃহ প্রধান হর্ম্যে সংযোজিত ও পশ্চাত দিকেও একটী ঘর সংলিপ্ত আছে। দ্বারে দাঁড়াইয়া সাধারণতঃ এইরূপ দৃশ্য নেত্রপথে পতিত হয়। এখন আমরা অগ্রে নিম্নতল দর্শন করিব। প্রথমে দ্বার হইতে অবতরণ করিলাম। মস্তকের উপর পূর্ব্ব বর্ণিত সেতু। দক্ষিণে ও বামে প্রাঙ্গন মধ্যে দুইটী জীবিতাপেক্ষা বৃহৎ হস্তী দণ্ডায়মান। সম্মুখে স্তম্ভ ও নানা মূর্ত্তিযুক্ত পূর্ব্ব বর্ণিত দ্বিতল গৃহের নিম্নভাগ। দ্বিতল গৃহের দুই পার্শ্বে ৭ হাত অন্তরে প্রাঙ্গন মধ্যে সুন্দর খোদিত দুইটী প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ। ইহার উচ্চতা ২০ হাত, ও নিম্নভাগ ৭ হাত সমচতুষ্কোণ। বোধ হয় মস্তকে সিংহ ছিল। দ্বিতল গৃহের নিম্নভাগ পার হইয়া দ্বিতীয় সেতুর নিম্নে উপস্থিত হইলাম। ইহার এক পার্শ্বে সভাসদসহ প্রকাণ্ড ভোজরাজ বসিয়া আছেন, আর এক পার্শ্বে দশহাত এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

সেতুর শেষে মধ্যস্থ বিশাল হর্ম্মোর গাত্রদেশ। উপরে উঠিবার জন্ম গাত্রের দক্ষিণে ও বামে ৩৬ ধাপে দুইটা সিঁড়ি। তদনন্তর আমরা মধ্যস্থ বিশাল হর্ম্মোর ডাইনদিকের গাত্র সংলগ্ন প্রথম গৃহে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ মাত্র সম্মুখে রাম রাবণের ভীষণ যুদ্ধের প্রতিরূপ। ইহার মধ্যে হনুমান মুর্ত্তিটিই চমৎকার। আর এক পার্শ্বে সিংহ, হস্তী ও অপরাপর ভয়ঙ্কর জন্তুর মস্তক বহির্গত। যেন তাহারা স্কন্ধে করিয়া হর্ম্ম্য বহন করিতেছে। ইহার কিছু দূর পরে বিশাল হর্ম্মোর গাত্রলগ্ন দ্বিতীয় গৃহ, পরে তৃতীয় ও পশ্চাতের গৃহ। ইহাতে বিশেষ দেখিবার কিছুই নাই। বামদিকের প্রথম গৃহে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহে বিশেষ কিছু নাই।

এখন আমরা প্রধান হর্ম্ম্যের উপরিভাগ দর্শন করিব। পুনরায় প্রবেশ দ্বারে প্রত্যাগত হইয়া দ্বারের উপরতলে উঠিলাম। দ্বারের উপর সম্মুখে সারি সারি তিন ঘর, মধ্যকার গৃহের দুই পার্শ্বে আর দুই ঘর। সম্মুখের ঘর প্রত্যেকে দীর্ঘ প্রস্থ ও উচ্চতায় ৬ হাত। পার্শ্বের গৃহ প্রত্যেকে ১৫ হাত লম্বা ও ১০ হাত বিস্তৃত। সম্মুখের তিন ঘর পার হইয়া সেতু। সেতুর দৈর্ঘ্য ১৩ হাত, বিস্তার ১২ হাত ও উভয় পার্শ্বের প্রাচীর ২।০ উচ্চ। তাহার পর ৯টা ধাপ উঠিয়া দ্বিতল গৃহে প্রবেশ। দ্বিতল গৃহ প্রতিদিকে দশহাত। ইহার মধ্যস্থলে নন্দীনামক প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মূর্ত্তি। দ্বিতল গৃহ পার হইয়া দ্বিতীয় সেতু ২৫ হাত লম্বা ও ১৪ হাত বিস্তৃত। এই সেতু শেষে দুই পার্শ্বে দুই স্তম্ভ তাহার উপরে সিংহ ও নিম্নে সিংহবৎ মূর্ত্তি, আর দুইটী অর্দ্ধ স্তম্ভ বিশাল হর্ম্মোর গাত্রে সংলগ্ন। বারান্দা লম্বে ১২ হাত বিস্তারে ১০ হাত ও ইহার পার্শ্বস্থ প্রাচীর ১১ হাত উচ্চ। বারান্দায় ২॥০ হাত উচ্চ ও ২।০ হাত বিস্তৃত বসিবার প্রস্তরবেঞ্চ। পূর্ব্ব বর্ণিত নিম্নের দুই পার্শ্বের সিঁড়ি দিয়াও এখানে উঠা যায়। বারান্দা হইতে চারিটী উৎকৃষ্ট ধাপের পর বিশাল মন্দিরের দ্বারদেশ। দ্বারের উভয়পার্শ্বে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। দ্বারটী ৮ হাত উচ্চ ও ৪ হাত বিস্তৃত। দ্বার পার হইয়া বিস্তীর্ণ মণ্ডপগৃহ ও তৎপরে অর্দ্ধমণ্ডপ ও তৎপরে ৫ ধাপের উপর গর্ভ গৃহ, তন্মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব। দ্বার হইতে গর্ভগৃহের ভিত্তিপর্য্যন্ত মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৬২ হাত, বিস্তার ৪০ হাত ও কড়ির নিকট পর্য্যন্ত উচ্চতা ১২ হাত। মণ্ডপের মধ্যে ছয়টী করিয়া ছয়

থাকে ছত্রিশ স্তম্ভ আছে। ভিত্তির নিকটস্থ স্তম্ভসমূহ ভিত্তিতে সংলগ্ন। ঝড়ি অর্থাৎ কড়ির নিকটস্থ ভাগ চূর্ণে আবৃত ও নানা চিত্রে শোভিত। দ্বার দেশের উভয় পার্শ্বে ভূরি ভূরি মূর্ত্তি। তিন থাক স্তম্ভের পর এই মণ্ডপের দক্ষিণে ও বামে দুই বারান্দা। এই বারান্দাদ্বয় নিম্নভাগের রাম রাবণ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ গৃহের উপরে সংস্থিত। ডাইনদিকের বারান্দা হইতে প্রাঙ্গনের ডাইন প্রান্তস্থ গৃহে যাইবার সেতু ছিল। এখন ভাঙ্গিয়া পড়াতে যাওয়া ভার। মহাদেবের দিকে মণ্ডপের দুই কোণের নিকট দুই দ্বার। দুই দিকের দুই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দুই প্রশস্ত স্থান। উভয়দিকের প্রশস্ত স্থানের দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড মন্দির। মধ্যে শিব নাই। নিম্নতলের দুই দিকের ভিত্তি সংলগ্ন দ্বিতীয় বিভাগ দ্বয়ের উপর এই মন্দিরদ্বয় সংস্থিত। এই মন্দিরদ্বয়ের পার্শ্বে প্রধান মন্দিরের পশ্চাত ভাগস্থ প্রশস্ত স্থানে আর তিন মন্দির। দুইটী দুই পার্শ্বে ও একটী মধ্যস্থানে অবস্থিত। পার্শ্বের দুইটী নিম্নের দুই দিকের তৃতীয় ভাগদ্বয়ের উপর এবং মধ্যকারটী পশ্চাৎদিগের বহির্গত ভাগের উপর সংস্থাপিত আছে। ইহাদের মধ্যেও শিব নাই। শিব-যুক্ত প্রধান মন্দিরের পশ্চাৎ দেশ হইতে পশ্চাতস্থ মন্দিরের ভিত্তি পর্য্যন্ত ২৬ হাত। এই সকল মন্দিরের শীর্ষঘটা ও অভ্যন্তরস্থ চিত্র অতি চমৎ-কার। কিন্তু অভ্যন্তরের অনেক ভাগ ধূমে ধূসরিত, হইয়াছে। দুরাত্মা আরংজেব কোনরূপে ইহার ক্ষতি করিতে সমর্থ না হইয়া অভ্যন্তর ভাগ খড়পূর্ণ করিয়া অগ্নি প্রদান করে। তাহারই জন্য কোন কোন স্থান ধূসরিত। যাহা হউক মধ্যস্থ এই বিশাল হর্ম্ম্যের শীর্ষপর্য্যন্ত উচ্চতা ৬০ হাত, পার্শ্বস্থ অপরাপর মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩৪ হস্ত।

এইরূপে মধ্যভাগের বিশাল হর্ম্ম্য পরিদর্শন করিয়া আমরা প্রাঙ্গন প্রান্তস্থ চতুর্দ্দিকের চকমিলানের ন্যায় গৃহাবলী দর্শন করিতে অগ্রসর হই-লাম। অগ্রে উত্তর বা বামদিকের নিম্নতল দর্শন করা যাউক। প্রথমে একটী গুহা, সম্মুখ প্রান্তে দুইটী স্তম্ভ ও তিনটী স্ত্রীমূর্ত্তি চূর্ণিত প্রস্তরে অর্দ্ধ নিমগ্ন। গুহার দৈর্ঘ্য ১৪ হাত, বিস্তার ৫ হাত ও উচ্চতা ৬ হাত। অনন্তর আর এক গুহা। ইহার সম্মুখে ৫ স্তম্ভ। এই গুহার দৈর্ঘ্য ৩৮ হাত, বিস্তার ৪ হাত ও উচ্চতা ৭ হাত। এই স্থানে উপরতলে উঠিবার সিঁড়ি। তাহার

পর কিছুদূর গুহা নাই। তদনন্তর দুই বৃহৎ সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ ও অভ্যন্তরে বেদীযুক্ত ৩৬ হাত লম্বা, ৮ হাত চৌড়া ও ১০ হাত উচ্চ এক গুহা। তাহার পর ৪ হাত উচ্চ ও ১॥০ হাত বিস্তৃত এক দ্বার দিয়া প্রায় ২ হাত সমচতুষ্কোণ একাদশ স্তম্ভ শোভিত এক বারান্দা। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৮ হাত, বিস্তার ৮ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত। অনন্তর আমরা বিশাল হর্ম্ম্যের পশ্চাতে পূর্ব্বদিকস্থ নিম্নতলের বারান্দায় প্রবেশ করিলাম। এই বিস্তীর্ণ বারান্দা লম্বে ১২৪ হাত, বিস্তারে ৮ হাত এবং সারি সারি সপ্তদশ স্তম্ভে বিভূষিত। ইহার পর প্রাঙ্গনের ডাইন প্রান্তস্থ দক্ষিণদিকের গৃহ সমূহ। প্রথমে পূর্ব্বদিকের বারান্দার সহিত সংলগ্ন বারান্দা ১০ স্তম্ভে সজ্জিত। আরংজেব তিনটী ভগ্ন করিয়াছে। বারান্দার প্রবেশদ্বার ৪ হাত উচ্চ ও ১॥০ হাত প্রশস্ত। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০ হাত, বিস্তার ১১ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত। এই বারান্দার মধ্যে ৪০ হাত লম্বা, ১৪ হাত চৌড়া ও ৮ হাত উচ্চ কতক খোদিত এক গৃহ। নিকটে ১০ হাত দীর্ঘ, ৮ হাত বিস্তৃত ও ৪ হাত উচ্চ এক গৃহ কতকগুলি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া আছে। ৮ হাত উচ্চ স্থানোপরি ২৪ হাত লম্বা, ১০ হাত গভীর ও ৮ হাত উচ্চ এক গুহা। ইহার অভ্যন্তরে ভিত্তি হইতে বিসৃষ্ট ভূরি মূর্ত্তি। কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। আর একটা বৃহৎ মূর্ত্তি শয়ান এক উলঙ্গ মূর্ত্তির উপর পা দিয়া বসিয়া আছে। ৪॥০ হাত লম্বা, ৪ হাত বিস্তৃত ও ৫ হাত উচ্চ এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ১৬ হাত লম্বা, ১২ হাত গভীর ও ৬ হাত উচ্চ এক গুহা। অনন্তর দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে ১৬ হাত লম্বা, ৬ হাত বিস্তৃত ও ৮ হাত উচ্চ এক গুহা। এইরূপে চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহের নিম্নতল দর্শন করিয়া আমরা তদুপর তল দেখিবার জন্য উপরে উঠিয়া পুনরায় বামদিক হইতে দর্শন আরম্ভ করি। প্রথম গুহার উপর কতক খোদিত একটা গৃহ। দ্বিতীয় গুহার উপর পুর লঙ্কা নামক গৃহ। আমরা সিঁড়ির ২৫ ধাপ দিয়া উপরে উঠিলাম। দ্বারের উপর ষাঁড় এবং দুইদিকে গদার উপর দুইটী উত্তম মূর্ত্তি। গৃহের প্রান্তে গর্ভগৃহে লিঙ্গ মূর্ত্তি মহাদেব। মণ্ডপের স্তম্ভ সকল অত্যন্ত স্থূল। মণ্ডপটী উত্তম খোদিত ও চিত্রিত ভূরি ভূরি দেব দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূরিত। ধূমাতে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪৬ হাত, প্রস্থ ৪০ হাত এবং

উচ্চতা ৯।।০ হাত, ডাইনদিকের দ্বিতলের মধ্যে প্রথম দ্বিতল ৪০ হাত দীর্ঘ, ১৬ হাত উচ্চ ও ১২ হাত গভীর। ইহার সহিত সংযুক্ত আর এক অন্ধকার গৃহ। এই গৃহের গভীরতা ১৯ হাত, দৈর্ঘ্য ২৪ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত। দ্বিতীয় দ্বিতলটীতে উঠিবার সিঁড়ির ২৪ ধাপ। ইহার পরিমাণ নিম্নতলের গৃহের সদৃশ। এই গৃহের সংলগ্ন আর এক গৃহে পর্ব্বত ধসিয়া পড়িতেছে।

এখন আমরা বারান্দার গাত্রের মূর্ত্তিগুলি ক্রমান্বয়ে বর্ণন করিয়া কৈলাস গুহা শেষ করিব। বারান্দার অভ্যান্তরটী দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পূরিত। প্রথমে বিকটাকার মূর্ত্তি রাবণ মহাদেবকে ধারণ করিয়া আছে। তদনন্তর পার্ব্বতী। তৎপরে রাবণ বসিয়া কি লিখিতেছে। তাহার পর ষাঁড়ের উপর মহাদেব ও পার্ব্বতী, তদনন্তর আর এক ঐ মূর্ত্তি, তাহার পর বিষ্ণু, তদনন্তর পার্ব্বতী। তৎপরে বিষ্ণুভক্ত পদে শৃঙ্খলজড়িত করিয়া আছে। তাহার পর পুনরায় পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর এই সকল মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন। তদনন্তর দুইবার বিষ্ণু ও লক্ষ্মী মূর্ত্তি। তদনন্তর পিণ্ড হইতে বলভদ্র নির্গত হইতেছে। তৎপরে পূর্ব্বদিকের বারান্দা আরম্ভ। ইহার প্রথমেই পার্ব্বতী। তাহার পর ভৈরব এক জনকে শূলে বিদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। তাহার পর রথে এক দৈত্য ধনু আকর্ষণ করিতেছে। ইহার পর পার্ব্বতী ও কালভৈরব। তদনন্তর নরসিংহ অবতার স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইতেছে। তাহার পর আর দুই ভৈরব। পরে বিষ্ণু, গোবিন্দ, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, মহাদেব, নারায়ণ ভৈরব গোবিন্দ, কালভৈরব গোবিন্দ, লক্ষ্মী ও কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পূর্ব্ব বারান্দা শেষ। ইহার পর দক্ষিণের বারান্দায় মহাদেব ও ইতলদাস। তাহার পর ধর্ম্মরাজ এক জনকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তদনন্তর নরসিংহ অবতারের হিরণ্যকশিপু বধ, তাহার পর শেষনাগের উপর শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উপবিষ্ট। ইহার পর গোবর্দ্ধন, ছয়হস্তযুক্ত বলি, গরুড়ের উপর কৃষ্ণ, বরাহ অবতার, কালীয় নাগোপরি চতুর্ভুজ কৃষ্ণ বলদেব ও অন্নপূর্ণা। প্রত্যেক মূর্ত্তি পার্শ্বে তল্লীলা প্রকাশক নানা মূর্ত্তি। ইতি কৈলাস গুহা।

অনন্তর দশ অবতার গুহা। পূর্ব্ব প্রবেশ দ্বার সংরুদ্ধ। এ জন্য কর্কশ প্রস্তরের উপর দিয়া কষ্ট করিয়া উঠিতে হয়। প্রবেশ করিয়া এক প্রশস্ত স্থান। তন্মধ্যে এক সমচতুষ্কোণ গৃহ, বারান্দা ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, এক

দিকে একটা শুষ্ক জলাশয় ও অপরদিকে জলপূর্ণ এক ক্ষুদ্র কুণ্ড। গৃহে প্রস্তরের জাফরী, জাফরীর দুই পার্শ্বে বৃহৎ মূর্ত্তি এবং উপরিভাগে বহুমূর্ত্তি। গৃহটী লম্বে ২০ হাত বিস্তারে ১৭ হাত ও উচ্চতায় ৬।০ হাত। ইহার পর উপর ও নিম্নে ৬ সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ ও দুই অর্দ্ধস্তম্ভবিশিষ্ট এক দ্বিতল গৃহ। উপরে যাইবার রাস্তা বন্ধ। উপরিভাগের গৃহ মধ্যে ৮ থাক চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। গৃহের প্রকোষ্ঠ মধ্যে মহাদেব এবং মহাদেবের দ্বারদেশে দশ অবতারাদির মূর্ত্তি। নিম্নের গৃহ দৈর্ঘ্যে ৬৮ হাত, বিস্তারে ৩০ হাত, উচ্চতায় ৯ হাত এবং উপরের গৃহ দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত, গভীরতায় ৬৬ হাত, উচ্চতায় ৯ হাত। গুহার অনেক ভাগ ভগ্নপ্রস্তরে আবৃত।

অনন্তর ত্রিতলগুহা। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে প্রতিতলে দশটী চতুষ্কোণ স্তম্ভ শোভিত এক ত্রিতল গৃহ। পার্শ্বের দুইটী স্তম্ভ ভিত্তিলগ্ন এবং নিম্নতলের মধ্যকার দুইটী খোদিত। প্রাঙ্গনের বাম কোণে একটী জলপূর্ণ কুণ্ড। নিম্ন তলের গৃহ ৬ স্তম্ভে তিনভাগে বিভক্ত। মধ্য ভাগের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে শেষ নাগের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। চতুর্থ স্তম্ভ হইতে গৃহ ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়াতে দুই পার্শ্বে আরও দুইটী প্রকোষ্ঠ জন্মিয়াছে। ইহার এক দিকে শঙ্করাচার্য্য, অপর দিকে আদিনাথের মূর্ত্তি। দ্বারের পার্শ্বেও বড় বড় মূর্ত্তি। এই গৃহের গভীরতা ২৭ হাত, দৈর্ঘ্য ৭৮ হাত, উচ্চতা ৭ হাত, প্রকোষ্ঠের গভীরতা ২৯ হাত। মধ্যস্থ গৃহের গভীরতা ৮ হাত, বিস্তার ১২ হাত, উচ্চতা ৯ হাত। মূর্ত্তির উচ্চতা ৭।০ হাত। তদনন্তর ডাইনদিকের ২৪ ধাপ দিয়া দ্বিতলে উঠিতে হয়। উঠিবার কালে দূরে পাহাড়ের গাত্রে মূর্ত্তিবিশিষ্ট এক গুহা দর্শন হয়। দ্বিতলের প্রবেশমুখে একটী উৎকৃষ্ট বারান্দা। বারান্দার সম্মুখে যম বসিয়া আছে। বারান্দার প্রত্যেক পার্শ্বে এক দরজা। তন্মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে পর্ব্বত প্রান্তে চারিটী ঘর। মধ্যস্থ গৃহমধ্যে লক্ষ্মণ বসিয়া আছেন এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। বারান্দার দৈর্ঘ্য ৭৬ হাত গভীরতা প্রকোষ্ঠ সহ ৪৪ হাত, উচ্চতা ৮ হাত এবং প্রকোষ্ঠ ১০ হাত। বারান্দার বিপরীত পার্শ্বের দরজা দিয়া ২৪ ধাপ উঠিবার পর তৃতীয় তলের বারান্দা। ইহাতে প্রকাণ্ড সহদেব তৎপরে নকুল ভীম অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজের মূর্ত্তি। বিপরীত

দিকে উদ্ধব, মাধব ও জীদামাদির মূর্ত্তি। ষষ্ঠ স্তম্ভের পর হইতে বারান্দা ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়াতে দুই পার্শ্বে দুইটা প্রকোষ্ঠ জন্মিয়াছে। ইহাতে কুঞ্চিত-কেশযুক্ত চতুর্দ্দশ মূর্ত্তি বসিয়া আছে। আর একটী স্থানে কতক গুলি মূর্ত্তি, কতক বসিয়া ও কতক দণ্ডায়মান আছে। ইহারই নিকট তিনটী সিঁড়ি দিয়া একটা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে গেলে গৃহ মধ্যে সিংহাসনোপরি ভ্রাতৃ সহ প্রকাণ্ড রাম উপবিষ্ট। সীতার মূর্ত্তি অপরদিকে আছে। এই বিস্তৃত গুহার পারিপাট্য অতি চমৎকার। কড়ির নিকট চিত্রের দাগ পাওয়া যায়। ত্রিতলের বারান্দার দৈর্ঘ্য ৭৩ হাত, গভীরতা প্রকোষ্ঠ সহ ৪৪ হাত, প্রকোষ্ঠ গভীরতা ১১ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত।

অনন্তর ভরত শত্রুঘ্ন গুহা। ইহার দুই তলা বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্টাংশ ভগ্নপ্রস্তরে পূরিত। নিম্নতলের দৈর্ঘ্য ৬৮ হাত, গভীরতা ১৬ হাত ও বারান্দার বিস্তার ৫ হাত। ১৬ ধাপ দিয়া উপরে উঠিলে এক প্রকোষ্ঠ সমধিক বারান্দা। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৮ হাত, গভীরতা ২৯ হাত ও উচ্চতা ৬ হাত।

বিশ্বকর্ম্মা গুহা। ইহার প্রবেশ দ্বার রাজবাটীর প্রবেশদ্বারের ন্যায় অতি শোভাকর। প্রথমে সারি সারি স্তম্ভযুক্ত এক বিস্তীর্ণ বারান্দা দেখা যায়। উহার উপরিভাগে কার্ণিস স্থানে হস্তী পৃষ্ঠে, অশ্ব পৃষ্ঠে, নানা খোদিত মূর্ত্তি। তাহার উপর কয়েকটা বিটকাটা। তাহার উপর শোভমান নানাচিত্রযুক্ত ত্রিকোণাকার দ্বারমস্তক, দ্বারমস্তকের মধ্যেভাগ নওপথ-খানার জন্য খোলা হইতেছিল। মস্তকের দুই পার্শ্বে খোদকারীপূর্ণ ও মূর্ত্তি সমাযুক্ত দুইটী প্রকাণ্ড মন্দিরের অগ্রভাগ সংস্থাপিত। বারান্দার মধ্যস্থ দ্বার দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। বিশ্বকর্ম্মার মন্দির এক বিস্তীর্ণ গুহা, ইহা দক্ষিণ ও বামে দুই স্তম্ভশ্রেণীদ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উপরিভাগ খিলান করার ন্যায় কাটা, কার্ণিসের নিকটে সারি সারি মূর্ত্তি উপবিষ্ট। গৃহের স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যভাগে প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ অঙ্গুলি ধরিয়া বসিয়া আছে। বিশ্বকর্ম্মার দুইপার্শ্বে সূত্রধরের যন্ত্র স্কন্ধে করিয়া দুই মূর্ত্তি বর্ত্তমান। লোকে বলে বিশ্বকর্ম্মা ছয়-মাস রাত্রিতে এই সকল গুহা রামের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার

কার্য্য শেষ হইতে না হইতে কুক্কুট ডাকাতে ভোর হইয়া গেল। তিনিও তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহাই ধরিয়া রক্ত থাম্বাইতেছেন। ইংরেজেরা এই গুহার গাম্ভীর্য্য ও চমৎকারিতা দেখিয়া বলেন যে, এই প্রশস্ত স্থান ধর্ম্মোপাসনার মন্দিরের যোগ্য। এবং জগৎ নির্ম্মাতা ঈশ্বর যেন বিশ্বকর্ম্মা রূপে বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়া আছেন। গুহাক্ষেত্র প্রত্যেক দিকে ৩২ হাত, ১৪ স্তম্ভযুক্ত বাহিরের বারান্দা ৯ হাত বিস্তৃত ও কড়ি পর্য্যন্ত ৭ হাত উচ্চ। দ্বার ৫ হাত উচ্চ ও ২॥০ হাত প্রশস্ত। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৫২ হাত বিস্তার ২৯ হাত ও খিলানের খাতসহ উচ্চতা ২৪ হাত, খাত ত্যাগ করিয়া উচ্চতা ১০ হাত। এক এক পার্শ্বের ভিত্তি হইতে মধ্যস্থ স্তম্ভমালার অন্তর ৫ হাত। অষ্টাবিংশতি অষ্টকোণ ও ২ চতুষ্কোণ স্তম্ভের বেষ্টন ৫ হাত। বেদীর উচ্চতা ১৬ হাত।

দেরওয়ারা বা মেথরের গুহা। এই গুহা শেষ গুহা। ইহা জগন্নাথ সভা হইতে ১ মাইল দূর। নামের কারণে কেহ এ গুহায় প্রবেশ করে না। এখান হইতে দূরের ইলুকনগর দেখিতে অতি সুন্দর। বোধ হয় এই গুহাতে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়।

ইলোরা গ্রামের এক মাইল দূরস্থিত এই সকল গুহা দর্শন করিয়া গোযানে দেওগাঁ হইয়া নাঁদগাও ষ্টেসনে রেলগাড়ী প্রাপ্ত হইবে। ইলোরা দর্শনেচ্ছু বম্বের যাত্রিরা নাদগাঁ হইতে এই পথে ডাকগাড়ীতে ইলোরা ও আরাঙ্গাবাদ যায়। আরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত জনপ্রতি ভাড়া দশটাকা।

নাদগাঁ হইতে রেল ক্রমে সহ্যঘাটের দিকে দক্ষিণ পশ্চিমে গমন করিয়াছে। ডাইনদিকে পর্ব্বতোপরি চন্দহারির কেল্লা দেখা যায়। ঘাটের এই সকল শৃঙ্গ পূর্ব্বে জ্বালামুখী বা আগ্নেয় গিরি ছিল।

নাদগাঁর পর কয়েক স্থান পার হইয়া নাসিকরোড। ষ্টেসন হইতে নাসিক নগর উত্তর পশ্চিমে ৬ মাইল। নিকটেই চারিজনের বসিবার উপযুক্ত ঘণ্টায় ৭ মাইলগামী টোঙ্গা নামক আবৃত গাড়ী দৈনিক ২॥০ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়। নাসিক নগর দেখিয়া কাশীর ভাব মনে হইল। বিস্তৃত অগভীর ও খরস্রোতা গোদাবরী তটে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ঘাট ও মন্দিরের শোভা। পুলিনদেশে কেহ স্নান করিতেছে,

কেহ জপ করিতেছে, কেহ দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতেছে ও কেহ বা "ত্রিয়ম্বকং জটোদ্ভূতে গৌতমপাপবিনাশিনি," বলিয়া গোদাবরীর স্তব করিতেছে। উপরে কেহ মন্দিরে দৌড়িতেছে, কেহ পূজা করিতেছে ও কেহ বা সৌরকিরণে সমুদ্ভাসিত বিপণি মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে। যৌবনোন্মত্তা কামিনীকুলে নগর কম্পিত প্রায়। বিসপ হিবর আদি ভ্রমণকারী কহিয়াছেন, নারিকেল বর্ণা ভারত কামিনীরা শ্বেতবর্ণা ইয়ুরোপীয় কামিনী অপেক্ষা মনোরমা। এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে দশ হাজার ব্রাহ্মণ। গৌতমীর উত্তরতটস্থিত এই নগরে প্রবেশ করিয়া আমরা পঞ্চবটীতে রঘুনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পঞ্চবটে পঞ্চবটী বিদ্যমান এতদ্ব্যতীত এখন আর কোন বন নাই। নাসিক হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। এই স্থানে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন বলিয়া নাম নাসিক হইয়াছে। এই স্থানে রাম সীতার জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। এই স্থানের বর্ণনে বাল্মীকী জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন। লোকে বলে এখান হইতে বহুদূরে ঝিড়ি কালুতে মারীচ বধ হইয়াছিল। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক ঐ স্থানে ধাবমান হরিণের পদচিহ্ন প্রস্তরোপরি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যাহা হউক এখান হইতে ২০ মাইল দূরস্থিত গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান দর্শন একান্ত প্রীতিপ্রদ। প্রতিস্রোতা গোদাবরী অবলম্বন করিয়া ৮ মাইল দূরে গঙ্গাপুরে একটী সুন্দর জলপ্রপাত ও নয়টী মন্দির দেখা যায়। ৫ মাইল দূরে নদীতটে একটী ভগ্ন কেল্লা। ২০ মাইল দূরে উচ্চ পর্ব্বতোপরি গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান ত্র্যম্বকনাথ। স্থান অতি মনোরম ও বৃক্ষলতা কুঞ্জে শোভিত। শত শত লোক ত্র্যম্বকনাথ মহাদেবের পূজা করিতেছে। গোদাবরীর উৎকৃষ্টতম এই তীর্থে হরিদ্বারের ন্যায় দ্বাদশ বর্ষান্তে বিস্তর যাত্রী উপস্থিত হয়। গৌতমের পাপনাশের জন্য গঙ্গা গোদাবরী হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিতা হইয়াছেন। নাসিকের ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চতুর্থ শতাব্দীতে খোদিত বৌদ্ধদিগের পাণ্ডুলিনা নামক সপ্তদশ গুহা। নগরের ৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে চামারলিনা গুহা। মোচার ন্যায় এক পর্ব্বতোপরি কিয়দ্দূর কষ্ট করিয়া উঠিলে প্রায় তিনশত প্রকাণ্ড সিঁড়ির পর এই আশ্চর্য্য গুহা দেখা যায়। যাহা হউক নাসিকরোড ষ্টেসনে

গোদাবরী পার হইয়া ছায়াবান বৃক্ষ, উচ্চ পাহাড় ও ছায়াকারী উপত্যকা শোভিত দণ্ডকারণ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলাম।

অনন্তর ইগটপুরা ষ্টেসন। জব্বলপুর হইতে ৫৩১ মাইল ও নাসিক রোড হইতে ৩১ মাইল। সম্মুখে প্রকাণ্ড ঘাট গিরিপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। শৃঙ্গের পশ্চাতে ভীষণ শৃঙ্গ সকল বহুদূর সমুত্থিত। বন, ঝোড়, জঙ্গল, নীরস, কর্কশ, উচ্চ ও প্রস্তরময় ভূমি। ধন্যরে ব্রিটিশ কৌশল! ইহার উপর দিয়া ট্রেন চলিবে। এনজিন্ হইতে বারম্বার হুইসেল্ উঠিতে লাগিল। গার্ডগণ সতর্ক হইলেন। দুর্গম গিরিসঙ্কট উপস্থিত, গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ের ফাকে ফাকে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছু দূর প্রবেশ করিয়া কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, দক্ষিণে চূড়া, বামে চূড়া, সম্মুখে চূড়া, পশ্চাতে চূড়া, গহ্বর, দরীকন্দর ও শৃঙ্গ সমূহের মধ্যস্থ গভীর খাত, নদীগণের ঝঙ্কার শব্দ, গিরি পরম্পরায় সূর্য্যের মুখ সমাচ্ছন্ন, কোন স্থানে বিকটাকার শৃঙ্গছায়া, কোন স্থানে বা আলোকিত পর্ব্বত পার্শ্ব। এক একটা খাত এত ভয়ঙ্কর, এত গভীর যে দেখিলে হৃতকম্প হয়। শৃঙ্গ সমূহের ঢাল পার্শ্ব যেন তাহাতে ধসিয়া পড়িতেছে। এইরূপ খাতের উপরিভাগে ঐরূপ ঢাল অবলম্বন করিয়া পাকে পাকে পর্ব্বতোপরি গাড়ী উঠিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে গগণভেদী শৃঙ্গ সমাযুক্ত বিকটাকার পর্ব্বত ভাগ বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই সকল শৃঙ্গ ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ হইয়াছে। দূর হইতে দেখিতে যেন পর্ব্বত গাত্রে শৃগালের গহ্বর। কিন্তু নিকটে গেলে অতি প্রশস্ত গুহা। ঘোর অন্ধকারময় গুহার অভ্যন্তরে গাড়ী প্রবেশ করিয়া চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় খাত, পুনরায় গুহা, এই রূপে গুহার পর গুহা, খাতের পর খাত, ঢালের পর ঢাল, সেতুর পর সেতু দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে। দূরে কিছুই দৃষ্ট হয় না কেবল গগণভেদী শৃঙ্গ সকল যথেচ্ছ উঠিয়া সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া গিয়াছে। সহ্যের কোন দিকে দৈর্ঘ্য কোন দিকে বিস্তার, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই। এই সকল ভীষণ প্রদেশে রাবণের অনুচরগণ অবলীলাক্রমে পরিভ্রমণ করিত। ইহার উপর দিয়া যাইতে বোধ হয় রঘুনাথের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

যাহা হউক এইরূপে কাছারা ষ্টেসনে পঁহুছিলে সহ্যশৈলের উপরিভাগ গমন শেষ হয়। গভীর খাতের নিম্নে রেল দেখিয়া বোধ হয় যে পাতাল-তলে কে রেল পাতিয়াছে। কিন্তু কে জানে যে অল্পক্ষণ পরে ঐরেল দিয়া গাড়ী চলিবে। কাছারা হইতে গাড়ী বম্বের দিকে ক্রমে অবতরণ করিতে থাকে। এই সময়ে সম্মুখের দৃশ্য বড় সুন্দর। পর্ব্বতের প্রস্থদেশ কাননে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে মেঘমালা লম্বমান। পলাশ, বেল, তাল, তমাল * ও উচ্চ শেগুণে বনভাগ আবৃত। পক্ষিগণ শাখায় বসিয়া গান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গুহা বিবরে জলপ্রপাতের প্রতিরব সমুত্থিত হই-তেছে। পাদদেশে নির্ঝরিণী সকল সঞ্চরণ করিতেছে। মৃগযূথ ইতস্ততঃ ধাবমান। বন্যপুষ্পের সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত। কোন স্থানে বা তৃণাচ্ছাদিত পর্ব্বত পৃষ্ঠের হরিত শোভা কোথাও বা লতাবৃত দরীমুখ। কোন স্থান বা বৃহৎ বৃহৎ উৎপলখণ্ডে নীলবর্ণ, কোন ভাগ নানাবিধ ধাতু-রাগে রঞ্জিত। কোথাও বা নিঝরিণীর রমনীয় লীলা, কোথাও বা বারি-প্রবাহের কুলু কুলু ধ্বনি। এই রূপে শোভমান গিরিদরী, বিভূষিত বিশাল পাদদেশ ও অত্যুন্নত শৃঙ্গ সকল দর্শন করিতে করিতে আমরা সহ্যশৈল পার হইয়া গেলাম। অনন্তর কল্যাণী জংসন। জব্বলপুর হইতে ৫৮৩ মাইল। এখানকার পর্ব্বতের উপর হইতে পশ্চিম সাগর দৃষ্টিগোচর হয়। দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে গ্রীক ও ইজিপ্টের জাহাজ সকল বাণিজ্যার্থ কল্যাণীর বন্দরে আগমন করিত। কল্যাণী হইতে এক রেল বামে মান্দ্রা-জের দিকে ও এক রেল ডাইন পার্শ্বে বম্বে গমন করিয়াছে। এখানকার দুগ্ধ মন্দ নহে। কল্যাণীর পর কিছু দূর পরে সালসিট দ্বীপ। সুদৃশ্য সেতু দ্বারা সাগর পার হইয়া গাড়ী বন উপবন ও পর্ব্বত শোভিত স্থান অতিক্রম করিতে করিতে টানায় উপস্থিত হইল। উপত্যকার স্থানেশ্বরী নদীর পার্শ্বে পার্শ্বে কি সুন্দরই রেল চলিয়াছে। টানায় বিস্তর পোর্ত্তুগীজের বাস ছিল। এখনও তাহাদের বাটী ও গির্জ্জাদি আছে। দ্বীপের মধ্যভাগে পর্ব্বত মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি শোভিত গুহা।

---

* এখন রেলওয়ে কোম্পানি অনেক দগ্ধ করিতেছে।

টান্না পার হইয়া ক্রমাগত নীচ সমতল ও উর্ব্বরাভূমি। মাঝে মাঝে নিবিড় আম্রবন, নারিকেল ও তালের ঘটা। তাল গাছ দেখিতে দেখিতে গাড়ী কোলাহলপূর্ণ ভাইখালা ষ্টেসনে প্রবেশ করিল। চারিদিকে হোই হাই শব্দ, ধুপ্ ধাপ্ মাল নামিতেছে। বড় বড় গুজরাটী পাগড়ীর ভিড়, চুরটের দুর্গন্ধ ও পারসী গাড়োয়ানের চীৎকার শব্দ। এইরূপে আমরা বম্বে বা মুম্বাই পঁহুছিলাম। ভাইখালার পর মসজীদ ও তদনন্তর কেল্লার উত্তরস্থ বড়ীবন্দর ষ্টেসন। কেল্লা বম্বে দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। বম্বে দ্বীপ দীর্ঘে ৮ মাইল ও প্রস্থে ৩ মাইল। এবং উত্তর পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ পশ্চিম পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া সংস্থিত আছে। এই দ্বীপের অব্যবহিত দক্ষিণে ওলড্ ওমানছ নামে এক দ্বীপ ও তৎপরে কলাবা নামে আর এক দ্বীপ আছে। বম্বের উত্তরে সলসিট দ্বীপ। এই দ্বীপসমূহ পরস্পর বাঁধ ও সেতুদ্বারা সংযোজিত। বম্বে দ্বীপের পশ্চিমে মালাবার ও পূর্ব্বে চিঞ্চিপুল্লী নামে দুই দিকে দুই পর্ব্বত আছে। ইহার মধ্যস্থ ভূমি নিতান্ত নিম্ন এবং কোন কোন স্থান এত নিম্ন যে বর্ষাকালে জলে প্লাবিত হয়। এই সকল দ্বীপের পূর্ব্বে ও ভারতের পশ্চিমে বম্বের রমনীয় বন্দর। প্রায় ৫০ বর্গ মাইল বিস্তীর্ণ, এই জলভাগের বক্ষস্থলে পর্ব্বত ভূষিত এলি-ফাণ্টা কারাং ও দ্বিরবতী নামে দ্বীপত্রয় পরম শোভা বিস্তার করিয়াছে। যাহা হউক কেল্লার স্থান বম্বে দ্বীপের প্রধান দৃশ্য। পূর্ব্বে এই কেল্লা দুই মাইল বিস্তৃত ও বিস্তর ক্ষুদ্র গৃহে জড়ীভূত ছিল। এখন কিয়দ্ভাগ পরিষ্কৃত করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হর্ম্যাদি নির্ম্মাণ করাতে অতি শোভাশালী হইয়াছে। ব্যাঙ্ক বণিকদিগের বিপণি ও গবর্ণমেণ্ট গৃহাদি এই স্থানে সংস্থাপিত। উত্তর পশ্চিমে সাগরকূলে এছপ্লানেডের শোভা। কিছু দূর উত্তরে ব্যবসাদি পূরিত দেশীয় লোকের বিভাগ, বন্দর তীর আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ইহার কিছুদূর উত্তর পূর্ব্বে ম্যাজাগনে পি এণ্ড ও কোম্পানির ষ্টিমার আপীস ও ডকইয়ার্ড। এখানে সাগরের যাত্রিরা আরোহণ ও অবরোহণ করিতেছে।

বম্বে নগরের সর্ব্বত্র ইংরেজ ও দেশীয় লোকেরা সংমিশ্রিত হইয়া বাস করে। মালাবার পাহাড় ও ভাইখালায় বিলাসী ইংরেজগণের বাস

স্থান। কেল্লার ৩ মাইল উত্তরে প্যারেল নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট হাউস। কলিকাতার ন্যায় বম্বে নগর গ্যাসের আলোতে আলোকিত এবং দুই ঘণ্টার পথ বিহারহ্রদ হইতে জল আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে। বম্বের পথ-গুলি পরিষ্কৃত, সুশোভিত ও বৃক্ষ ছায়ায় সুশীতল। এখানে মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা গুজরাটী ভাষার অধিক ব্যবহার। বম্বে * নগরে বিস্তর পারসী লোকের বাস। ইহারা পারস্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছে। পারসীরা সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাদের মৃত দেহের জন্য বম্বে নগরে ৪।৫ টী দখমা অর্থাৎ চারিদিকে বাঁধান অতি গভীর কূপ আছে। বড়টার ঘের প্রায় ৫০ গজ হইবে। কূপের উপর মৃত দেহ রাখিয়া আসিলে উহা পক্ষীতে ভক্ষণ করে এবং উহার হাড় কূপে খসিয়া পড়িতে থাকে। মৃতের মুখে যে রুটী দেওয়া হয়, যদি কুকুর অগ্রে গিয়া উহা খায় তবে পারসীদিগের মতে ঐ মৃতের নিশ্চয় স্বর্গ হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দৈবাৎ কণ্ঠাগত প্রাণ কোন ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিলে পারসীরা তাহাকে গৃহে না লইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে।

বম্বে নগরে দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। এক টাকা ব্যয় করিলেও মিষ্টা-ন্নাদিতে উদর পূর্ণ হয় না। লুচি অতি দুর্লভ পদার্থ। কিন্তু এখানে বার মাস, আম্র পাওয়া যায় এবং উহা অতি সুমিষ্ট। এখানে নানাবিধ ফল দেখা যায়। বম্বে নগরে সাড়ে ছয় লক্ষ লোকের বাস, সহর প্রকাণ্ড বটে কিন্তু কলিকাতার তুল্য শোভা ও গাম্ভীর্য্য নাই। কেবল বাণিজ্যের কোলা-হলে ও বণিকদের গৃহে পূর্ণ। বম্বে নগরের অভ্যন্তরে প্রতিঘণ্টায় দুই ঘোড়ার শিগ্রাম ভাড়া এগার আনা, এক ঘোড়ার ক্যাব ভাড়া সাত আনা, বগী ভাড়া পাঁচ আনা ও গোযান ভাড়া তিন আনা। এতদ্ব্যতীত সহ-রের মধ্য দিয়া ট্রামওয়ে চলিতেছে। বম্বে নগরে সচরাচর লোকে নিম্ন লিখিত স্থান দেখিয়া থাকে। একজন মেম্বরের সাহায্যে টাউনহল মধ্যে মৃত প্রাণীশালা ও পুস্তকাগার, মিণ্ট মাষ্টারের অনুমতিক্রমে টাইনহল সন্নিধানে টাকশাল, ডক ও ফ্যাকটরি এছপ্লানেডের পবলিক ওয়ার্ক টেলি-

* মুসলমান ভয়ে ইহারা ৭৮৫ খৃঃ অব্দে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

গ্রান্ট, সেক্রেটেরিয়ট পোষ্ট আফিস ও ক্রেফোর্ড বাজার, এলফিনষ্টোন সারকেল উদ্যান, সাস্থন মিকানিক ইনষ্টিটিউট, প্রিন্সিপাল ও সারজনের অনুমতিক্রমে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ ও জামসেটজি হাঁসপাতাল, পারেল রাস্তায় আলবার্ট মিউজিয়ম ও ভিক্টোরিয়া উদ্যান, কাবুলে হত ব্যক্তিদের স্মরণার্থ কলাবা গির্জ্জা, সেক্রেটরীর অনুমতিক্রমে ভুনাবাটীতে ডেভিড সাস্থনের ইস্কুল, নসীরওয়ানজী মানকজীর মূর্ত্তিসহ টারডিও পারেল ও গিরগাঁওর সূতার কল, ধোবিতলাও মধ্যে ফ্রামজি কাওয়াসজি ইনষ্টিটিউট ভোলেশ্বরের পিঁজরা পোল, এছপ্লানেডে মহারাণীর মূর্ত্তি এবং গ্রাণ্টরোডে নর্থব্রুক উদ্যান। এলিফেণ্টা বা গোরাপুরী দ্বীপ বম্বে হইতে ৬ মাইল। ম্যাজাগন পাইর হইতে সুবাতাসে ২ ঘণ্টায় পঁহুছান যায়। বন্দর বোটে ৪।৫ ঘণ্টা বিলম্ব হয়। ষ্টিমার ও আপলো বন্দরের জলীবোট সুবিধাকর। এলিফেণ্টা যাইতে ১ অক্টোবর হইতে ৩১ মে পর্য্যন্ত সুবাতাসে ১৩ জন আরোহীর যোগ্য নৌকাভাড়া ছয় টাকা ও ১ জুন হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কুবাতাসে ভাড়া আট টাকা। সাত জনের যোগ্য নৌকাভাড়া সুবাতাসে ৩ টাকা ও কুবাতাসে ৫ টাকা। ডিঙ্গিভাড়া প্রতিদিন সুবা-তাসে ২ টাকা ও কুবাতাসে ৩ টাকা। টনিতে অর্দ্ধেক। ৫ জনের যোগ্য জলীবোটে সুবাতাসে ২ ঘণ্টার ভাড়া বার আনা, ততোধিক সময়ে ঘণ্টা প্রতি তিন আনা। কুবাতাসে দুই ঘণ্টায় এক টাকা, ততোধিক সময়ে ঘণ্টাপ্রতি চারি আনা। যাহাহউক এলিফেণ্টা দ্বীপে বৃক্ষ শোভিত দুইটা লম্বা পাহাড় আছে তন্মধ্যে এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। ঘাট হইতে ২৫০ মাইল ডাইনদিকে একটা প্রকাণ্ড বিকটাকার হস্তী পাহাড় হইতে খুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। ঘাট হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে এই দ্বীপস্থ বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত আছে। প্রবেশমুখে প্রস্তর সিঁড়ি আরম্ভ। দরজার দুই-ধারে দুই প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও দুই ভিত্তিলগ্ন স্তম্ভ। মন্দির অতি প্রশস্ত ১৩৩ ফীট লম্বা ১৩০॥০ ফীট প্রশস্ত ও ৭০ ফীট উচ্চ। মন্দিরে নানারূপে খোদিত মস্তকবিশিষ্ট অতি দীর্ঘাকার স্তম্ভরাজির উপর ছাদ বিদ্যমান। এই সমস্ত গুলি পাহাড় কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। মন্দির মধ্যে ত্রি-

মস্তক মূর্ত্তি কোটীদেশ পর্য্যন্ত বিরাজিত। নানাস্থানে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে।

বম্বে হইতেও বেসিন দেখিতে যাওয়া প্রীতিপ্রদ। টানা হইতে বেসিন পর্য্যন্ত নদী দিয়া যাইবার কালে তীরের শোভা দেখিয়া স্কটলণ্ডের ক্লাইড্ কারথের বর্ণন মনে পড়ে। পোর্ত্তুগীজেরা ১৫৩১ অব্দে এই নগর স্থাপন করিয়াছিল। ইহার চারিদিক গড়বন্ধ। ১৭৫০ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখন বেসিন পরিত্যক্ত ভূমি। সাতটা প্রকাণ্ড গিরজা ও কতকগুলা ভগ্নাবশেষে ইতস্ততঃ দেখা যায়। লতাজাল বেষ্টিত সেণ্টপল ও সেণ্ট ফ্রান্সিস এই দুইটী গিরজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বম্বে হইতে ষ্টিমার যোগে উত্তর পশ্চিম মুখে লোকে সোমনাথ ও দ্বারকা গমন করে। জুনাগড়ের অন্তর্ভু'ত সোমনাথ বা প্রভাসক্ষেত্রে এখন অহল্যাবাই নির্ম্মিত মন্দির ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সোমনাথ আছেন। ১০২৫ অব্দে মহম্মদ গজনবী যে প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করেন তাহা এখন পড়িয়া আছে। ঐ মন্দিরে রত্নজড়িত ৫৬ স্তম্ভ, স্বর্ণনির্ম্মিত দীপদান স্বর্ণশৃঙ্খল ও বহুবিধ রত্নপ্রভৃতি দশ কোটি টাকার দ্রব্য ছিল। (১) সোমনাথের অদূরে সেই মাঠ রহিয়াছে, যে খানে যাদবগণ মুসলযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সরস্বতী তীরে যেখানে অশ্বত্থ গাছ দেখা যায়, লোকে বলে যে ঐ স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। সোমনাথের ৪০ মাইল উত্তরে গিরনার বা রৈবতাচল পর্ব্বত। তথায় হিন্দু ও জৈনেরা তীর্থ করিয়া থাকে। সোমনাথ বা প্রভাসক্ষেত্র হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। এই ক্ষেত্রের উত্তরে ঋষি পুত্রী, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে রুক্মিনী ও পশ্চিমে তপ্ত তোয়া। ইহার গর্ভগৃহ গব্যুতিমাত্র, ক্ষেত্রপীঠ পঞ্চ যোজন ও প্রথম ক্ষেত্র দ্বাদশ যোজন। বাড়বানল সংযুক্ত অগ্নিতীর্থ, পদ্মক, সমুদ্র, কপর্দ্দি, সোম-

---

(১) ফেরেস্তার ইতিহাস অনুসারে ইংরেজি ইতিহাসে প্রকাশ আছে যে, মহম্মদ সোমনাথের প্রকাণ্ড নরাকৃতি মূর্ত্তি ভগ্ন করেন। কিন্তু পুরাণে প্রকাণ্ড মূর্ত্তির উল্লেখ নাই। সোমনাথ কুক্কুটাণ্ড সম জ্যোতির্লিঙ্গ ছিলেন। "কুক্কুটাণ্ডকমানং তৎভুমি মধ্যে ব্যবস্থিতং,,। ইতি স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে।

নাথ আদি প্রভাসের প্রধান স্থান। এই স্থানে সরস্বতী সাগর সঙ্গম ও সরস্বতী হরণ্য। কপলাসঙ্গম।

সোমনাথ দেখিয়া ষ্টিমারে দ্বারকা গমন করিবে। দ্বারকায় পাঁচটী প্রধান মন্দির আছে। যুদ্ধকালের গোলায় স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ মন্দির মধ্যে রণছোড়জীর ১৪০ ফুট উচ্চ জগৎখুঁট নামক মন্দির সর্ব্ব প্রধান। কিন্তু বর্ত্তমান নবমূর্ত্তি প্রায় ১৫০ বর্ষ হইল স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে পাণ্ডারা পূর্ব্বমূর্ত্তি লইয়া প্রথমে ভড়োচের সন্নিধানে যোধা বন্দরে লুকাইয়া রাখে। তাহার পর সমুদ্রস্থ শঙ্খদ্বার দ্বীপে লইয়া যায়। দ্বারকায় গোমতীর সহিত সাগর সঙ্গম হইয়াছে। দ্বারকায় যাত্রীগণ এখান হইতে ১৮ মাইল দূরে রামতাড়া নামক স্থানে শঙ্খ চক্রাদি উত্তপ্ত করিয়া গাত্রে চিহ্ন লয়। এই স্থানের এক পুষ্করিণী হইতে লোকে গোপীচন্দন নামক তিলকমৃত্তিকা গ্রহণ করে। দ্বারকায় গোমতী, চক্রতীর্থ, সাগর গোমতী সঙ্গম, সপ্তকুণ্ড, নৃগকূপ, গঙ্গা ও গোপ্রচারাদি তীর্থ প্রধান। এখানে দ্বারপাল ক্ষেত্রপাল ও যোগিন্যাদি বিস্তর আছে। উগ্রসেন, অর্জ্জুন, দেবকী, রুক্মিণী, উদ্ধব, সত্যভামা, জামদগ্ন্য আদি বিস্তর তীর্থসহ দ্বারকার অধিকাংশ ভাগ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে। দ্বারকা হইতে অনেকে কচ্ছ দেখেও দেখিতে যায়। কচ্ছ এক বিস্তীর্ণ লবণ ক্ষেত্র। কোথাও ঝিল, কোথাও বিল, কোথাও জলা, কোথাও তৃণাবৃত ক্ষেত্র ও কোথাও লবণের ময়দান ধক ধক করিতেছে। তৃণ সকল আন্দোলিত হইলে দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মনুষ্যের চক্ষে লবণের উপর কখন কখন উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য, কখন বা সৈন্যদল, কখন বা যুদ্ধ আদি নানারূপ অদ্ভুত দর্শন নয়ন গোচর হয়। লোকে ইহাকে গন্ধর্ব্ব নগর কহিয়া থাকে। কিছুদিন হইল ভয়ানক ভূমিকম্পে এই বিভাগের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কচ্ছ ও রণে আরণ্য গর্দ্দভ বিচরণ করে। উৎকৃষ্ট আরব দেশীয় অশ্বও ইহার তুল্য বেগশালী নহে, কিন্তু পোষ মানে না। বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র সমরে সিন্ধু দেশীয় ঘোটক ও গর্দ্দভের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্ব ভাঁসর দেশীয় ছিল।

উত্তর মুখে রেল পথে গুজরাট দর্শন ইচ্ছা হইলে বম্বে দ্বীপস্থ গ্রাণ্ট রোডে

আরোহণ করিবে। গ্রাণ্টরোড হইতে সাগরের তীরে তীরে রেল মাহিম পর্য্যন্ত চলিয়াছে। মাহিমের সমীপবর্ত্তী হইলে আরব সাগরের বিশাল বক্ষস্থল নয়নগোচর হইবে। বাঁধও ৬৮ ফীট অন্তর ও খণ্ড সেতুতে মাহিম প্রণালী পার হইয়া আমরা সলসিট দ্বীপে উপনীত হইলাম। সলসিটের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া পশ্চিম সাগর দেখিতে দেখিতে বাছিন প্রণালীতে উপস্থিত। বাছিনে সাগর জলের গভীরতা ১৬ ফীট এবং তাহার অভ্যন্তর ভাগ বালুকাপূর্ণ। জোয়ারের কালেই তথায় কিঞ্চিৎ স্রোত বহিয়া থাকে। ৬০ ফীট অন্তর ২০ খণ্ডযুক্ত, প্রথম ৬৬ খণ্ডযুক্ত, দ্বিতীয় ২৩ খণ্ডযুক্ত, তৃতীয়ও ২০ খণ্ডযুক্ত, চতুর্থ সেতু পরস্পর বাঁধ দ্বারা সংযোজিত হওয়াতে আমরা দেড় মাইল বিস্তৃত এই সাগর ভাগ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিলাম। পশ্চিম বা আরব সাগরের তীর দিয়া গমন করিতে গাড়ী অসংখ্য সেতু পার হইতে লাগিল। বাসিন হইতে তাপীতীরপর্য্যন্ত এই সমস্ত সেতু একত্রিত করিলে প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত হইবে। এই সকল সেতুর মধ্যে দামায়নের ১৫ সেতু, সনজাদের ৯ সেতু, অম্বকা ও আমীনার ১৪সেতু, পূর্ণার ১৩সেতু ও মণ্ডলার সেতু ১২ খণ্ড বিশিষ্ট। এই সকল সেতু পার হইয়া সৌরাষ্ট্র বা সুরট নগরে উপস্থিত হইলাম। সুরটের তিনদিকে প্রাচীর ও একদিকে তাপী প্রবাহিত, তাপী তীরে ক্ষুদ্র কেল্লা। দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে তাপী সাগর সঙ্গমস্থ এই নগর বম্বের তুল্য বন্দর ছিল। এখন সাগরের মুখ বালুকায় পূর্ণ হইতেছে। সুরতের পূর্ব্বের মত আর সে গৌরব নাই, এখন কার্পাস বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বস্তার তুলায় পূর্ণ। এখানে পশু পক্ষী কীটাদির প্রতিপালন জন্য জৈনদিগের একটী পিঁজরা পোল আছে। পয়সার লোভে দুঃখিরা ছারপোকা পূর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া তাহাদের উদর পূর্ণ করিতেছে। সুরটে দেখিবার মধ্যে প্রাচীন * ইংরেজ ও ওলন্দাজদিগের কবরস্থান, কেল্লা ও নূতন হাঁসপাতাল প্রধান। গুজরাটী ভাষা দুর্ব্বোধ্য নহে, কেবল ইথি বিধি প্রভৃতি

* ইংরেজেরা আহারের সময় যে কাটা চামচা ব্যবহার করেন ১৬১১ অব্দে করিয়েট ইহারই সেই কাঁটা ইংলণ্ডে চলিত করেন। ইহার কবর সুরটে আছে।

কতকগুলি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ রাখিতে হয়। এখানকার ময়দার জিনিস অপকৃষ্ট এবং লবণহীন লাউ ও চুরমুরা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নহে"। গুজরাটীরা বাঙ্গালীদের মত পাতলা রুটী এবং তৎসহ ভাত তরকারি আচার, দধি ও খিরনির চাটনী এবং পাঁপরভাজাদি খাইয়া থাকে।

সুরট ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়াই নগর পার্শ্বে তাপী বা তাপ্তী নদী। যদিও গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে লোক পার হয় তথাপিও এখানে তাপীর বিস্তার দুই সহস্র ফীট এবং বর্ষাকালে এই নদী অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। এমন কি সময়ে সময়ে এক রাত্রিতে ৩০ ফীট জল বৃদ্ধি হয়। এবং প্রবল বেগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়া তীব্র স্রোতের সহিত ভয়ানক তেজে আসিতে থাকে, এদিকে জোয়ারের সময় প্রবল সাগরবেগ প্রতিকূলে উপস্থিত। একদিকে সাগর বেগ অপরদিকে নদীর স্রোত ও ভাসমান বৃক্ষের ধাক্কা দেখিয়া রেলওয়ে কোম্পানি অতীব সাবধানে পুল নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ৩০ খণ্ডে ১৮৯১ ফীট বিস্তৃত এই সেতু নির্ম্মাণ করিতে এক বর্ষে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হইয়াছে।

তাপী পার হইয়া গাড়ী কিন ও আমা নদী অতিক্রম করত নর্ম্মদাসহ সাগর সঙ্গমের নিকট উপস্থিত হইল। জলের গভীরতায় স্রোতের তীব্রতায় বালুকার আধিক্যে ও বর্ষার উপদ্রবে নর্ম্মদা তাপী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভয়ঙ্কর। স্রোত এত তীব্র যে ঘণ্টায় দশ মাইল চলে। জলের গভীরতা ৪০ ফীট, তন্নিম্নে ৪৫ ফীট বালুকা ভেদ করিয়াও মৃত্তিকা পাওয়া দুর্লভ। ৬০ ফীট বিস্তৃত ৬০ খণ্ডে এগার লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুল করিলেও তাহা ডুইবার ভয় হয়। ১৮৮১ খঃ অব্দে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর মধ্যে এক লৌহময় সুদৃঢ় পুল প্রস্তুত হইয়াছে, নর্ম্মদার অপর পারেই ভড়োচ নগর। পুলের অনতিদূরে ভৃগুতীর্থ ঘাট। ভার্গবক্ষ হইতে ভড়োচ নাম হইয়াছে। লোকে স্নান কালে " নর্ম্মদে পাপনির্ম্মোচে ,, বলিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছে। ঘাটে জোয়ারের জলে যথেষ্ট কাদা। স্ত্রীলোকেরা হাঁড়ার ন্যায় দুইটা কলসী উপর্য্যুপরি মস্তকে করিয়া হাত ছাড়িয়া, স্বচ্ছন্দে নর্ম্মদার উচ্চ তীরে আরোহণ করিতেছে। ভড়োচ নগর দেখিতে পল্লীর ন্যায়। পথপ্রান্তে অসংখ্য তাঁতী সূত্র পরিষ্কার করিতেছে। নর্ম্মদার তীরভাগ পতিত ভিটায়

পূর্ণ। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভড়োচ নগর, বম্বের ন্যায় পশ্চিম ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। ইহাই প্রাচীন রোমানদিগের বিখ্যাত বাইরগাজা বন্দর। রোমান ও গ্রীকেরা এই নগরে কাঁচ, মদিরা ও স্বদেশীয় সুশ্রী কন্যা আনিয়া বিক্রয় করিত। ভড়োচ হইতে ১২ মাইল দূরে জগদ্বিখ্যাত কবীর বট। ইহার তুল্য প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ পৃথিবীতে আর নাই। ঘের চৌদ্দশত হাত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নামাল বা শাখা নির্গত কাণ্ড সংখ্যা তিনসহস্র। এত স্থান আচ্ছাদিত যে নিম্নে ৭ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। বটতল হইতে সাড়ে-সাত-ক্রোশ দূরে অকীক প্রস্তরের খনি। কাম্বের বাজারে এই সকল রত্ন বিক্রীত হয়। ভড়োচেও জৈনদিগের একটী পিঁজ-রাপোল আছে।

ভড়োচ হইতে রেল সাগরতীর ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভারতের অভ্যন্তর-গামী হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক তিনখণ্ডবিশিষ্ট সেতুতে তিন নদী পার হইয়া গাইকবাড়ের রাজধানী বড়োদা নগরে পঁহুছিলাম। যেমন মরু-রাজ্যের নাম মরুবার বা মাড়োয়ার, কাটি রাজ্যের নাম কাটিবার বা কাটি-য়োয়ার, সেইরূপ বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ মহারাষ্ট্রপতির গাই চরাইতেন বলিয়া রাজ্যের নাম গাইকবার বা গাইকোয়াড় অর্থাৎ গোরক্ষ-কের রাজ্য হইয়াছে। ইন্দোরের রাজার আদি পুরুষ মলহার রাও, হোল-কার মহারাষ্ট্র পতির মেষপালক ছিলেন। এখনও এক দিবসে রাজা চাস করিতে যান এবং রাণী খাদ্য মস্তকে করিয়া পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করেন। গোয়ালিয়রের মহারাজার পূর্ব্ব পুরুষ মহারাষ্ট্রীয় রাজঘরের একজন নাপিত ছিলেন ও জুতা রক্ষা করিতেন। ইহাঁরাই রাজ্য অধিকার করিয়া এক এক রাজবংশের সংস্থাপক হইয়াছে। যেমন অশ্বত্থ গাছে ধারো লতা জন্মিয়া গাছকে নিস্তেজ করিয়া নিজে প্রবল হয়, সেইরূপ ইহারা প্রবল হইয়া শিবা-জির সাতরার বংশ নিস্তেজ করিলেন। গাইকবাড়ের আয় ৭০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যের অধিকাংশ ভাগ পত্তনি বিলির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার হস্তগত আছে। গবর্ণমেণ্ট রাজাকে আদায় করিতে না দিয়া নিজে আদায় করিয়া রাজার অংশ ফেলিয়া দেন। যাহা হউক বড়োদা নগর ধুলায় আকীর্ণ। সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা শিগ্রাম নামক গোযানে গমনাগমন করি-

তেছে। গুজরাটের গরু অতি বৃহৎ এবং অত্যন্ত সবল। ঘোড়ার অসাধ্য উচ্চ স্থানে অনায়াসে গাড়ী টানিয়া তুলিতে পারে। এখানকার গভীর কূপ সকলই লোকের প্রধান অবলম্বন। সহরের নিম্নে সামান্য খালের ন্যায় বিশ্বামিত্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদীর উপর প্রস্তরের পুল। বড়োদা দেখিতে মন্দ নহে কিন্তু অধিকাংশই কাষ্ঠের গৃহ। প্রাচীন বাটী ত্যাগ করিয়া মলহর রাও যে হর্ম্যটী প্রস্তুত করিতেছিলেন, পদচ্যুত হওয়াতে সেটী সম্পূর্ণরূপ সমাধা হয় নাই। ইহার নিম্নতল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে খোদিত। বড়োদার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম হইতে মুক্ত পাইবার আশায় রাজা এইরূপ করিতেছিলেন। দেবমন্দির গুলির বন্দোবস্ত উত্তম বটে, কিন্তু নির্ম্মাণ প্রথা উৎকৃষ্ট নহে। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ইট প্রস্তুতের উপযুক্ত মৃত্তিকা প্রায়ই পাওয়া যায় না। এমন কি রেলওয়ে কোম্পানি পর্য্যন্ত ইটের অভাবে বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণ বশতঃ কাষ্ঠ ও প্রস্তর দ্বারা লোকে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কাষ্ঠের ভাগ বহুল হইলে তাহার উপর রং দিয়া চিত্র বিচিত্র করে। দশ অবতার, শ্রীকৃষ্ণের লীলা, কাছা দেওয়া দুর্গা, রাম ও হনূমানের কাণ্ড, শিবদুর্গা এই সকলই অধিক চিত্রিত থাকে। মুসলমানের উপদ্রব কম এবং নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যের সুবিধা জন্য দাক্ষিণত্যের মধ্যে দ্রাবিড় দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির সকল নয়ন গোচর হয়। দক্ষিণ ভারতে শ্রীকৃষ্ণের রাধিকাসহ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্ত বৃন্দাবন রূপ বড় দেখা যায় না। রুক্মিণী হরণকালে রণ ছাড়িয়া যান এজন্য রুক্মিণী সহ দ্বারকার রণছোড়জীর ভাবই অধিক। বড়োদায় জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী লোক অধিক, মিষ্টান্নের মধ্যে বরফি বা কালাকন্দ প্রধান। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ছানার সন্দেশ অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করে, অথচ বদরিকাশ্রমের মেলায় হিমালয়ে সমস্তই ক্ষীরের পরিবর্ত্তে ছানার সন্দেশ এবং দাক্ষিণাত্যেও ছানা খাইতে লোকের আপত্তি দেখিলাম না। যাহা হউক প্রাচীর ও গেট সমন্বিত এই নগর দেখিয়া আমরা রেসিডেন্সিতে গমন করিলাম। রেসিডেন্সির হর্ম্যাদি অপরূষ্ট। বিশ্বামিত্র নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট যযাতি স্বর্গলোক ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এজন্য উহা যযাতি পতন স্থান নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানের নিকট বৈদূর্য্য পর্ব্বত।

বড়োদা হইতে উত্তর পশ্চিমাস্য হইয়া রেল কাম্বে খা খাম্বাত খাড়ীর মস্তক বেষ্টন করিয়া মহীতীরে উপস্থিত হইয়াছে। তাপীর তুল্য ৬০ ফীট অন্তর ২০ থণ্ডে মহীর সেতু নির্ম্মিত। স্তম্ভ নদী নিম্নে ৩২ ফীট প্রোথিত আছে। মহীসাগরসঙ্গম বিশেষ তীর্থ বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বে এই স্থান একটী প্রধান বন্দর ছিল। সাগরের জল ১৷০ মাইল অপসৃত হওয়ায় ইহার আর সে গৌরব নাই। যাহা হউক মহী পার হইয়া কয়েক সেতু পরেই শাভরমতী নদী। এই নদীর তীরে কেশরহীন ভয়ঙ্কর সিংহ সকল বিচরণ করে। আমরা ইহার তীরস্থ অহমদাবাদ নগর পঁহুছিলাম। এখানে দেখিবার মধ্যে আহমদসার জমামসজীদ, সুজাতখাঁর মসজীদ, গজদন্ত মসজীদ, কোকারিয়া সরোবর ও সাহাবাগ প্রধান। আহমদ সার জমামসজীদ অতি প্রকাণ্ড। সুজাখাঁর মসজীদ নানাবিধ পারিপাট্যে ভূষিত। কিন্তু গজদন্ত মসজীদ দেখিতে অতি সুন্দর। শ্বেত-মার্ব্বেলের আভা ধক ধক করিতেছে, তদুপরি স্থানে স্থানে গজদন্তের পাড় দেওয়া এবং গাত্রে তাজের ন্যায় রত্ন জড়িত হইয়া পুষ্পের প্রতিরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল পুষ্পের পত্র শুক্তি ও রৌপ্য মণ্ডিত। কোকরিয়া সরোবরের পরিসর প্রায় ১ মাইল কিন্তু চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে সুরম্য হর্ম্ম্য শোভিত একটী দ্বীপ। নগরের একক্রোশ দূরে শাভরমতী তীরে রাজকীয় উদ্যান সাহাবাগ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আহমদ সাহ এই নগর নির্ম্মাণ করেন। এককালে ইহা গুজরাটের রাজধানী ছিল। এখন ভগ্নাবশেষে পূর্ণ। পূর্ব্বে এখানকার রেশমীবস্ত্র কার্পাসবস্ত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার, শুক্তিনির্ম্মিত দ্রব্য, কাগজ, কাষ্ঠের কার্য্য ও চিত্র কার্য্য প্রসিদ্ধ ছিল। গুজরাটের পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতি সবল ও সুশ্রী। গুজরাটে ৮৪ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ আছে। গুজর বাসী হিন্দুরা ভিস্তির জল পান করে। জল ঢালিবার সময় কলস স্পর্শ করিলে দোষ কিন্তু কলসের মুখাবরণ কাষ্ঠিকা দ্বারা খুলিয়া লইলে দোষ নাই। কেহ কালগ্রাসে পতিত হইলে কাঁদিবার জন্য ভাড়া করিয়া স্ত্রীলোক আনে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে বিশেষতঃ বণিক জাতি মধ্যে ধনী বিশেষে পাঁচ সাত টাকার উপযুক্ত কাঁদাইয়া থাকে। কাঁদিবার সময় স্ত্রীলোকেরা আলুলায়িত কেশে

বুকে কাপড় বাঁধিয়া শির বুক ও হাঁটুতে আঘাত দ্বারা তাল দিয়া হায় হায়, হায় হায়, হায় শব্দ শীঘ্র শীঘ্র উচ্চারণ করিয়া নানা সুরে কাঁদিতে থাকে। ভট্টিনি যজমানের বাটী আসিয়া দক্ষিণা অনুসারে নানা ছাঁদে কাঁদান।

আহামদাবাদ হইতে রেল রাজপুতানার আবু পাহাড়ের মধ্য দিয়া অবশেষে আজমীরে গিয়া মিলিয়াছে। শিরোহি রাজ্যস্থ আবু যাইতে হইলে পথে প্রধান স্থান পালহানপুর ষ্টেসন পওয়া যাইবে। পালহানপুরের পর ক্ষেত্র সমতল ও বালুকাময়। আনাদ্রা হইতে ভূমি ক্রমে উচ্চ হইয়া শেষে ৪ মাইল মধ্যে পর্ব্বত ২৫০০ ফীট উচ্চ হইয়াছে। দিলওয়াদা নামক স্থানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত জৈনদিগের বিখ্যাত বিমলাসা ও তেজপাল বাস্তুপালজীর মন্দির দেখা যায়। মার্ব্বেল শোভায় শোভিত ও বিবিধ খোদকারীতে পরিপূর্ণ, এই মন্দির শিল্পনৈপুণ্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। শুনা যায় এই মন্দিরের এক এক তাক সওয়ালক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত এবং সর্ব্বশুদ্ধ ইহাতে এক কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে, এত শ্রম ও ব্যয় বাহুল্যে মন্দির জগতে দুর্লভ। আবুজীর পাহাড়ের বেড় প্রায় ৫০ মাইল এবং সাগর হইতে উচ্চতা প্রায় ৪৫০০ ফীট। অর্ব্বলী হইতে বিচ্ছিন্ন, এই পর্ব্বতের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যপ্রদ। এজন্য ইংরেজেরা এখানে বিস্তর আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখানকার নাখীতালাও অত্যন্ত সুন্দর। আবুজী হিন্দুদিগের প্রাচীন অর্ব্বুদাচল তীর্থ। এখনও অচলেশ্বর মহাদেব আছেন। অর্ব্বুদাচল পৃথিবীর ছিদ্র ছিল। এই স্থানে মার্কণ্ডেয় শিবলিঙ্গ পতন স্থান হাটকেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। আনর্ত্ত দেশস্থ হাটকেশ্বর নিকট চমৎকার পুর সংস্থিত ছিল।

বম্বে হইতে সেতুবন্ধ গমন।

বম্বে আদি দেখিয়া পুনরায় কল্যাণীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কল্যাণী হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট পার হইয়া মান্দ্রাজের দিকে রেল চলিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সংস্কৃতজাত বলিয়া বুঝা যায় এবং তাহারাও হিন্দীর ভাব গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইকড়ে পাণ্ডু প্রভৃতি

যে সকল তৈলঙ্গ ভাষার কথা মিশ্রিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে না। আমরা যেখানে বাঘ, বাঘকে, বাঘদ্বারা, বাঘহইতে, বাঘের, বাঘেতে কহিয়া থাকি, তথায় মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঘাস, বাঘানে, বাঘাস, বাঘাহুন বাঘাচ ও বাঘাৎ কহিয়া থাকে। আমি তুমি তিনি প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান কালে হওয়া ধাতুতে মী অসতো, তু অসতোস, তো অসতো, আমী অসতো, তুমী অসতা, তে অসতাত, অতীত কালে হোঁতে, হোতাস, হোতা, হোতো, হোতেত, হোতে, ভবিষ্যৎকালে অসেন, অসশীল, অসেল, অসু, অসাল, অসতীল হয়। করা ধাতু মি করবিতো ইত্যাদি। এইরূপ সংস্কৃত জাত কথার উপর বিভক্তি প্রয়োগের লক্ষ্য রাখিলেই বুঝা চলে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মাত্র গৌরবর্ণ। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য থাকে এবং কাছা দেয়। ভোজের সময় স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করে। স্ত্রীলোকে কেশ অত্যন্ত টানিয়া বাঁধার জন্ম ঘাড়ের উপর টাক পড়ামত বোধ হয়। দাক্ষিণত্যের মধ্যে মহাষ্ট্রীয়েরা উন্নতিশীল। মহারাষ্ট্রীয় ভাষা মহারাষ্ট্র ত্যাগ করিয়াও বহুদূর ব্যাপ্ত এবং আদরণীয়। যাহা হউক এক্ষণে আমরা কল্যাণীর পর উলুসার ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে অসংখ্য সেতু পার হইয়া নারেল ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। নারেলের নিকট সহ্য শৈলোপরি সুদৃশ্য মাথিরন নগর। দুই ঘণ্টায় ছয় বেহারায় যাইতে পাল্কী ভাড়া দেড় টাকা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত অগ্রে বন্দোবস্ত করিতে হয়। মাথিরন নগর ১৬৪০ হাত উচ্চ। এই পর্ব্বত বিবিধ লতাকুঞ্জে ও নানাবৃক্ষে বিভূষিত। বন্য পুষ্পের সুগন্ধে বায়ু আমোদিত হইয়াছে। ভ্রমর সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বৃক্ষ সকল মস্তক উন্নত করিয়া যেন জলদগণকে স্পর্শ করিতেছে। পক্ষী কলরবে গিরিবর নিরন্তর শব্দিত হইতেছে। গারবট পইণ্টে গমন করিলে সহ্যের বিশাল পাদদেশ ও অত্যুন্নত শৃঙ্গ সকল দর্শন করিয়া মন বিস্ময়রসে নিমগ্ন হয়। প্যানোরামা পইণ্টে গমন করিয়া সূর্য্যের অস্ত গমন এবং দ্বীপবিভূষিত তরঙ্গমালা সঙ্কুল পশ্চিম সাগর অবলোকন করিলে আহ্লাদের সীমা থাকে না। সৌধমালা বিভূষিত বম্বে নগর, তাহার বহুদূর বিস্তীর্ণ সাগরতীর মালাবারহিল, মাজাগন মাহিম জাহাজ ভূষিত বন্দর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পুঞ্জ এক কালে নেত্রপথে পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব

শোভাই বিস্তার করে। পর্ব্বতের যে দিকে যাও সেই দিকেই শোভা, যে স্থানে দণ্ডায়মান হও সেই স্থানেই প্রীতি। নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট একখানি নক্সা লইয়া হার্ট, পরকুপাইন লুইসা, একো, ল্যাণ্ডস্কেপ, বটল, মঙ্কি, গ্রেট ও লিটল চৌক ও আলেকজাণ্ড্রা পইণ্ট দর্শন করা অতীব সুখকর। পূর্ব্ব পার্শ্বে আলেকজাণ্ড্রা ও ক্ষুদ্র চৌক মধ্যে সুন্দর নিকুঞ্জ বন। ইহার নাম আমরেরি বা রামবাগ।

অনন্তর নারেল পার হইয়া লানৌলির দিকে গাড়ী গমন করিতে থাকে। পুনারায় সহ্যের শৃঙ্গ পরম্পরা শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। পুনরায় সেই কাননপূর্ণ প্রস্থদেশ, বিশাল প্রস্তর মণ্ডিত বিস্তৃত পাদদেশ, সানু মধ্যে শব্দায়মান নির্ঝরিণী সকল, শৈবাল শোভিত শিখরদেশ, বন্যপুষ্পে সুশোভিত শাখীনিচয় তৃণাদিতে সমাচ্ছন্ন বৃক্ষশূন্য ভূমি, রমনীয় দরীকন্দর ধাবমান মৃগযুথ ও পক্ষী কলরবে পরিপূরিত বিবিধ স্থান নেত্রপথে পতিত হয়। পুনরায় ব্রিটিশগণের আশ্চর্য্য শিল্প কৌশল। কি কৌশলেই পুনরায় রেল সহ্যের ভোরঘাট পার হইয়াছে। নারেলের পর কুরজত হইতে প্রতি পঞ্চাশে এক ফীট উচ্চে গাড়ী উঠিতে লাগিল। অতি কষ্টে শোণগিরির পার্শ্ব দিয়া ৬৬, ১৩২, ১২১, ২৯, ১৩৬, ১৪৩, গজ সুড়ঙ্গ দ্বারা ছয় শৃঙ্গ ভেদ করিয়া বিপরীত দিকে বাহির হইল। তাহার পর উত্তর পার্শ্ব দিয়া মৌকীমুলি শৃঙ্গে উঠিবার উদ্যম করিতে লাগিল। এই দুই মাইল যাইতে ২৮৬, ২৯১, ২৮২, ৪৯, ১৪০, ৫০, ৪৩৭, ও ১০৫ গজ দীর্ঘ আট সুড়ঙ্গে ৮ শৃঙ্গ ভেদ ও পাঁচ সেতুতে শৃঙ্গমধ্যস্থ পাঁচ ভয়ঙ্কর খাত পার হইয়া উঠিবামাত্র সম্মুখে গাম্বানাথ শৃঙ্গ দণ্ডায়মান। দুই সেতুতে গাম্বানাথের দুই ভয়ঙ্কর কন্দর পার হইবা মাত্র এক ক্রোশ মধ্যে শৃঙ্গের উপর ক্রমাগত শৃঙ্গ। ৮১, ১৯৮, ৫৫, ৬৩, ১২৬, ৭৯, ৭১,২৮০ ও ১২১ গজ গভীর ৯ সুড়ঙ্গে এই ৯ গিরি অতিক্রম করিয়া নাথকাডুন্দর নামে ভীষণ শৃঙ্গ প্রান্তে উপস্থিত। এখন বিষম সঙ্কট। পথ প্রায় প্রতি সাঁইত্রিশে এক ফীট উচ্চ। ধন্য রে! বার্কলে কি কৌশলেই পথ করিয়াছ। ভুজগের ন্যায় গতিতে গাড়ী পাকে পাকে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! ইহার উপরও আর এক শৃঙ্গ। ৩৪৬ গজ সুড়ঙ্গ দ্বারা গাড়ী ইহাও অতিক্রম করিল। তদ-

নন্তর খাণ্ডালার নিকট গিরিপৃষ্ঠ ভয়ঙ্কর ঢাল ও নিম্নে গভীর খাত। অপে অপে এই স্থান পার হইয়া গাড়ী সঙ্ঘের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া যেন দম্ভ সহকারে হুইসেল দিতে লাগিল। আমরাও লানৌলি ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। এইরূপে কুরজত হইতে কখন উচ্চে, কখন নিম্নে, কখন সমে, কখন বিষমে, কখন ঢালে, কখন পুলে, কখন ডাইনে, কখন বামে, পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে, কি চমৎকারে শীর্ষে উঠিলাম, এই সকল পর্ব্বত নিতান্ত কঠোর এবং এককালে আগ্নেয় পর্ব্বত ছিল। ঘোর পরিশ্রম করিয়া রেল যেরূপ বক্র ভাবে পতিত হইয়াছে তাহাতে অনেক চক্রের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১৫ চেন হইবে। আবার গিরি পৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ড পথে পতিত হওয়ার সম্ভব হওয়াতে তাহাও পরিষ্কার করিতে বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। লানৌলির ৪ মাইল দূরে বিখ্যাত কারলির গুহা। আমরা নিকুঞ্জবনের মধ্য দিয়া একটী শিব মন্দিরের সমীপস্থ হইলাম। প্রায় ৮০০ হাত লম্বভাবে উচ্চ এক প্রকাণ্ড গিরির দুই তৃতীয়াংশ ভাগ পরিষ্কৃত করিয়া ৫২ ফীট প্রশস্ত এক দরজা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ দরজার চারিস্তম্ভ, তন্মধ্যে দুই স্তম্ভ ভিত্তি গাত্রে সংলগ্ন। দ্বারের উপরিভাগ পর্দ্দায় আবৃত এবং তদুপরিস্থ খিলান অতি প্রকাণ্ড। পর্দ্দায় খোদিত উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের মূর্ত্তি জীবিত মনুষ্যাপেক্ষাও বৃহৎ। ভিত্তি গাত্র হইতে তিনটী হাতির মুখ বাহির হইয়াছে, তাহাদের আকারই বা কি প্রকাণ্ড! অভ্যন্তরের মন্দির ১২৬ ফীট লম্বা ও ৪৫ ফীট প্রশস্ত। ছাদের খিলান গোলাকার এবং তাহা ৪১ স্তম্ভে সুরক্ষিত। ঐ স্তম্ভের নিম্নভাগ অতি প্রকাণ্ড, তদুপরি অষ্টকোণ স্তম্ভ, তদুপরি অতি উৎকৃষ্টরূপ খোদিত স্তম্ভ মস্তক, তদুপরি দুই প্রকাণ্ড হস্তী উপবিষ্ট। হস্তীর উপর এক মনুষ্য ও এক স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি। কোন কোনটাতে দুই স্ত্রীলোক আছে। এই গুলি এত সুন্দররূপ খোদিত যে ইহার তুল্য সুগঠিত গুহা ভারতে আর নাই। মন্দিরের দেবস্থানের মধ্যে লিঙ্গ মূর্ত্তি মহাদেব, তদুপরি একটী ছিদ্র দিয়া সমস্ত আলোক পতিত হওয়াতে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। এই প্রধান মন্দির ব্যতীত পার্শ্বে অতি উৎকৃষ্টরূপ খোদিত আরও অনেক গৃহ আছে। ইংরেজেরা স্থির করিয়াছেন যে, এই গুহা প্রথম শকাব্দার সালিবাহনের সময় খোদিত হইয়াছে।

কারলির ৫ মাইল দূরে ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের বাদজা ও ৯ মাইল দূরে বেদছা গুহা।

যাহা হউক আমরা লানৌলি হইতে ক্রমে অবতরণ করিতে লাগিলাম। অভ্যন্তরে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় যেন সহস্রশৃঙ্গের ঢেউ খেলিয়াছে। চারিদিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃঙ্গ। আমরা পর্ব্বত খাত ও উচ্চাবচ ভূমি পার হইতে হইতে ইন্দ্রানী তীরে উপস্থিত হইলাম। ইন্দ্রানীর পার্শ্বে পার্শ্বে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনা নগরে পঁহুছিলাম। এই জেলায় বৃক্ষের ভাগ অতি কম। নগরের পার্শ্বে পর্ব্বত। নিম্ন দিয়া মুতানদী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল পর্ব্বতে শিবাজি গোচারণ করিতেন। এবং এই নদীর জল পান ও এই মৃত্তিকার শস্য ভোজন করিয়াই মহারাষ্ট্রীয় দের সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজ আবির্ভূত হইয়াছিল। এই না সেই নদী! এই না সেই মাঠ! তবে মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহার অন্ন কিরূপে এভাবে জীর্ণ করিতেছে। প্রজাবৎসল ইংরেজদের এত যত্নেও কিরূপে এরূপ হইল! অসংখ্য ব্রিটিশ সৈন্য মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাগ এত অল্প কেন? ঐ যে স্ত্রীলোকেরা জল আহরণ করিতেছে। হা বীর প্রসবিনীগণ! এখন কেন সন্তানদের এরূপ দশা! যে পর্ব্বতের গহ্বর জয়োল্লাসে প্রতিধ্বনিত হইত, আজ তাহাই আমার বিলাপস্বর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। এই প্রস্তরফলকে কত শত তরবারি শাণিত হইয়া থাকিবে, আজ ইহার উপর কিরূপে পাদুকা সহ ভ্রমণ করিব। যে নগরের জয়ঢক্কায় গগণ বিস্ফারিত হইত, আজ সেই নগর বারাঙ্গনাপূর্ণ ও তাহাদের হাস্যে ও ইঙ্গিতে কলুষিত দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম! এ কি দেখিতেছি! একি সত্য সত্যই সেই বীরদের জন্মভূমি! যাহারা দিল্লীর দারুণ প্রতাপ অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়াছিল। অরে মহারাষ্ট্রীয়গণ! রাইগড়ে শিবজির মৃত দেহ ভস্মসাৎ হইয়াছিল। তাহার কি একটা পরমাণুও এখন বর্ত্তমান নাই? আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত পুনরায় কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ সকল দেখিতে লাগিলাম। এখানে দেখিবার মধ্যে বাঁধ তৎসন্নিকটে কোম্পানির বাগান, কিরকিপথে মৌসাফির কেল্লা, গণেশখণ্ডে গবর্ণমেণ্ট হাউস ও পার্ব্বতীর মন্দির এই কয়েকটী প্রধান। পুনায় বিস্তর ইংরেজ সৈন্য বাস করে।

এখানকার এক জাতীর ডুমুর বা আঁজির উৎকৃষ্ট। গুয়া পাউডর ও অনেক দ্রব্যের আরক পাওয়া যায়। পুনায় সংস্কৃত বিদ্যার বিলক্ষণ আলোচনা আছে। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে এক জাতীয় সোমলতা জন্মিয়া থাকে।

আমরা রেল ত্যাগ করিয়া পুনা হইতে ৬৮ মাইল দূরে সাতারা যাত্রা করিলাম। পথে কাত্রবাজঘাট ও সুড়ঙ্গ পার হইয়া সিরোয়াল নগর। তথা হইতে কামাঠকি ঘাট অতিক্রম করিলে কিছু দূর পরে দেখা যায় যে, সে স্থলে পথ বিভক্ত হইয়া একটী সেতারা ও আর একটী বাইপাছারনি ঘাট ও পঞ্চগনি হইয়া মহাবলেশ্বর পঁহুছিয়াছে। এই বিভাগে সহ্য বা ঘাট পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল অত্যন্ত উচ্চ। সাতারা নগর পর্ব্বতসমূহের মধ্যস্থিত এক নিম্ন স্থলে অবস্থিত। তিনদিকে পাহাড় ও অপর দিকে ইনা, কৃষ্ণা, ও উরমুরি নদী। কেল্লা প্রায় ৮০০ ফীট উচ্চ পর্ব্বতের উপর সংস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১১০০ গজ ও প্রস্থ ৫০০ গজ। এই নগর কিছুকাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী ছিল। এখানে রাজাগণের কীর্ত্তিগুলি দেখিবার যোগ্য। দেবমন্দির অতি বিশাল ও শোভাশালী। সাতারা হইতে ৬ মাইল দূরে আমরা মহাবলেশ্বর পর্ব্বতে গমন করিলাম। বম্বের গবর্ণর ও প্রধান কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই এই স্থানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের গৃহাদি সাগর হইতে ৪৫০০ ফীট উচ্চে পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত। এখানে দুগ্ধের বড় কষ্ট কিন্তু এখানকার গোলআলু ভারতের মধ্যে উৎকৃষ্ট। প্রতি মনের মূল্য দেড় টাকা। চুরট ও পাঁওরুটীর দুর্গন্ধ ত্যাগ করিয়া আমরা আমাদের তীর্থ কৃষ্ণার উৎপত্তিস্থান দর্শন করিতে গমন করিলাম। একাকী প্রস্রবণের পার্শ্বে বসিয়া ঈশ্বরের চিন্তা করা পরম প্রীতিকর। একটী প্রস্তর প্রাচীরের মধ্যে পাঁচটী কুকর আছে তাহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণা, বেণা, কুহনা, গায়ত্রী, ও সাবিত্রী এই পাঁচ নদী বহির্গত হইতেছে। একদিকে ব্রহ্মগিরি ও তদ্দক্ষিণে বেদগিরি, পশ্চাতে আমলকী বন। কিছু দূরে কৃষ্ণা ও বেণার সম্মিলন স্থান সংগোবেণীয়া তীর্থ। এই স্থানে গায়ত্রী জপে মহাফল। নিকটে রুদ্রতীর্থ ও ব্রহ্মতীর্থাদি। কৃষ্ণার উত্তরতটে সাগরপর্য্যন্ত এক যোজন পুণ্যক্ষেত্র। কত স্থানে কত লোক স্নান ও

শ্রাদ্ধ করিতেছে। কেহ বা "সহ্যপাদোদ্ভবা দেবি শ্রীশৈলে তুঙ্গগামিনি। কৃষ্ণবেণীতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপ প্রণাশিনি,,। বলিয়া স্নানমন্ত্র বলাইতেছে।

যাহা হউক পুনা পার হইয়া রেল দক্ষিণ পুর্ব্বমুখে ভুরা নদীর ক্ষেত্র দিয়া চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভুরা ও ভীমা সঙ্গমে উপস্থিত। পার্শ্বে পুণ্ডরপুর তীর্থ পড়িয়া রহিল। তথায় ভীমস্বেদ সমুদ্ভূতা ভৈমী ভগবত-প্রিয়া বলিয়া লোকে স্নান করিতেছে। ইচ্ছা হইলে পথিক ভীমায় স্নান ও এখানকার বিষ্ণুমন্দির দর্শন করিতে পারে। আমরা প্রত্যেক ৪০ ফীট বিস্তৃত অষ্টাবিংশতিখণ্ডযুক্ত সেতুতে ভীমা পার হইলাম। ইহার এক এক স্তম্ভ ৬০ ফীট উচ্চ তন্মধ্যে প্রায় ৪৬ ফীট সময়ে সময়ে জলমগ্ন হয়। তদনন্তর দ্বাদশ খিলানযুক্ত সেতুতে সিনা নদী পার হইয়া সোলাপুর প্রবেশ করিলাম। সহরের চারিদিকে প্রাচীর। কেল্লা সুদৃঢ় ও ছাউনী বৃহৎ। ইহার অধিকাংশ ভাবই পুনার ন্যায়। সোলাপুরে রেল ত্যাগ করিয়া ৫৮ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ বীজাপুর নগর। দিল্লীর ন্যায় ইহার চারিদিকে ভয়ঙ্কর ভগ্নাবশেষ সকল পড়িয়া আছে। ভগ্নাবস্থাতেও বীজাপুর গাম্ভীর্য্যশালী। মহম্মদের কবর, জুমামসজীদ, ইব্রাহিমের মসজীদ ও কবর, সভাগৃহ, আসমমুবারক, মেথরমহল ও মক্কা মসজীদ যথার্থই এক এক অদ্ভুত দৃশ্য। মহম্মদ সাহের মকবরার গম্বুজের ব্যাস ১২৪ ফীট এবং ইহার প্রতিধ্বনি অবিকল স্বরের প্রতিরূপ। ইব্রাহিম আদিল সাহের মসজীদে সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এবং ইহাঁর মকবরা অর্থাৎ কবর হর্ম্ম্যে কোরান অতি সুন্দর রূপ চিত্রিত আছে। বাজারের অবশিষ্টাংশ এখনও তিন মাইল লম্বা ও ৫০ ফুট চৌড়া। কেল্লার মধ্যস্থ মলিকুল মৈদান নামক পিত্তলের তোপের তুল্য বৃহৎ তোপ পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। ইহাতে তেত্রিশ মোণ তিন সের ওজনের গোলা চলিয়া থাকে। এই নগরের ঘের প্রায় ৮ মাইল এবং ইহার ৭ দরজা। ১৪৮৯ খৃঃ অব্দ অবধি ২০০ বর্ষ এই নগর স্বাধীন রাজাদের রাজধানী ছিল। পরে দিল্লীশ্বর আরংজেব বিনষ্ট করেন।

সোলাপুর হইতে রেল ভীমা ও এক পার্ব্বত শ্রেণী এই উভয়ের মধ্য

দিয়া গুলবর্গা পর্য্যন্ত চলিয়াছে। পর্ব্বত হইতে ভীমাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পতিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রত্যেকে ৩০ ফীট বিস্তৃত পঞ্চদশ খিলানের বারি নদীর সেতু ও দ্বাদশ খিলানে বিভক্ত মুরিগি হুল নদীর সেতুই প্রধান। স্থানে স্থানে পর্ব্বতের অংশ সকল নদীপর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় কোথাও কোথাও পথ প্রতি শতে ১ ফীট উচ্চ হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন শৃঙ্গ অতিক্রমই কষ্টকর।

গুলবর্গার ২৪ মাইল পরে প্রত্যেকে ৬০ ফীট বিস্তৃত ২৪ খিলানে কাজনী নদী পার হইয়া সাহাবাদ, তদনন্তর ওয়াডি জঙ্গসন। এই স্থান হইতে বামদিকে এক শাখা রেল নীরস, কর্কশ প্রস্তরময় ও উচ্চাবচ ভূমি দিয়া নিজামের রাজধানী হাইদরাবাদে গিয়াছে। স্থানে স্থানে শ্লেটের প্রস্তরের খনিও দেখা যায়। হাইদরাবাদ নগর জলশূন্য মুসা নদীতটে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ভাঙ্গা। রাজবাটী ও মন্ত্রীর বাটীর সম্মুখে বাজার, দেখিলে অশ্রদ্ধা জন্মে। কিন্তু বাটীর অভ্যন্তরে একে একে দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রশস্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গন দেখা যায়। মন্ত্রীর বাটীর মধ্যে আয়নাখানা দেখিবার যোগ্য। কিন্তু প্রায় সমস্তই কাষ্ঠ নির্ম্মিত, ঐ সকল কাষ্ঠ রং করা ও স্থানে স্থানে গিল্টি করা। সহরের স্থানে স্থানে পাহাড়ের প্রস্তর সমূহ উন্নত হইয়াছে এবং কয়েক হস্ত মৃত্তিকা উৎখাত করিলেই জমাট প্রস্তর বাহির হইয়া পড়ে। ঐ সকল প্রস্তর বারুদ দ্বারা ক্রমে ক্রমে কাটাইয়া অতি কষ্টে কূপ খাত হইয়াছে। তাহার জল অতি দুর্ল্লভ। এখানে দেখিবার মধ্যে চারমিনারের বাজার, মসজীদ, ষ্টেসন নিকটে বাগান ও কৃষ্ণ মন্দির, নিজামদিগের কবর স্থান ও কয়েকটী স্বাভাবিক সরোবর বা তালাও প্রধান। ইংরেজেরা হাইদ্রাবাদের সন্নিকটে ভূরি সৈন্য রাখিয়া রাজ্যের বক্ষশূল স্বরূপ বসিয়া আছেন। এখানকার মৃত্তিকা প্রস্তরের গুঁড়া মাত্র, তাহাই বিষ্ঠা ক্রয় করিয়া ও জল সেচন করিয়া কথঞ্চিৎ উর্ব্বরা করে। জিনিসের মধ্যে লোহার তাওয়া সেতারের তার, ও কলী প্রধান। সময়ে সময়ে অতি উৎকৃষ্ট আমের আমদানী হয়। গোঁয়ারফলি, রামঝিঙ্গা, পিয়াজ, মেথির শাক, কণ্টিকারি ফল অপেক্ষা কিছু বৃহৎ বেগুণ, হয়দরাবাদের বাজারে আদরের

সহিত বিক্রীত হয়। গরুতে মনুষ্যের বিষ্ঠা ও মহিষে ঘোড়ার বিষ্ঠা খায়। অতএব দুগ্ধের স্বাদের কথা আর কি কহিব। নগরের অধিকাংশ স্থানে হনূমান বা মহাবীরের মন্দির বা স্থান আছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত জাতিরাও নারিকেল ভাঙ্গিয়া ও কর্পূরে আগুণ দিয়া পূজা সমাপন করে। এখানে মাংস এবং নানাবিধ ফলের আরক লোকে প্রস্তুত করে এবং অনেকে সেঁদী নামক খর্জ্জুরবৃক্ষজাত মদ্য পান করিয়া থাকে। এখানকার রেসিডেণ্টের কুঠী অনেকাংশে গবর্ণমেণ্ট হাউসের মত শোভাশালী। এদেশীয় পীড়া মধ্যে নাড়ু অর্থাৎ গিনিওয়ারমই অধিক। জলের দোষ ইহার মূল কারণ, এজন্য উষ্ণজলে স্নান বিধেয়। হাইদ্রাবাদ রাজ্য গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। জায়গীর বাদে নিজামের আয় প্রায় তিন কোটি টাকা। নিজামের টাকা গবর্ণমেণ্টের টাকা অপেক্ষা আড়াই আনা কম। রৌপ্যের দর অনুসারে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। হাইদ্রাবাদের মুসলমানেরা এক প্রকার হিন্দী ব্যবহার করে সত্য কিন্তু এখানকার ভাষা তৈলঙ্গী। উত্তরে গঞ্জাম, দক্ষিণে মান্দ্রাজ ও পশ্চিমে হাইদ্রাবাদ বা অন্ধ্ররাজ্যের কিয়দংশ লইয়া তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত। তৈলঙ্গী, কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী, তুলবী ও মলয়ালম এক শ্রেণীর ভাষা বলিয়া একটা শিক্ষা করিলে অপরটা কষ্টে এক রূপ বুঝা চলে। কিন্তু সংস্কৃতের সহিত কিছুই ঐক্য নাই। পুরা কালের অসভ্য ভাষা হইতে এই ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। রাম হনূমানের সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করেন। তিনি কহেন, দেখ লক্ষ্মণ! হনূমান কেমন সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে। রাক্ষস ইল্বল বাতাপি সংস্কৃত কথা কহিয়া ব্রাহ্মণগণকে ঠকাইত। তৈলঙ্গীরা সমস্ত মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে হইলে অন্দর বাগুণ্ডা কহিয়া থাকে। আমি যাই, তুমি যাও, আমরা যাই স্থানে, নান পোতান্নু, নু পোতায়্যু, ওয়াড়ু পোতাড়ু ব্যবহার করে। দ্রাবিড়ীয়েরা ইরগেল প্রভৃতি বিভক্তি প্রয়োগ করে। সুতরাং বুঝা ভার। এজন্য জলকে নীল্লু, এ দিকে আইসকে ইকড়ারা, এক পয়সাকে কল আনা, দুই পয়সাকে আরা আনা, তিন পয়সাকে মুকাল আনা, টাকাকে রূপেয়া, কোনদিকে পথকে এদোয়া, সরাইকে সয়ম, তণ্ডুলকে বিয়ম, দুগ্ধকে পালু, ফলকে পাণ্ডু, বেগুণকে ওঙ্কাইলু, তেঁতুলকে চিন্তাপাণ্ডু, তরমুজকে কলিংড়ি

করিবে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সংস্কৃততে ও ইংরাজি-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ইংরেজি কহিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবে। গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা তৈলঙ্গে প্রত্যহ বট পলাশাদির পাতা সেলাই করিয়া ভোজনপাত্র ও পানপাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। তেঁতুল গোলার উপর লঙ্কাচূর্ণ ঢালিয়া যে পাচিপুলসী তৈয়ার হয় তাহাই মাত্র দিয়া অনেকের আহার চলে। তৈলঙ্গী স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য থাকে, কনিষ্ঠে জ্যেষ্ঠের স্ত্রীকে তামাসা করিতে পারে না, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের স্ত্রীকে তামাসা করিয়া থাকে। এদেশের অধিকাংশ লোক শৈব। যজ্ঞের বিভূতি কিন্তু বস্তুতঃ খড়িমাটী দিয়া লোকে ত্রিপুণ্ড্র করে। হলুদ চুণ ফটকিরি ও লেবুর রস দিয়া যে কালী তৈয়ারী হয় তাহা দিয়াও অনেকে ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকে। তৈলঙ্গের নীচ লোক মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। দোকানদারদিগকে শেঠ বলিয়া আহ্বান করিলে বড় খুসী। সধবা স্ত্রীলোকে মাথায় কাপড় দেয় না। যাহা হউক হয়দরাবাদের প্রায় অর্দ্ধাংশ ইংরেজেরা রেসিডেন্সির অন্তর্ভূত করিয়াছেন। সেকেন্দ্রাবাদে যদিও সৈন্য থাকে কিন্তু তথা হইতে ৫ মাইল দূরে বোলারম নামক স্থানেই প্রধান প্রধান অফিস আছে। এই স্থান অপেক্ষাকৃত মনোরম শীতল ও ইহার জলও উৎকৃষ্ট। হাইদরাবাদের ৩ তিন ক্রোশ দূরে প্রাচীন রাজধানী গোলকণ্ডা। কেল্লার পার্শ্বে সুদৃশ্য পর্ব্বতোপরি পূর্ব্ব রাজাগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য সকল বিদ্যমান। কেল্লার অভ্যন্তরে হাইদরাবাদের সম্ভ্রান্তবংশীয় বন্দীগণ রুদ্ধ থাকে। টাভরনিয়ারের বর্ণিত যে বিংশতি হীরক খনি আর নাই। যাহা দুই একটা আছে তাহাও বন্ধ। এই সকল খনির হীরাই জগদ্বিখ্যাত। গোলকণ্ডার তুলা উৎকৃষ্ট পাণিবিশিষ্ট হীরা অতি দুর্লভ। হাইদরাবাদ গমন ইচ্ছা না হইলে উমার ক্ষেত্র দিয়া গমন করিতে করিতে ইহার সঙ্গম স্থানের কিছু দূরে কৃষ্ণা তীরে উপস্থিত হইবে। গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণা বেণার জল অতি কম। নৌকার ব্যবহার অল্প। বাঁশের চৌকরার চামড়া আবরণ দিয়া পারাপারের কার্য্য চলে। কৃষ্ণার সেতু ৬৮ খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ড ৬০ ফীট বিস্তৃত। নিম্নে প্রস্তর থাকায় এই সেতু বিলক্ষণ দৃঢ় হইয়াছে। কৃষ্ণার উত্তর তীরে নানাবিধ রত্নের খনি। এজন্য ইহাকে রত্নগর্ভা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক সেতু পার

হইয়া কিছু দুর পরে রাইচোর, রাইচোর হইতে কানাড়ি ভাষা আরম্ভ। এখন জলকে নীরু, খুঁটাকে হামাল, এদিকে আইংকে ইন্নিবা, দুই পয়সাকে অর্দ্ধা, তিন পয়সাকে মুকাল আনা, গাঁটরীকে গন্ধা, কোন দিকে পথকে দাও হাদারে, উপবেশন করুকে কুচ, চটীকে সত্রেম, তণ্ডুলকে অক্কা, দুগ্ধকে হালু ও কলকে হাম্নু কহিবে। ইংরেজেরা পশ্চিম সাগরের উপকূলবর্ত্তী যে স্থানকে কানাড়া বলেন বস্তুতঃ তাহা কেরল দেশ এবং তথায় কর্ণাটী ভাষা বিরল প্রচার। ইংরেজেরা পূর্ব্ব ও পশ্চিমকূলের দুই পর্ব্বতকে ঘাট কহিয়াছেন বস্তুতঃ তৈলঙ্গ ও কানাড়ী ভাষায় ঘাট, গুটা, গুড়া পর্ব্বতকে কহে। যেমন সত্যগুড়া, চন্দ্রগুড়া, মহেন্দ্রগুড়া ইত্যাদি। কর্ণাটী ভাষাটী কেবল অধিত্যকায় প্রচলিত। কর্ণাটে কর্ত্রী ও লিঙ্গায়তী বলিয়া যে শৈব সম্প্রদায় আছে তাহারা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভাণ করিয়া ব্রাহ্মণের স্পর্শ করা জল পর্য্যন্তও খায় না। অথচ গন্ধবণিক তাহাদের জঙ্গম ও গুরুজাতি। ইহাদের গলায় বা কাপড়ের খুঁটে শ্রীশৈল হইতে আনীত এক একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর শিবলিঙ্গ থাকে। তৈলঙ্গ, কর্ণাট, দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকেরা রেশমের পাড় দেওয়া ও নানা বর্ণের সাড়ী পরাতে অতি সুন্দর দেখায়। অযোধ্যার ঢিল পাজামা, লাহোরের সঙ্কীর্ণ পাজামা, পশ্চিমাঞ্চলের ময়লা ঘাগরা ও কাশ্মীরের গলদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত দোদুল্যমান কুরতা হইতে দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীদিগের সাড়ী দেখিতে সুশ্রী। * তাহাদের কাপড় প্রায় আঠার বিশ হাত। পুরুষের ন্যায় কাছা দেয় এবং কতকটা কোঁচা করিয়া কোঁচার অবশেষটা খুলিয়া গায়ে বেড় দেয়। বুকে একটা কাঁচুলী থাকে। কিন্তু লজ্জার সম্পর্ক নাই, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। অনেকে বলেন, দাক্ষিণাত্যের এই ব্যবহার প্রাচীন আর্য্যগণের ও আমাদের ব্যবহার, মুসলমান প্রথানুসারে প্রচলিত। কিন্তু

* আর ছবিন পারে সাহেব কহিয়াছেন ইংলণ্ডের ইতিহাস খুলিয়া দেখ ইংরেজেরা বারম্বার পোষাক পরিবর্ত্তন করিতেছে তথাপিও একটা সোজা বলিয়া ঠিক হইল না। ভারতে পরিচ্ছদ জল বায়ুর অনুরূপ ও উৎকৃষ্ট, এজন্য একভাবে আছে।

বস্তুতঃ তাহা নহে। পুত্রবধূরা শ্বশুরকে পর্য্যন্ত যে লজ্জা করিত তাহা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে। যখন বিভীষণ সীতার শিবিকা-দ্বার বন্ধ করিয়া বানরদিগকে অপসারিত করেন তখন রাম কহিলেন, বিভীষণ! বিপদ, পীড়া, সংগ্রাম, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহ এই কয়েক বিষয়ে স্ত্রীগণের দর্শন দূষণীয় নহে। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ না করাতে তারা আসিয়া কহিল, তুমি সুগ্রীবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব সুগ্রীবের স্ত্রীদিগকে দেখিতে দোষ কি? রামায়ণ ও ভারতের নানা স্থানে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বলিয়া বিশেষণ আছে। মুসলমানদের ভারতে আসা দূরে থাকুক মহম্মদ জন্মের ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীক দূত মিগাস্থিনিস পাটলীপুত্রে থাকিয়া হিন্দু স্ত্রীলোকগণের অন্তঃপুরে বাস ও ভয়ঙ্কর আবরণের বিষয় লিখিয়াছেন। অন্তঃপুর বলিয়া একটা শব্দও অভিধানে আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে অনেকের সে অন্তঃপুর কোথায়? মহুরায় এক স্ত্রী বাটীর সকলের মনোরঞ্জন করে, একি আর্য্যদের ব্যবহার? হিমালয় প্রদেশে এক স্ত্রীর বহুপতি আছে সত্য কিন্তু তাহা অসভ্য জাতি মধ্যে প্রচলিত। বিন্ধ্য পার হইয়া স্ত্রীগণের ক্ষমতা পুরুষের উপর ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে কন্যা কুমারীতে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছে। কানাড়ার ক্ষুদ্র লোকে রাগী শস্যের মণ্ড খাইয়া দিনপাত করে।

যাহা হউক রাইচোর পার হইয়া আমরা কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ কার্পাসের ভূমি সকল অতিক্রম করিতে করিতে ভীষণ তুঙ্গভদ্রা তীরে উপস্থিত হই-লাম। এই নদীর বিস্তার প্রায় ৩২০০ ফীট। এবং সময়ে সময়ে ইহার জল হটাৎ ১৭ ফীট ফাঁপিয়া উঠে। তীরদ্বয় অতি বিপুল ও ভয়ঙ্কর। কিন্তু নিম্নে প্রস্তর থাকায় রেলওয়ের স্তম্ভ সকল দৃঢ় হইয়াছে। প্রত্যেকে ৬৪ ফীট বিস্তৃত ৫৮ খণ্ডের সেতুতে আমরা নদী পার হইলাম। তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া গাড়ী দক্ষিণ মুখে শস্যপূর্ণ ও জলপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আদোনী নগরে উপস্থিত হইল। আদোনীর পর গুড়াকল পর্য্যন্ত পুনরায় পার্ব্বতীয় উর্ব্বর ভূমি। গুড়াকল হইতে ডাইন দিকে এক শাখা রেল বেল্লারী গিয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যা দর্শন মানসে আমরা ঐ রেলে আরোহণ করিলাম। কিয়দ্দূর পরে হগারী নদী। ইহার বিষম তীর অতি সামান্য

মাত্র উচ্চ। বিস্তার ২৯৭০ ফীট মাত্র। ৬৪ ফীট অন্তর ৩৪ খণ্ডে এই সেতু পার হইয়া বল্লারী নগরে পঁহুছিলাম। নিকটস্থ উচ্চ গ্রানাইট পর্ব্বতোপরি ত্রিবেষ্টনযুক্ত কেল্লা ও পার্শ্বে ইংরেজদের সেনানিবেশ স্থান। এই জেলার স্থানে স্থানে তাম্রের খনি আছে। বল্লারীর ৩০ ক্রোশ দূরে হাম্পি ও আনিগন্ডিতে কিষ্কিন্ধ্যাদি পর্ব্বত। কিষ্কিন্ধ্যার প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে ঋষ্যমূক। ঋষ্যমূকের পাদদেশে পম্পা সরোবর। পম্পা সরোবর এবং নদী উভয়ই। সরোবরের জল ক্ষুদ্র নদীযোগে পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রাতে পতিত হইতেছে। মতঙ্গ সরোবর পম্পার অংশ মাত্র। পম্পার পশ্চিমে শবরীর আশ্রম। অদূরে হ্রদ সম্মুখস্থ গুহায় সুগ্রীবাদি বানর চতুষ্টয় বাস করিত। কিষ্কিন্ধ্যার অপরদিকে মাল্যবান পর্ব্বত। এই স্থানে রাম বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঈশাণদিকে সমুন্নত গুহায় তাঁহার আবাস স্থান ছিল। নিম্নে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল পর্ব্বত এখনও স্বভাব শোভায় বিমণ্ডিত। সেই ভ্রমরের গুঞ্জন, সেই পুষ্পিত বিটপী লতা, সেই পক্ষিকুলের কলরব ও সেই জল প্রপাতের কল্লোলধ্বনি। আহা! এখনও সেই নীরদনিকর গিরিবর আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এখনও সেই শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এখনও পরিশ্রান্ত পথিকের মুখে রাম রাম শব্দ কর্ণগোচর হয়। কিন্তু সে প্রত্যক্ষস্থলী আর নাই। এখন যাত্রীরা পম্পায় স্নান করিয়া শ্রীরামের পূজা করিতেছে। কিষ্কিন্ধ্যা দেখিতে আসিয়া প্রাচীন বিজয়নগরের আশ্চর্য্য ভগ্নাবশেষ দর্শন করা অতীব প্রীতিপ্রদ। এই পরিত্যক্ত নগরের বেষ্টন প্রায় ৮ মাইল। ইহার স্থানে স্থানে ও পথপ্রান্তে এত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া আছে যে স্বচ্ছন্দে তাহার ছায়াতে গমনাগমন হয়। পথ পুষ্করিণী কূপ সমস্তই প্রস্তর মধ্যে খোদিত। গৃহ দ্বার মন্দির সমস্তই প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। এক এক খান প্রস্তর এত বৃহৎ যে, কিরূপে যে সেই প্রস্তর অত দূর ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা বোধগম্য হয় না। এক এক খণ্ড দীর্ঘে প্রস্থে ও বেধে পঞ্চদশ হস্ত। বাজারের মধ্যস্থ দশ খণ্ডে বিভক্ত ৯০ ফীট বিস্তৃত শিবালয় প্রায় ১৬০ হাত উচ্চ। রামচন্দ্রের বিশাল মন্দির স্থ স্তম্ভের খোদকারী নিতান্তই চমৎকার। বিষ্ণুমন্দির প্রায় ৪০০ ফীট লম্বা ও ২০০ ফুট

প্রশস্ত। পার্শ্বে একখানি নিরেট পাথরের প্রকাণ্ড রথের আমূলাগ্র খোদকারীতে পূর্ণ। এই নগর প্রাচীন হিন্দুদিগের রাজধানী ছিল। এই স্থানেই সেই বিখ্যাত বুক্করায় রাজধানী করিয়াছিলেন। এই স্থানেই সেই ভয়ঙ্কর পণ্ডিত মাধবাচার্য্য বেদের টীকা ও অশেষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর কৃত গ্রন্থ এত আছে যে, ভূমণ্ডলে এক ব্যক্তির হস্ত হইতে এত অধিক গ্রন্থ অল্প বাহির হইয়াছে। এখানকার নিকটস্থ দুই এক জন লোক কহে যে এই নগর পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরে ১২ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ছিল। এই তুঙ্গভদ্রা তীরে শৃঙ্গগিরিতে শঙ্করাচার্য্য সরস্বতী স্থাপন করিয়া "আকল্পাং স্থিরাভব মদাশ্রমে,, বলিয়া চলিয়া যান। গভীর প্রজ্ঞাশীল সন্ন্যাসীগণের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা থাকিলে দর্শক কিছু দূর কষ্ট স্বীকার করিয়া শঙ্করের এই মঠ দর্শন করিবেন। প্রচারিত গ্রন্থাদি ব্যতীত শঙ্করাচার্য্যের যমুনাষ্টক প্রভৃতি মোহমুদ্গরের ন্যায় অনেক সুললিত কবিতা আছে। শৃঙ্গগিরি বা সিংড়ার এই মঠে অনেক প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইবে। শঙ্করাচার্য্য হইতে এখন ত্রিংশৎ গুরু গদীতে বিদ্যমান আছেন।

বল্লারী গমন ইচ্ছা না হইলে গুড়াকল হইতে প্রধান রেলে সেনানিবেশ স্থান গুটি চলিয়া যাইবে। পথে পাহাড় খাত করিয়া রাস্তা সমান করা হইয়াছে। গুটি হইতে পূর্ব্বমুখে রেল গাড়ী পর্ব্বতময় উচ্চাবচ ভূমি পার হইয়া পান্নার তীরে উপস্থিত হইল। ৬৪ ফীট অন্তর ২৬ খিলানে পান্নার ও ৭০ ফীট অন্তর ৪০ খিলানে চিত্রাবতী পার হইয়া পল্লীপূরিত নীল ও কার্পাসের সমতল ক্ষেত্র সকল অতিক্রম করিতে করিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইল। তাহার পর ২৪০০ ফীট বিস্তীর্ণ পাপগ্নি নদী, তীর নিম্ন বিসম ও পরিবর্ত্তনশীল। নদীবেগেরও স্থিরতা নাই, বর্ষে বর্ষে খাত পরিবর্ত্তন করে। সময়ে সময়ে চৌদ্দ ফীট জল উঠিয়া দিক প্লাবিত করে। এই নদী পার হইয়া রোসাভঙ্কা নালা অতিক্রম করত কড়পা নগরে উপস্থিত হইলাম। কড়পা বহুজনপূর্ণ, মান্দ্রাজের বাণিজ্যের প্রধান প্রবাহ স্থান। প্রায় বার্ষিক ২৫ লক্ষটাকার দ্রব্য এখান হইতে মান্দ্রাজে প্রেরিত হয়। কার্পাস, নীল, তামাক ও কুসুম ক্রমাগত মান্দ্রাজে

চালান হইতেছে। কাপড়, কম্বল ও বিবিধ ধাতুদ্রব্যে দোকান পরিপূরিত। কুম্ভকারের দোকানে নানাবিধ মৃণ্ময় পাত্র। চাল, রাগী, জোয়ার, বাজরা নানা স্থানে গাদী করা রহিয়াছে। সেগুন, নারিকেল, খর্জ্জুর, তাল, নিম, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ জেলায় বিস্তর থাকায় তজ্জাত দ্রব্যের অসদ্ভাব নাই। কড়পা, জেলার রাজধানী ও ইংরেজদের সেনানিবেশ স্থান। নগরের ৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে পান্নার তীরে হীরক খনি আছে। কড়পা পার হইয়া ভমার্দ্রী এক ক্ষুদ্র নদী। ৬০ ফীট অন্তর আট খণ্ডে ঐ নদী পার হইয়া প্রায় ২৭ মাইল বেশ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া পূর্ব্বমুখে সুন্দর ভাবে চলিয়াছে। তদনন্তর চেয়ার নদী। তুঙ্গভদ্রা ও চিত্রার পর এই সেতু গণনার যোগ্য। ইহার ৩৮ বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগ ৬৪ ফীট অন্তর। চেয়ার হইতে ভূমি ক্রমে পার্ব্বতীয় ভাব ধারণ করিল, স্থানে স্থানে গভীর খাত। এই সকল সামান্য খাত পার হইতে হইতে বালাপিলিতে পূর্ব্ব ঘাট বা মহেন্দ্র পর্ব্বত অতিক্রমের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। পথ ক্রমে উচ্চ হইয়াছে। কিয়ৎকাল পরে ত্রিপতি ষ্টেসন বা বালাজী। পর্ব্বতোপরি বালাজির মন্দির অতি বিশাল সিংহাসনোপরি বালাজীর প্রস্তরময় মূর্ত্তি উপবিষ্ট। বন্দোবস্ত প্রায় জগন্নাথের ন্যায়। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এই তীর্থ অতি প্রসিদ্ধ। জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় বালাজীর প্রসাদ ভক্ষণেও লোকে জাতিভেদ স্বীকার করে না। বর্ষে বর্ষে এখানে বিস্তর যাত্রী উপস্থিত হয় এবং প্রসাদ দেশ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার জগন্নাথ ও দাক্ষিণাত্যের বালনাথ প্রসিদ্ধ। পর্ব্বতের উচ্চতার কারণ ত্রিপতি পার হইয়া নাগারীর নিকট পাহাড় কাটিয়া পথ সমান করিতে হইয়াছে। নাগারির পর অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। তদনন্তর আর্কনম ষ্টেসন। এই স্থান হইতে তিনদিকে তিন রেল গিয়াছে। পূর্ব্বে মান্দ্রাজ, দক্ষিণে কালীপব ও পশ্চিমে ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় গিয়াছে। পূর্ব্বগামী রেলে আরোহণ করিয়া ৪২ মাইল পরে মান্দ্রাজ পঁহুছিলাম। মান্দ্রাজের ষ্টেসন রায়পুরমে সাগর তট অবস্থিত। সম্মুখে বাণিজ্যের স্থল। মান্দ্রাজ নগর ফল পুষ্পোপশোভিত উদ্যান ও শৃঙ্খল, শ্রীগৃহ লইয়া সাগর তীরে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৯ মাইল বিস্তীর্ণ।

পূর্ব্ব পশ্চিমের বিস্তার কোন কোন স্থানে ৩।৷০ মাইল। সাগর তীরে যেখানে গবর্ণমেণ্টের অফিসাদি আছে সেই স্থানটী সুদৃশ্য। এখানে দেখিবার মধ্যে কেল্লা, কর্ণাটের নবাবের গৃহ, গিরজা, হিবর সাহেবের কবর ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি পূর্ণ পিপলছ গার্ডেন প্রধান। কেল্লা মধ্যে টিপু সুলতানের দুই বৃহৎ তোপ আছে। কেল্লার ভিত্তি সাগরে সংলগ্ন। মান্দ্রাজের সমুদ্র নিতান্ত অস্থির। ইহার ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া হৃৎকম্প হয়। শীতকালে মান্দ্রাজের সাগর যে দেখিয়াছে সেই জানে যে সাগর কি ভয়ঙ্কর। কাহার সাধ্য যে জাহাজ কি বোট লইয়া তীরে অগ্রসর হয়। তক্তায় নারিকেলের দড়ি বাঁধিয়া নৌকার মত করিয়া দেশীয় লোক জাহাজে কথঞ্চিৎ যাতায়াত করে। ইয়োরোপীয় বিদ্যা বুদ্ধি এই সাগরে দেশীয় মাঝির নিকট পরাভূত হইয়াছে। যখন ঊর্দ্ধে ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে গভীর গর্জ্জন, মধ্যস্থলে প্রবল বাত্যায় গম গম শব্দ, নিম্নে প্রচণ্ড মারুত ক্ষুভিত সাগরের কল্লোলধ্বনি, তীরে পর্ব্বতাহতফেণপুঞ্জ ও দিক্ পরিধির প্রান্তপর্য্যন্ত অন্ধকারময় সাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ এককালে ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তখন বোধ হয় ঈশ্বর! এ কোন্ সৃষ্টিতে উপস্থিত হইলাম। প্রকৃতি যে কি ভয়ঙ্কর ও মানব যে কত ক্ষুদ্র তাহা যুগপৎ অন্তরে উদিত হওয়ায় চক্ষু আপনা হইতেই মুদিত হইয়া সেই অনন্ত পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। এইরূপ সাগরের পার্শ্ব দিয়া আমরা মান্দ্রাজ হইতে আর এক রেল অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর পরে চেঙ্গলপট্টু। মান্দ্রাজ হইতেই তৈলঙ্গ ভাষা শেষ হইয়া তামিল দ্রাবিড়ী বা আরুই ভাষা আরম্ভ। মান্দ্রাজ হইতে পশ্চিম ঘাট পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণস্থ বিভাগে এই ভাষা প্রচলিত। এখন হইতে জলকে নীরু জলং বা তারি, টাকাকে রূপেয়া, এক পয়সাকে কস আনা, দুই পয়সাকে আরে, তিন পয়সাকে মুকাল আনা, চটীকে সরম, চাউলকে আরিসি, দুগ্ধকে পাল, ফলকে পড়ম, সুপারিকে পাকমরম, পানকে বেটিলি, লঙ্কামরিচকে মলাগি, খর্জ্জুরকে ইছম পানই, এখানে আইসকে ইঙ্গেভয়া, কোন দিকে পথকে ইঙ্গাবাড়ী কহিবে। তামিল ভাষায় বর্ণমালার বর্গের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ নাই। খ গ ঘ ছ ইত্যাদি বর্ণবিশিষ্ট শব্দ সমস্তই সংস্কৃত-

জন্য। এজন্য ভ্রমণকারী সঙ্গে রাখিয়া চলিলে কতক কতক বুঝিতে পারিবেন। সাগর তীরস্থ [illegible] লোকে আমাদের সম্পর্ক থাকাতে ইহাদের কিছু কিছু বুঝে। তামিল ভাষায় অ আ ই ঈ উ ঊ এ এ ঐ ও ও ঔ এই বারটি স্বর। ঐকে আই এবং ঔকে আউ উচ্চারণ করে। ক, ঙ, চ, ঞ, ট, ণ, ত, ন, প, ম, য, র, ল, ব, ঝ, ল, ঝ, ন এই অষ্টাদশ ব্যঞ্জন। শেষ ন র বর্ণের দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারণ করে। স্বরহীন ব্যঞ্জনের ইণ্ ইঙ্ ইত্যাদি উচ্চারণ। সাগর তীরস্থ এই সকল স্থানে নানা প্রকার অদ্ভুত মৎস্য পাওয়া যায়। কেহ বলে সময়ে সময়ে মকরও ধরা পড়ে। কড়ি ও শঙ্খাদি পাওয়া যায়। যাহা হউক চেঙ্গলপট্টু নগরের ভাঙ্গা কেল্লা এক উপত্যকার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। উত্তর পূর্ব্বে দুই মাইল বিস্তীর্ণ এক হ্রদ বা সরোবর। কেল্লা তাল গাছ পূর্ণ ও মৃত্তিকা প্রস্তর পূর্ণ। চেঙ্গলপট্টু নগরের নিকটে সুবিখ্যাত মহাবলিপুরের প্রস্তর মন্দির ও গুহা। সাগর তটে পর্ব্বত খোদিত করিয়া কি চমৎকার গুহা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। মন্দিরে কিছু মূর্ত্তি সংস্থাপিত। প্রাচীন নগরের অনেক ভাগ সাগরে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মন্দিরাদিও থাকে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ বলে বলিরাজ এখানে থাকিতেন। চেঙ্গলপট্টু ত্যাগ করিয়া পণ্ডিচরীর ষ্টেসন ভিল্লাপুর জঙ্গসন। পণ্ডিচরীতে আবগারীর মদ্যাদি সস্তা। এখানে ফরাসি গবর্ণমেণ্টের হর্ম্যাদি দর্শনযোগ্য। আতিথেয় ফরাসিদের শিষ্টাচার নিতান্ত প্রশংসনীয়। চেঙ্গলপট্টু ও ভিল্লাপুর এতন্মধ্যে কোন ষ্টেসন হইতে কষ্ট করিয়া কিছু দূর গমন করিলে ৫০০ ফীট উচ্চ পাহাড়ের উপর জিঞ্জির কেল্লা দেখা যায়। জিঞ্জির ১০ ক্রোশ পশ্চিমে তীর্থস্থান তিরুবন্নামলি নগর। ইহার প্রধান মন্দির দ্বার পর্ব্বতগাত্রে খোদিত। মন্দির দ্বারদেশও ২২২ ফীট উচ্চ হইয়াছে। ছত্র ও ধর্ম্মশালাও সুপ্রশস্ত। ভিল্লাপুরের কিছু দূরে [illegible] গ্রাম। এখানে বহুকালের দুর্গাদি প্রস্তর [illegible] চিহ্ন উত্তর দেখা যায়। [illegible] দুই [illegible] রহিয়াছে। [illegible] করিয়া আছে।

ভিলাপুর পার হইয়া দক্ষিণ পানার সঙ্গমে দক্ষিণ আর্কাড়ুর রাজধানী কডালোর বন্দর। এখানে বিস্তর ইংরেজের বাঙ্গালা। ইহার পর প্রাচীন কডালুর নগর। তাহার পর লৌহের কারখানা স্থান পোর্টনভো। পোর্টনভোর পর তীর্থস্থান ময়বরম। এখানকার মন্দির গুলি অতি শোভাশালী। তদনন্তর কম্বুকোনম। ভারতের মধ্যে এই স্থানে বেদের অধিক আলোচনা দেখিলাম। এখনও পুরোহিতেরা রীতিমত যজ্ঞ কুণ্ডাদি করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান অংশ নাগোর নগর সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও জাহাজে পূর্ণ। এখানে ১৫০ ফুট উচ্চ এক স্তম্ভ আছে, কে যে প্রস্তুত করিয়াছে এবং কেন যে করিয়াছে তাহার কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না। প্রাচীন কম্বুকোনম নগর কাবেরীর উভয় ধারার মধ্যভাগে সংস্থাপিত। এই স্থান প্রাচীন চোলবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। চক্রেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ কুণ্ডে দ্বাদশবর্ষান্তে মাঘ মেলা হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে মহাতীর্থ কাবেরী সাগর সঙ্গমে স্নান করা যায়। সময়ে সময়ে কাবেরীর মুখে সামুদ্রিক বিষাক্ত সর্প প্রবেশ করে। এজন্য সাবধান হওয়া উচিত। কম্বুকোনমের পর কয়েক ষ্টেসন পার হইয়া এই রেল ক্রমে সাগর তীর ছাড়িয়া কাবেরীর তীরে তীরে ত্রিচুনাপল্লী হইতে নিগাপটম গামী রেলের সহিত তানজোরে গিয়া মিলিয়াছে। সাগর সমীপস্থ এই সকল বিভাগের দৃশ্য অতি মনোহর। পুণ্যসলিলা কাবেরী কলিরুণ আদি শাখা বিস্তার করিয়া গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। ভাগীরথী তীরের ন্যায় সেই শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, সেই ধান্যের দোলায়মান মস্তক, সেই নারিকেলের নিকুঞ্জবন ও সেই তালরাজির বিস্তীর্ণ শ্রেণী। গুবাক বৃক্ষ সকল যেন প্রকৃতি ভূষণ মানসে রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। কত শত কদলী বৃক্ষ ফলভরে অবনত। মধ্যে মধ্যে বংশগুল্ম ও আম্রের নিবিড় ছায়া। রাখালগণের সেই বংশীরব, কোমল পত্রে আবৃত পক্ষীর দূরব্যাপী শব্দ ও বটতলে ক্রীড়মান বালকগণের সাহ্লাদ ধ্বনি হৃদয় আনন্দনীরে নিমগ্ন করে। নীরস দাক্ষিণাত্যে আসিয়া পুনরায় যে স্বদেশের দৃশ্য অবলোকন করিব তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। তানজোর বা তানজবুর নগরও অতি উৎকৃষ্ট ও শোভাশালী। সরল পথ ও সুন্দর গৃহরাজি। কেল্লা দুইটী অতি

সুদৃঢ়। রাজবাটী প্রশস্ত ও মনোহর। কিন্তু ক্ষুদ্র কেল্লার মধ্যস্থ মন্দিরই অতি আশ্চর্য্য। এই মন্দির এত উৎকৃষ্ট যে ইহার তুল্য শীর্ষ শোভাযুক্ত উচ্চ ও সুগঠিত মন্দির ভারতে অল্প দেখা যায়। উচ্চতা প্রায় ২০০ ফীট এবং সর্ব্বাঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার সভামণ্ডপের ষাঁড় কৃষ্ণ প্রস্তরে এমন চমৎকার রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ইহার গঠন দেখিয়া ইংরেজেরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ষাঁড়ের উচ্চতা ৮ হাত। নানাদ্রব্য পূর্ণ তান্‌জোর নগরে রেশম ও কার্পাসের কারবার অনেক। কাবেরীর দক্ষিণ তীরস্থ সহরতলী সমন্বিত এই নগর সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনায় পূর্ণ।

আর্কোনম হইতে মান্দ্রাজ গমন ও তথা হইতে সাগরের তীরবর্ত্তী রেল দিয়া তান্‌জোর গমন ইচ্ছা না হইলে দক্ষিণ শাখা রেলে ব্রাহ্মণ ও তাঁতি-পূর্ণ কাঞ্চীপুর নগরে গমন করিবে। কাঞ্চিপুর নগর এখনও "নগরেষু কাঞ্চি" নামের স্বার্থকতা করিতেছে। পথ পরিস্কৃত ও বাজার সুপ্রশস্ত। উভয় দিকে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষ। নগর মধ্যে মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দির এত বৃহৎ যে অভ্যন্তরে হাজার স্তম্ভযুক্ত ধর্ম্মশালা বা অতিথিশালা আছে। সিঁড়ির দুই দিকে প্রস্তরের দুই হাতী রথসহ দণ্ডায়মান। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার কালে বহুদূর পর্য্যন্ত ঝাড়, জঙ্গল, ঝিল, ও পাহাড় সকল নেত্র গোচর হয়। এইটীর নাম শিবকাঞ্চি। ইহার এক ক্রোশ দূরে বিষ্ণুকাঞ্চি। এখানে বরদরাজ বিষ্ণুর মন্দির আছে। এই মন্দির আড়ম্বরে ও সৌন্দর্য্যে শিবমন্দির অপেক্ষাও অধিক। দরজার সম্মুখে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত তাম্রের গরুড় স্তম্ভ। কাঞ্চিতে প্রায় ১৫০ উৎকৃষ্ট মন্দির আছে। কাঞ্চিনগর হিন্দুদের মহাতীর্থ। "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।" এখানে চোলবংশীয় রাজারা কিছুকাল রাজধানী করেন।

দক্ষিণের শাখা রেলে কাঞ্চিপুর গমন ইচ্ছা না হইলে আর্কোনম হইতে আর্কট গমন করিবে। মান্দ্রাজ হইতে আরকট আসিতে করতিলার নদীর ৩০ ফীট অন্তর ২৬ খিলানযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রস্তর সেতু। আরকট প্রবেশ মুখেও ৫৬ খিলানযুক্ত পাইনি নদীর গ্রানাইট নির্ম্মিত সেতু। আর্কাডু

গমন কালে এই জেলায় চাসের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইবে। কূপ ও পুষ্করিণীর সংখ্যা নাই। শুনা যায় ৩৫৯৯ গ্রাম মধ্যে চারিহাজার পুষ্করিণী ও ১৯ হাজার কূপ আছে। ইহার উপর নদী ও প্রস্রবণের জল খালযোগে আসিতেছে। এক কাবেরীপাক পুষ্করিণীই দীর্ঘে ৮ ও প্রস্থে ৩ মাইল। ধান্য ও কার্পাস বিস্তর উৎপন্ন হয়। কিন্তু অধিকাংশ মৃত্তিকা বালুকাময় ও গ্রীষ্মকালে ঘোর গ্রীষ্ম। আরকট নগর ষাণ্মাসবাহিনী পালার নদীর ডাইনতীরে অবস্থিত। মুসলমানদের সময় এই নগরের বড় ধুম ধাম ছিল। এখন কেবল ভগ্নকেল্লা নবাবের ভগ্নবাটী ও অপরাপর ভগ্নাবশেষ দেখিবার যোগ্য। আরকট হইতে ১৫ মাইল পরে সেনানিবেশ স্থান ভিলোর বা বেলুরু। ভিলোরের শিবমন্দির দর্শনযোগ্য। ভিলোর পার হইয়া পথে গরিয়াটম নদী। ইহার দুই শাখার উপর দুই পুল। প্রথমটী ২৪ ও দ্বিতীয়টি পঞ্চ খিলান বিশিষ্ট। গরিয়াটমের পর পথ ক্রমে আয়াস সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পদে পদে নদী ও খাল। এমন কি ১১০ মাইল মধ্যে ৯৫ সেতু। পালায়ের সেতুর ১৪ খিলান ৩০ ফীট ও পাঁচ খিলান ৬৪ ফীট বিস্তৃত। পানারের সেতু ১৮ খিলান প্রত্যেকে ৩০ ফীট। পালার ও পানারে যে সকল নদী পড়িতেছে তাহাদের সকলেরই সেতুর খিলান ৩০ ফীট বিস্তৃত। কেবল জস্তীপোরাণের ৫ খিলান ১৫ ফীট ও গদারের ১২ খিলান ২০ ফীট বিস্তৃত। পালার হইতে পানার পর্য্যন্ত অপরাপর নদীর মধ্যে কড়ারের ৫ গদারের আর এক স্থলে ৩ পালা-নদী নদীর ৭ ও মুর্ণাপটীর ৭ খিলান। প্রত্যেকে ৩০ ফীট বিস্তৃত। পানার হইতে সালেম নদী যাইতে আহতুর নদীর সেতুর ৭ ও সিভরি নদীর ৪ খিলান। প্রত্যেক খিলান ৩০ ফীট। যাহা হউক এই সকল সেতু পার হইয়া সালেম যাইবার কালে ইচ্ছা হইলে জলারপেট হইতে ডাইন রেলে বেঙ্গলুর যাইবে। এই নগর মহীশূর দেশের সর্ব্ব প্রধান স্থান। ইহার চতুর্দ্দিকে লালমৃত্তিকার প্রাচীর। বাজার চৌড়া ও নারিকেল বৃক্ষে পূর্ণ। কেল্লা উচ্চ ও সুদৃঢ় ও পাহাড় খাত করিয়া পরিখাযুত করা হইয়াছে। ইহার এক ক্রোশ দূরে সেনানিবেশ স্থান। দেখিবার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হাউশ, উদ্যান ও গবর্ণমেণ্টের আর আর স্থান প্রধান। এখানে চিকবাল-

পুরের আমদানী মিছরি উৎকৃষ্ট। বেঙ্গলুর হইতে ডাক গাড়ীতে ৭৫ মাইল দূরে অনেকে শ্রীরঙ্গপত্তন ও তথা হইতে ১০ মাইল দূরে মহীশূর নগর যায়, যাইতে ২৪ ঘণ্টা লাগে। পথে দেখিতে দেখিতে গেলে মহীশূরকে এক বিস্তীর্ণ অধিত্যকা বলিয়া বোধ হইবে। ভূমি সম বিষম ও স্থানে স্থানে এক একটা গণ্ডশৈল প্রকাণ্ড শির উন্নত করিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ধান্য রাগী তামাক ও কাফর জমী। কোন কোন স্থানে শ্লেট লৌহ লবণ সোডা রূপা ও সোণা পাওয়া যায়। স্থান নীরস। নিম্ন স্থানস্থ গ্রামে রুইপোকার বড় উপদ্রব। লোকের ব্যবহারও অদ্ভুত। কেহ বিবাদ করিয়া গাধা মারিয়া কোন গ্রামে ফেলিয়া দিলে গ্রামকে গ্রাম উঠিয়া যাইবে। স্থানে স্থানে শিবের চড়ক হয়। এখানকার রাজার আয় ৭০ লক্ষ টাকা। মহীশূর নগর দক্ষিণে দশ মাইল দূর থাকিতে কাবেরীর দ্বীপমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গপত্তন নগর পাওয়া যায়। এই স্থানে হাইদর আলির রাজধানী ছিল। শ্রীরঙ্গপত্তনের মধ্যে দেরা দৌলত উদ্যান, টিপু ও হাইদরের কবর, মসজীদ, টিপুর ভগ্নবাটী, মহীশূরের ব্যাঘ্র, শ্রীরঙ্গজীর মন্দির ও দেওয়ানের সেতু দর্শন যোগ্য। কাবেরীর দুই ধারার উপর নিরেট পাথরের পুল। ৬৬ স্তম্ভে তিন তিন শ্রেণীর উপর পাথরের তক্তা পাড়িয়া পুল হইয়াছে। শ্রীরঙ্গপত্তনের পর মহীশূর নগর। মহীশূর লালমাটীর প্রাচীর বেষ্টিত। কেল্লামধ্যে রাজবাটী। নিকটে এজেন্টের উৎকৃষ্ট গৃহ। নগরের ৫ মাইল দূরে পর্ব্বতোপরি সরোবর। পর্ব্বত শীর্ষে এজেন্টের সুদৃশ্য বাঙ্গালা। পাহাড় পার্শ্বে ১৬ ফীট উচ্চ প্রস্তরের একটী নন্দী বা ষাঁঢ়। অনতিদূরে রাজার প্রকাণ্ড হস্তীরথ। মহীশূরের ৪০ মাইল ঈশান কোণে শিবসমুদ্রে কাবেরী প্রপাত দেখিবার যোগ্য।

বেঙ্গলুর ও মহীশূরাদি দেখিতে ইচ্ছা না হইলে সালেম চলিয়া যাইবে। নগর পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে ৭ মাইল বিস্তৃত এক নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত। চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকা লাল ও কর্করযুক্ত। স্থানে স্থানে পাথর উঠিয়াছে। নগরের ৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে এক খণ্ড উষরভূমি ম্যাগনিসিয়া পূর্ণ। ম্যাগনিসিয়ান সণ্ট ও ছিমেণ্ট এই মাটী হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার

অধিকাংশ লোক কার্পাসের ব্যবসায় রত। দাক্ষিণাত্যের এই সকল বিভাগে নানা স্থানে লৌহ খনির চিহ্ন পাওয়া যায়।

সালেম ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া চারিদিকেই সমতল ক্ষেত্র নয়ন গোচর হইবে। কিছুদূর পরে পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ৬৪ ফীট অন্তর ২২ খণ্ডযুক্ত সেতুতে নদী পার হইয়া ইরোড জঙ্কসন। ইরোড হইতে এক শাখারেল পশ্চিম মুখে গিয়া পশ্চিম সাগর স্পর্শ করিয়াছে। পশ্চিম সাগর তীরস্থ মলয়গিরি দর্শন করিবার জন্য আমরা ঐ রেলে আরোহণ করিলাম। ক্রমাগত সমতল ক্ষেত্র ও মধ্যে মধ্যে সেতু। ২২ সেতু পার হইয়া কোয়ম্বাটুর নগর। কোয়ম্বাটুর নইল নদীর বামতীরে অবস্থিত। এইটী টিপুর প্রধান সেনানিবেশ স্থান ছিল। কোয়ম্বাটুর জেলায় উৎকৃষ্ট তামাক ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চন্দনবৃক্ষ ভূরি ভূরি। স্থানে স্থানে লৌহ ও গোদন্তের খনি, এখানকার লোক ষাঁড়ের উপাসক। কোয়ম্বাটুর হইতে উত্তরমুখে এক শাখা রেল নীলগিরি পর্ব্বতের প্রত্যন্ত দেশ মিটাপোলিয়ম পর্য্যন্ত গিয়াছে। নীলগিরির শিখরস্থিত উটকামণ্ডগামীগণ মিটাপোলিয়ম হইতে সুন্দর সমতল পথ দিয়া ৬ মাইল দূরে কুলার পর্য্যন্ত যায়। কুলারে পর্ব্বত আরম্ভ। কুলার হইতে প্রাচীন পথ দিয়া ৯ মাইল দূরে এবং নূতন পথ দিয়া ১৬ মাইল দূরে কুনুর। পুরাতন পথে তঞ্জাম ভাড়া আট টাকা নূতন পথে গাড়ী চলে এজন্য খরচ অল্প। এক পথে গমন ও অপর পথে প্রত্যাগমন করিলে উভয় পক্ষের মনোরম সৌন্দর্য্য নেত্রগোচর হয়। কুনুর হইতে উটকামণ্ডপর্য্যন্ত গাড়ী চলিবার যোগ্য বাঁধা পথ আছে। সমগ্র উৎকৃষ্ট, ঘোড়গাড়ী ভাড়া দশটাকা। স্বাস্থ্যপ্রদ, উটকামণ্ড নগর সাগর হইতে ৭৩৯১ ফীট উচ্চ সংস্থিত। সাহেবদের বাটী এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের সংযোজক স্বরূপ নীলগিরির স্বাভাবিক ভাবই উটকামণ্ডের শোভা। এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব নাই। উপরে ছয় সাত মাইল বিস্তীর্ণ এক সরোবর আছে। ইচ্ছা হইলে দর্শক পর্ব্বতোপরি পাইকাড়া নদীর প্রপাত দেখিতে পারেন। কেহ কেহ বলে নীলগিরি রামায়ণের দর্দ্দুর পর্ব্বত। উটকামণ্ড দর্শন ইচ্ছা না হইলে কোয়ম্বাটুর পার হইয়া ক্রমাগত পশ্চিম রেলে চলিবে। উভয় পার্শ্বে

পার্ব্বতীয় উচ্চাবচ ভূমি ও খাত। স্থানে স্থানে জঙ্গল। ওয়ালিয়রের জঙ্গল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। ৩০ ফীট অন্তর পঞ্চকুকরবিশিষ্ট সেতুতে ওয়ালিয়র ও ১৫ খণ্ডবিশিষ্ট সেতুতে কোলিগাড পার হইয়া আমরা মলয় পর্ব্বতের সুপ্রসিদ্ধ খাত পালঘাটে প্রবেশ করিলাম। পালঘাট পার হইয়া রেল পনানি নদীর পার্শ্বে পার্শ্বে তীরতলা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। তীরতলা হইতে বেপুরের নিকটস্থ হইলে পশ্চিম সাগরের কল্লোলধ্বনি কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পালঘাট হইতে বেপুর পর্য্যন্ত রেল বসাইতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। মলয় হইতে ভূরি ভূরি স্রোতস্বতী তীব্রবেগে সাগরে পতিত হওয়ায় তদুপরি অতি কষ্টে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মলয় পর্ব্বতের বন শোভা অতি রমণীয়। ইহার বন দেখিলে রামায়ণের বর্ণন স্মৃতিপথে উদিত হয়। শাল তাল তমাল নীপ কিংশুক কদম্ব ভেলা বেতস চম্পাক নক্তমাল, এক এক বেত ২২৫ ফীট লম্বা। ভূরি ভূরি চন্দন বৃক্ষ। কত জাতীয় কতরূপ কত বিশাল তরু বিকটাকার শাখা বিস্তার করিয়া বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়াছে। এক একটা সেগুণ ৩৩ হাত উচ্চ। তালের ঘটাই বা কত এবং তাহার পত্রের বিস্তারই কি ভয়ঙ্কর। নিবিড় নীলমেঘের ন্যায় নানাবিধ বৃক্ষ অবিরলভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। ভয়ঙ্কর লতা সকল ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার ডাল হইতে ঊর্দ্ধডালে যেন লম্ফ দিয়া উঠিতেছে। মাতঙ্গের বৃংহিত, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার ও বানরের চীৎকারে বন দিবানিশি কম্পিত হইতেছে। বন্য মাতঙ্গের গাত্র ঘর্ষণে, দন্তাঘাতে ও শাখা ভগ্ন শব্দে কর্ণকুহর বধিরীকৃত। কোথাও বন্যমহিষ ছুটিয়া যাইতেছে, কোথাও এক এক দলে অসংখ্য মাতঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে, কোথাও ভল্লুকে ভূমি বিদীর্ণ করিতেছে, কোথাও নানা জাতীয় হরিণ বিচরণ করিতেছে ও কোথাও কপিকুল লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতেছে। নিবিড় অরণ্যমধ্যে আরণ্যবৃষ (গয়াল) সুখেতে শয়ান রহিয়াছে। কোন স্থানে নিস্তব্ধ বনে নিরন্তর ঝিল্লীরব, শুষ্কপত্রোপরি সর্পের গাত্র ঘর্ষণ ও দূর শাখায় উপবিষ্ট পক্ষীর সময়ে সময়ে চিচিকুচি ধ্বনি, কখন কখন নিজের পদশব্দে বন্যজন্তু ভ্রমে নিজেই শঙ্কিত হইতে হয়। কোথাও বা মারুত যোগে পুষ্পরেণু আসিয়া নাসিকা ও চক্ষু আচ্ছন্ন করিতেছে ও কোথাও বা

কণ্টক বৃক্ষে গাত্র বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে। গহন বনের এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া মন ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। একেই পর্ব্বত ভয়ঙ্কর, তাহাতে বন ভয়ঙ্কর, তদুপরি ভীষণ জন্তুর চীৎকার ও নদীগণের ঝঙ্কার শব্দ। নানাস্থানে কদলী কানন ও পর্ব্বতপ্রান্তে এলা বন সকল সুদীর্ঘ হরিৎবনের ন্যায় জঙ্গলাবস্থায় বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়াছে। নানাবিধ ফল, দারুচিনি ও জায়ফল বৃক্ষে নানা দিক শোভিত। সাগর প্রান্তে নারিকেল বৃক্ষের দোলায়মান মস্তক সকল লক্ষিত হয়। লোকালয়ের নিকট আম্র ও কাঁটাল বৃক্ষোপরি গোলমরিচের * লতা উঠিতেছে। এখানকার লোকেরা স্বভাবতই ক্ষেত্রমধ্যে বাড়ী করিয়া থাকে। ইহাদের ব্যবহার অদ্ভুত। সর্ব্বদেশীয় আইনকর্ত্তাদিগকে ইহারা মূঢ় করিয়াছে। স্ত্রীজাতি দশমবর্ষে বিবাহ করে। পতির নিকট গ্রাসাচ্ছাদন লয় কিন্তু পতির সহিত সাক্ষাৎ নাই। পথের লোক ডাকিয়া উপপতি করে। তাহার বিশেষ জাতি বিচার নাই। যে যত অধিক উচ্চ শ্রেণীর লোক উপপতি করিতে পারে সে তত সম্ভ্রান্ত। পুত্রেরা বাপের নাম জানে না, মামার নামে পরিচয় দেয়। মাতা বাটীর সর্ব্বে সর্ব্বা এবং পথের পুরুষ আকর্ষণে কুল গরিমা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠা কন্যা বাটীর কর্ত্রী। স্ত্রীলোকেরাই যথার্থ মালীক। গরিব ভাগিনেয় নাম মাত্র মাতুলের বিষয়ের অধিকারী হয়। মলবারের প্রধান ব্রাহ্মণেরা নায়র নামে খ্যাত। ঘরের ব্যবহার ঐরূপ কিন্তু ব্রাহ্মণেরা শূদ্র স্পর্শ করে না। এ প্রদেশের মৃত্তিকা লাল, নদীতীর বালুকাময় এবং গরুগুলি এত ক্ষুদ্র যে চাস চলে না। এক একটী গরু দেখিতে ছাগলের মত। কোচিন মঙ্গলুর প্রভৃতি এই সকল স্থানে অনেক খ্রীষ্টান ও জৈনের বাস। দেশীয় ভাষা মলয়ালম। মঙ্গলুরের অতি অল্প লোক তুলবী কহে। মলবার উপকূলে সাগরে বহুরূপ আশ্চর্য্য মৎস্য পাওয়া যায়। এক জাতীয় মৎস্য হইতে কডলিভরের ন্যায় তৈল প্রস্তুত হইয়া মান্দ্রাজে বিক্রীত হয়। সময়ে সময়ে মৎস্য এত ধরা পড়ে যে লোকে ঘোড়াকে পর্য্যন্ত মৎস্য খাওয়ায়। চন্দন, মরিচ, জায়ফল,

* পৃথিবীতে বার্ষিক সাড়ে ছয় লক্ষ মণ মরিচ ব্যয় হয়।

জৈত্রী, সাগু, কফি ইত্যাদি দ্রব্য এখানকার প্রধান রপ্তানি। মাটির নিম্নে ও শিখরের উপর যে চন্দন থাকে তাহারই সারভাগ অতি সুগন্ধ। জায়ফলের গাছ লেবুরমত, ফলও তদ্রূপ। ইহার আচার ও মোরব্বা খাইতে বড় সুস্বাদ। আঁটিটা জায়ফল। এই মলয়গিরি হইতে মলয়ানিল প্রবাহিত হয়। দক্ষিণে এই বায়ুর প্রবাহ অত্যন্ত বেশী। বাঙ্গালায় তত অধিক বোধ হয় না। দক্ষিণ পশ্চিমাগত মৌসুমী বায়ুতেই যত মেঘ আনিয়া উপস্থিত করে। এজন্য সহ্য ও মলয়ের বর্ষা অতি অদ্ভুত। প্রায় ৯ মাস বৃষ্টি হইয়া থাকে। কূপের জল খারাপ হইলে লোকে আমলা পাতা ভিজাইয়া শোধন করে। পরশুরাম, মলবার কানাড়া ও কোকন সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া বসতি করান। ইহার প্রাচীন নাম কেরল দেশ। শঙ্করাচার্য্যের এই দেশে জন্ম হয়। এখানে এখন ওয়াইনদ প্রদেশে সোণার আকর বাহির হইয়াছে। নিজ বেপুরেই লোহার কারখানা আছে। মলয়ের পূর্ব্বে পর্ব্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ কুর্গ রাজ্য। ইহার অরণ্য মলয়ের সহিত সংযুক্ত ও ভয়ঙ্কর বাইসনে পূর্ণ। এখানে লোকে তালকাবেরী ও লক্ষ্মণ তীর্থে স্নান করিতে যায়। দর্শক মলয় হইতে ষ্টিমার যোগে মঙ্গলুরে গেলে হুনাবারের নিকট সরস্বতীর আশ্চর্য্য প্রপাত দেখিয়া যেন নয়ন স্বার্থক করেন। বম্বে হইতে দক্ষিণমুখে ষ্টিমার যোগে বিস্তর লোক আগমন করে। বম্বে হইতে কারাবার পর্য্যন্ত ভাড়া প্রথম শ্রেণী ৭০ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণী ৩৫ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণী ১২ টাকা। কারাবার হইতে কুমতা পর্য্যন্ত ৪০ মাইল মনহুল ভাড়া ১২ টাকা। কুমতা হইতে হুনাবার ১২ মাইলে মনছুল ভাড়া ৩ টাকা। হুনাবার হইতে নদী যোগে গিরিশপা গ্রাম পর্য্যন্ত ১৮ মাইল নৌকায় যাইতে হয়। গ্রাম হইতে জলপ্রপাতের নিকট পর্য্যন্ত ১৮ মাইল যাইতে মনছুল ভাড়া সাড়ে চারি টাকা। গিরিশপা গ্রামে ধর্ম্মশালা আছে। এই সকল বন্দোবস্তের জন্য কারাবার কুমতা ও হুনাবারের মামলতদার অর্থাৎ ডেপুটি কালেক্টরদিগের সাহায্য আবশ্যক। খুঁজিয়া লইলে বম্বে হইতে স্বল্পব্যয়ে অনেকে ভাড়াবহ ষ্টিমার কুমতা পর্য্যন্তই পাওয়া যায়। মঙ্গলুর হইতে উত্তরমুখে গেলে স্বল্পই ব্যয়। শীতের প্রারম্ভে যাওয়াই ভাল, কারণ বর্ষার শেষে জ্বর কানাড়ার জঙ্গলে

রাজধানী করে। যাহা হউক এক্ষণে আমরা প্রপাতের সমীপবর্ত্তী হইলাম। সম্মুখের বনের আবরণ খুলিয়া গেলে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! দর্শক কোথায় তোমার সাহস! অশনি তাড়িতের ন্যায় চকিত হইবে। তোমার নেত্র মুদিত হইবে, ইন্দ্রিয় শিথিল হইবে, শরীর স্পন্দিত হইবে, তুমিও চক্ষু কর্ণ আবদ্ধ করিয়া ভূতলে পড়িবে। যেন শত শত বজ্রাঘাত হইতেছে তার কি বলিব! জলের কি ভীষণ গর্জ্জন! কি ভয়ঙ্কর আস্ফালন! কি ঘোর আবর্ত্ত! ধূমের ন্যায় জলস্ফুলিঙ্গে নভোমণ্ডল অঙ্কীভূত, পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চূড়া, তদুপরি ভীষণ বৃক্ষ সমূহের শীর্ষ সকল কম্পিত হইতেছে। এ ভীমরূপ বর্ণিত হইবার নয়, এ ভীমরূপ ভুলিবারও নয়। বিয়ংকাল ভূতলে পড়িয়া থাকিলে ক্রমে অভ্যাস পাইয়া আসিল এবং ইন্দ্রিয়গণ সবল হইয়া স্বকার্য্যে রত হইল। তখন আমরা অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটা ভয়ঙ্কর খাত, শিলাময় অনাচ্ছাদিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রায় ৯০০ ফীট গভীর হইবে। ইহার পার্শ্বদেশ বর্ত্তুলাকার এবং এরূপ আনত যে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যহস্তে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই খাতে সরস্বতী কয়েক শাখা বিস্তার করিয়া পতিত হইতেছে। প্রধান শাখার পতন কালে ফেণ সমন্বিত ঘূর্ণমান এক প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ হইয়াছে। উহার বেগ এত তীব্র ও এত বেগে ও এরূপ বলে নিম্নে পতিত হইতেছে যে ঐ নদী পতিত হইবামাত্র সরলভাবে জল বহুদূর বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং জল স্ফুলিঙ্গে বনের উপর আকাশমণ্ডলে এক খানি অপূর্ব্ব মেঘ উৎপন্ন হইয়াছে। অপরাপর শাখা গুলি পার্শ্বদিয়া পড়িবামাত্র প্রস্তরের ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। প্রধান শাখার প্রপাত পৃথিবীর মধ্যে একটী অদ্ভুত প্রপাত বলিয়া বর্ণিত হয়। জগদ্বিখ্যাত নায়েগ্রায় ইহা অপেক্ষা অধিক জল পতিত হয়, কিন্তু ইহার উচ্চতা নায়েগ্রা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার উচ্চতা ৮৮৮ ফীট এবং ইহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৬০০০ ঘন.ফীট জল পড়ে। ক্রিষ্টি সাহেব কহিয়াছেন যে, নিম্নে নামিয়া দর্শন করিলে ইহার ভীষণ ভাব এত দূর বোধ হইবে যে ইহাকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু নিম্নে নামিবার উপায় নাই। অসম সাহসী ব্যক্তিরা উপরিস্থিত শিলাতলে শয়ন করিয়া তাহা হইতে মুখ বাড়া-

হয়া ইহার নিম্নভাগ দেখিতেছে। এক সঙ্গে দৃশ্যমান এই ৪ জল প্রপা-তের ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শক জন্মেও ভুলিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ইহার খট্টাঙ্গের প্রপাত কহিয়াছেন, হুনাবারের নিকট আমাদের দুর্গম গোকর্ণ মহাবলেশ্বর তীর্থ ও এক বিস্তীর্ণ হ্রদ। শিবের নাম পশুপতি। "ঘোরেণ তপসা লব্ধং রাবণাখ্যেন রাক্ষসা,, ইত্যাদি বলিয়া লোকে স্তব করিতেছে। বম্বে হইতে বিস্তর মহারাষ্ট্রীয় যাত্রী আইসে।

পশ্চিম সাগরাদি দেখিতে ইচ্ছা না হইলে ইরোড জঙ্কসন হইতে প্রধান রেলে চলিয়া যাইবে। ইরোড ত্যাগ করিয়া গুয়ালিয়র বা নরেল তীর পর্য্যন্ত ভূমি ক্রমশই ঢাল। প্রজার ধান্য ক্ষেত্র ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তরময় উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া বহু কষ্টে রেল নীত হইয়াছে। কোথাও বা মৃত্তিকা স্তূপাকার কোথাও বা খাত করিতে হইয়াছে। নরেল পার হইয়া কিছুদূর পরে এক পাহাড় কাবেরী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পাহাড় কারুরের ভূমি হইতে প্রায় ১৮১ ফীট উচ্চ। কষ্টে রেল এই পর্ব্বত পার হইয়া ঢাল অবলম্বন পূর্ব্বক কাবেরীকে ডাইনে রাখিয়া কারুরের সমীপবর্ত্তী হইল। কারুরের নিকট অম্বামতী নদী কাবেরীতে পতিত হইয়াছে। ইহার বিস্তার প্রায় সহস্র ফীট ও বালুকা অত্যন্ত গভীর এই নদী পার হইয়া আমরা কাবেরীর ক্ষেত্র দিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর পরে কড়মতি ও কাবেরী সঙ্গম। কাবেরীর জলপ্লাবন হইতে পথ রক্ষা করিবার জন্য ভূমি উচ্চ করা হইয়াছে। পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্র ও উচ্চা-বচ ভূমি। এই সকল ভূমি ত্যাগ করিয়া রেল কাবেরীর তীরে তীরে ত্রিচু-নাপল্লী নগর পঁহুছিয়াছে। নগরের দক্ষিণ প্রান্ত উচ্চাবচ প্রস্তরপূর্ণ বালুকাময় ও অনুর্ব্বরা। কাবেরীর দিকের মৃত্তিকা লোহিত বর্ণ ও বালুকা মিশ্রিত। প্রাচীর বেষ্টিত এই নগর পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত। ৫০০ ফীট উচ্চ পর্ব্বতোপরিস্থ দুর্গে ধাপে ধাপে আরোহণ করিবার সময় কাবেরীর দিকে অতি মনোহর দৃশ্য লক্ষিত হয়। অপর দিকের স্থানে স্থানে নারি-কেলের নিকুঞ্জ। এখানকার তামাক, মাটীর দ্রব্য, অস্ত্র শস্ত্রাদি লৌহের দ্রব্য, অলঙ্কার ও ঘোড়ার সাজ এদিকে প্রসিদ্ধ। স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রব্যের জন্য যেরূপ কাশ্মীর, কটক, কচ, লক্ষ্ণৌ ও বর্ম্মা প্রসিদ্ধ, ত্রিচুনাপল্লীও সেই

রূপ প্রসিদ্ধ। ত্রিচুনাপল্লী হইতে দেড় মাইল দূরে সুবিখ্যাত শ্রীরঙ্গম। ইহার তুল্য অদ্ভুত মন্দির আমি ভারতে দেখি নাই। মন্দিরে একটী সমগ্র গ্রাম আছে। লঙ্কা গমন কালে শ্রীরাম কাবেরী নদীর মধ্যস্থিত এই দ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। দ্বীপের দৈর্ঘ্যতা ১৩ মাইল হইবে। ইহারই উপর শ্রীরঙ্গজীর মন্দির সংস্থাপিত। মন্দিরের ঘের প্রায় ৪ মাইল হইবে। প্রবেশ দ্বারের প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভের দৈর্ঘ্যতা ৩৩ ফীট ও বেষ্টন ১৫ ফীট হইবে। এইরূপ প্রতি সাড়ে তিনশত ফীট অন্তরে ছয় দ্বার পার হইতে হইবে। তাহার পর ২৫ ফীট উচ্চ ও ৪ ফীট বিস্তৃত চারিদিকে আর চারি চারি দ্বার পার হইতে হইবে। এই সপ্তদ্বার পার হইবার কালে এক এক দ্বারের পর মনুষ্যের বসত বাটী, দোকান, বাজার, ধর্ম্মশালা, দানশালা ও মন্দিরপূর্ণ এক এক গ্রাম লক্ষিত হইবে। একটা অতিথিশালা এত বৃহৎ যে তাহাতে সহস্র স্তম্ভ আছে। যাহা হউক এইরূপে সপ্তদ্বারের পর শ্রীরঙ্গজীর স্বর্ণবর্ণ কলসেমণ্ডিত অতি প্রকাণ্ড প্রধান মন্দির লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে জড়ীভূত শ্রীরঙ্গজীর কমনীয় মূর্ত্তি। ছত্র দণ্ডাদি সমস্তই নিরেট স্বর্ণের নির্ম্মিত। দেবতার আসবাবে চতুর্দ্দিক আকীর্ণ এবং সমস্তই বহুমূল্য। হিন্দুব্যতীত অপর জাতি চতুর্থ দ্বারের পর আর প্রবেশ করিতে পারে না। ত্রিচুনাপল্লী ত্যাগ করিয়া প্রায় ৩৮ মাইল নিম্ন ভূমি বর্ষে বর্ষে জলপ্লাবিত হয়। এজন্য পথ ৬ ফীট উচ্চ করা হইয়াছে। ইহার পর ৪০ মাইল ধান্যক্ষেত্র পার হইয়া পুনরায় এপথে তানজোর দিয়া তৎসমীপস্থ পূর্ব্ব বর্ণিত বাঙ্গালার ন্যায় দেশ সকল দেখিতে দেখিতে সাগর তীরে নিগাপটম নগরে পঁহুছিলাম। নিগাপটম হইতে ত্রিচুনাপল্লী পর্য্যন্ত ৭৮ মাইল মধ্যে ৮৯ সেতু। ইহার মধ্যে দ্বাদশটীর খিলান প্রায় ৩০ ফীট। নিগাপটমে পুনরায় পূর্ব্বসাগর দর্শন ইচ্ছা না হইলে প্রধান রেল অবলম্বন করিয়া ডিন্‌ডিগল চলিয়া যাইবে। সুদৃশ্য ডিন্‌ডিগল নগরের কেল্লা ৪০০ ফীট উচ্চ পর্ব্বতোপরি সংস্থিত। পর্ব্বতের শিখরে একটী উৎকৃষ্ট দেবমন্দির আছে। ডিণ্ডিগল পার হইয়া দক্ষিণমুখে মদুরার সেতুবন্ধরামেশ্বরের ষ্টেসন পঁহুছিবে। লঙ্কা যাইবার জন্য ষ্টিমার পাইতে ইচ্ছা হইলে বা কন্যা কুমারীতে গিয়া ভারতের শেষ সীমায় দাঁড়া-

হতে ইচ্ছা হইলে টুইটিকরণ বা টিনিভেলি ষ্টেসনে গিয়া রেল শেষ করিবে। কেবল সেতুবন্ধ দর্শন ইচ্ছা হইলে মদুরার পর আর যাইবার প্রয়োজন নাই। মদুরানগর ব্যাগাক বা ভিগে নদীর ডাইনতটে সংস্থাপিত। সহরের চারিদিকে প্রাচীর পথ গুলি অতি প্রশস্ত। এখানকার পার্ব্বতীর মন্দির ভারতে সুবিখ্যাত। প্রায় ৭ বিঘা ভূমি ব্যাপ্ত করিয়া আছে। ত্রিমল-নায়কের চৌলট্রী অতি সুগঠিত। এই প্রশস্ত গৃহের ১২৫ স্তম্ভের খোদকারী অতি চমৎকার। প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষও দর্শনযোগ্য। একটা ভগ্ন গম্বুজ ৬০ গজ চৌড়া। মদুরা জেলার স্থানে স্থানে রৌপ্য উৎপন্ন হয়। এই স্থানের লোকেরা ভ্রাতা ভ্রাতষ্পুত্র আদি একত্র হইয়া এক স্ত্রী বিবাহ করে। পুর্ব্বে মদুরানগর প্রাচীন পাণ্ড্যাদিগের রাজধানী ছিল। এই পাণ্ড্য-দেশে অর্জ্জুন প্রকাশিত নারীতীর্থ। এই দেশে হালাস্যতীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ, বারুণতীর্থ, কন্যাকুমারীতীর্থ ও সূর্পারকতীর্থ। এই স্থানে দুর্গা সহ মহিষা-সুর যুদ্ধ হয়। এই দেশের উপকূলে মুক্তা জন্মে। এই দেশের লোক কাষ্ঠে মৃদঙ্গ ও নল, ফুলে মদ্য, ফলে তৈল, আঁশে রজ্জু আদি করিয়া এক নারিকেল বৃক্ষ বহুরূপে ব্যবহার করে। এখানে লঙ্কার অমদানী অনেক, অপকৃষ্ট রত্ন সুলভমূল্যে বিক্রীত হয়। চৈত্র বৈশাখ ও ভাদ্র আশ্বিন জোঙ্গড়া তুলিবার কাল। প্রায় আড়াইশত নৌকা সমুদ্র মধ্যে নঙ্গর করে। ডুবুরীদের পৃষ্ঠে দীর্ঘে অর্দ্ধহাত ও প্রস্থে ১ পোয়া পাথর বাঁধা। হাতে চামড়া জড়ান ও অস্ত্র। গলায় জালের থলি ও তাহাতে দীর্ঘরশি লাগান। এবং পায়ের তলে একখান বড় পাথর। পৃষ্ঠের পাথরের বলে তরঙ্গে ভাসিয়া যায় না ও চল্লিশ হাত জলের নীচে হাঁটীয়া বেড়ায়। হাতের চাম-ড়ার জন্য জোঙ্গড়া তুলিতে কষ্ট পায় না, গলার থলিতে প্রায় ৫০০ করিয়া জোঙ্গড়া তুলিয়া আনে। প্রায় আধঘণ্টা থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হইলে গলার রশিতে টানদিলে নৌকার লোকে টানিয়া উঠায়। গলার রশির এক প্রান্ত নৌকার লোকের হস্তে থাকে। পদতলের প্রস্তরের ঝোঁকে শীঘ্র জলের নিম্নে গিয়া পঁহুছে। সাগরের জল স্বচ্ছ ও পরিস্কৃত, নিম্নের সকল দ্রব্য নিম্নে গিয়া সুন্দর দেখা যায়। হাঙ্গরে আক্রমণ করিলে ডুবু-রীরা জলঘোলা করিয়া রক্ষা পায় অথবা অস্ত্রদ্বারা তাহাকে বধ করে। সময়ে

সময়ে গবর্ণমেণ্ট ঝিণুকের হাজার ত্রিশ টাকা বিক্রয় করেন। কাহারও অদৃষ্টে উত্তম মুক্তা বাহির হয়, কেহবা কিছুই পায় না।

মদুরা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে সুবিখ্যাত সেতুবন্ধ রামেশ্বর। যেখানে অযোধ্যাপতি রাম সাগর পার হইয়াছিলেন। মদুরা হইতে যাতায়াত গাড়ী ভাড়া ১৫ টাকা। মদুরার নিম্ন ভূমি অস্বাস্থ্যকর। তিনদিনের যত কমে হয় রাস্তা শেষ আবশ্যক। ভারত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সাগর এখন ৬০ মাইল বিস্তীর্ণ। এই ৬০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া ভাঙ্গা সেতু। সেতু প্রায় ১২ মাইল ভারতের সহিত সংলিপ্ত। ভারত হইতে ১ মাইল ভাঙ্গা। তাহার পর ১১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল বিস্তীর্ণ রামেশ্বর দ্বীপ, তদনন্তর প্রায় ১৬ মাইল ভাঙ্গা। জোয়ারের সময় এই স্থানে জল থাকে কিন্তু ভাটার সময় বালি ও পাথর জাগিয়া উঠে। এইটীকে "রামঝড়কা স্তম্ভের উপর হইতে সমুদ্রের উপর একটী কাল রেখার ন্যায় দেখায়। তাহার পর সেতুর অংশ ১৮ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত লোক পুরিত মান্নার দ্বীপ। যাহা রামচন্দ্রের সেতুর অংশ ছিল এখন তাহা মান্নার দ্বীপ ও তাহার উপর কেল্লাযুক্ত নগর। ইহার পর ২ মাইল ভাঙ্গা। এই ভাঙ্গা পার হইলেই লঙ্কা। এখানেও জল বড় কম। এত কম যে ভাটার সময় মান্নার দ্বীপ হইতে মানুষ ও গরু পার হইয়া লঙ্কা যায়। পূর্ব্বে এই সেতুর উপর দিয়া লোকে লঙ্কা যাতায়াত করিত। সমুদ্রের ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ১৪৮৪ খৃঃ অব্দ অবধি চলাচল বন্ধ হইয়াছে। এই সেতুর উভয় পার্শ্বে সাগরের জল কম ও অভ্যন্তরে বালি ও পর্ব্বত। এই সকল ভাগ সেতুর অংশ ছিল। এজন্য ক্ষুদ্র নৌকাদি ব্যতীত জাহাজ চলিতে পারে না। আমরা ব্যাগারু নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু দূরে ভারতের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরের কিছু কাল লীলা দেখিতে লাগিলাম। ভয়ঙ্কর বানরী সেনা সহ সেই ধনুর্দ্ধর উপস্থিত হইলে সেতু বাঁধিবার সময় এখানে কি তুমুল কাণ্ডই উপস্থিত হইয়াছিল। আজ আমি নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান? অরে আর্য্যদের গৌরবের ভূমি। আমি শত শত নমস্কার করি। এ ডানিউব বাঁধা নাই। পার যে নজর হয় না! একে দুর্দ্দান্ত রাবণ। নল এ ভীষণ বিস্তার কিরূপে সরম্ভ করিল, নয় পাষাণে বুনিয়াদ পত্তন করিয়া বাঁধিবার বিলক্ষণ

কৌশল আছে। বাহুল্য ভয়ে লিখিলাম না। আমরা পোতে রাত্রি নয়টার আরোহণ করিয়া প্রাতে রামেশ্বর পঁহুছিলাম। সেতুর অংশ রামেশ্বর দ্বীপ নিম্নে বালুকাময় ও বাবলা বৃক্ষে আকীর্ণ। চাসের সম্পর্ক নাই। দেবতার আদেশানুসারে কেহই দ্বীপে হলকর্ষণ করিতে পায় না। অধিকাংশ দ্বীপ বাসী দানের উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত করে। রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড ও খোদকারীতে পূর্ণ। দেখিতে অত্যন্ত চমৎকার। ইহার দ্বারদেশ প্রায় শত ফুট। উহার উপর অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। চতুষ্কোণাকার ঐই সুবিস্তীর্ণ মন্দিরের দ্বারশ্রেণী দ্বারা আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডা মন্ত্রীসহ পলিগায় রাজমূর্ত্তিপূর্ণ করিয়াছে। এই সকল প্রস্তর মূর্ত্তির গঠন তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। পলিগার রাজা এই স্থানে দান-শালা স্থাপন করিয়াছেন। বাহিরে বিস্তর লিঙ্গমূর্ত্তি। পূর্ব্বদিকে প্রস্ত-রের উচ্চ বেদীর উপর কতকগুলি মূর্ত্তি বসিয়া আছে। এই সকল দর্শন করিয়া আমরা রামেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। মধ্যস্থলে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি কুণ্ডমধ্যে সংস্থিত। কুণ্ডের উপর অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইয়াছে। লিঙ্গের নিম্ন-ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত, অনবরত মস্তকে গঙ্গাজল ও বিল্বদল পড়িতেছে। অর্দ্ধ অন্ধকার গৃহ ক্ষীণদীপশিখাযোগে দ্যোতমান। চারিদিকে চন্দনের ছড়া ও ত্রিপুণ্ড্রধারীরা মহাদেবের স্তব করিতেছে, অভ্যন্তরে যাত্রীকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই মন্দির পবন বন্দর হইতে প্রায় ৯ মাইল দূর। পবন বন্দরে যাত্রীরা নৌকা হইতে নামিয়া থাকে। পথিকদের থাকিবার ধর্ম্মশালা মন্দ নহে। অবিবাহিত পাণ্ডা মহাশয়ের বৈঠকখানাটী ইংরেজি প্রথায় নির্ম্মিত। ভাগিনেয়েরা উত্তরাধিকারী হয়। নিকটে চৌলট্রি ও টোনা-গুড়ি বা নলমন্দির, নিকটস্থ সরোবর সাগর হইতে নীচ, তথাপি ও ইহার জল সুমিষ্ট। এখানে বিস্তর লোক স্নান করিতেছে। সেতুতে ভারতাবধি লঙ্কা পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থ আছে। প্রথমে চক্রতীর্থ। এই স্থানে ধর্ম্ম পুষ্করিনী, দেবীপট্টন ও নবপাষাণ স্থান। ইহাই সেতু মুল। ইহার পশ্চিমে রামের দর্ভশয্যা স্থান। তদনন্তর চক্রতীর্থ দক্ষিণে গন্ধমাদন, উত্তরে বৈতাল বরদ-তীর্থ। গন্ধমাদন সমস্ত সেতু আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ইহার উপর পাপ-বিনাশাখ্য, সীতাসর, মঙ্গল, অমৃতকূপ, ব্রহ্মকুণ্ড, হনুমৎকুণ্ড, অগস্ত্যতীর্থ,

রামকুণ্ড, লক্ষ্মণ, জটা লক্ষ্মী, অগ্নি, চক্র, শিব, শঙ্খ, যমুনা, গঙ্গা, গয়া, কোটি, সাধ্যামৃত মানস ও ধনুষ্কোটি অবশিষ্ট এই ২২ তীর্থ পরে পরে আছে, কত লোক ভক্তিভাবে স্তব করিতেছে। “ দশযোজন বিস্তীর্ণং শত যোজন মায়তং। রামচন্দ্র সমাদিষ্টং নলসঞ্চয় সঞ্চিতং। সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্থ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। দশকণ্ঠ শিরশ্ছেদ হেতবে সেতবে নমঃ। কেতবে রামচন্দ্রস্থ মোক্ষমার্গক হেতবে॥ ,, সেতু আর কি তোমায় দেখিতে পাইব! এখন বিদায় হই !!!

সম্পূর্ণ।

মসজীদবাটী ষ্ট্রীট ২ সংখ্যক ভবনে সেনযন্ত্রে
শ্রীহীরালাল ঘোষদ্বারা মুদ্রিত।